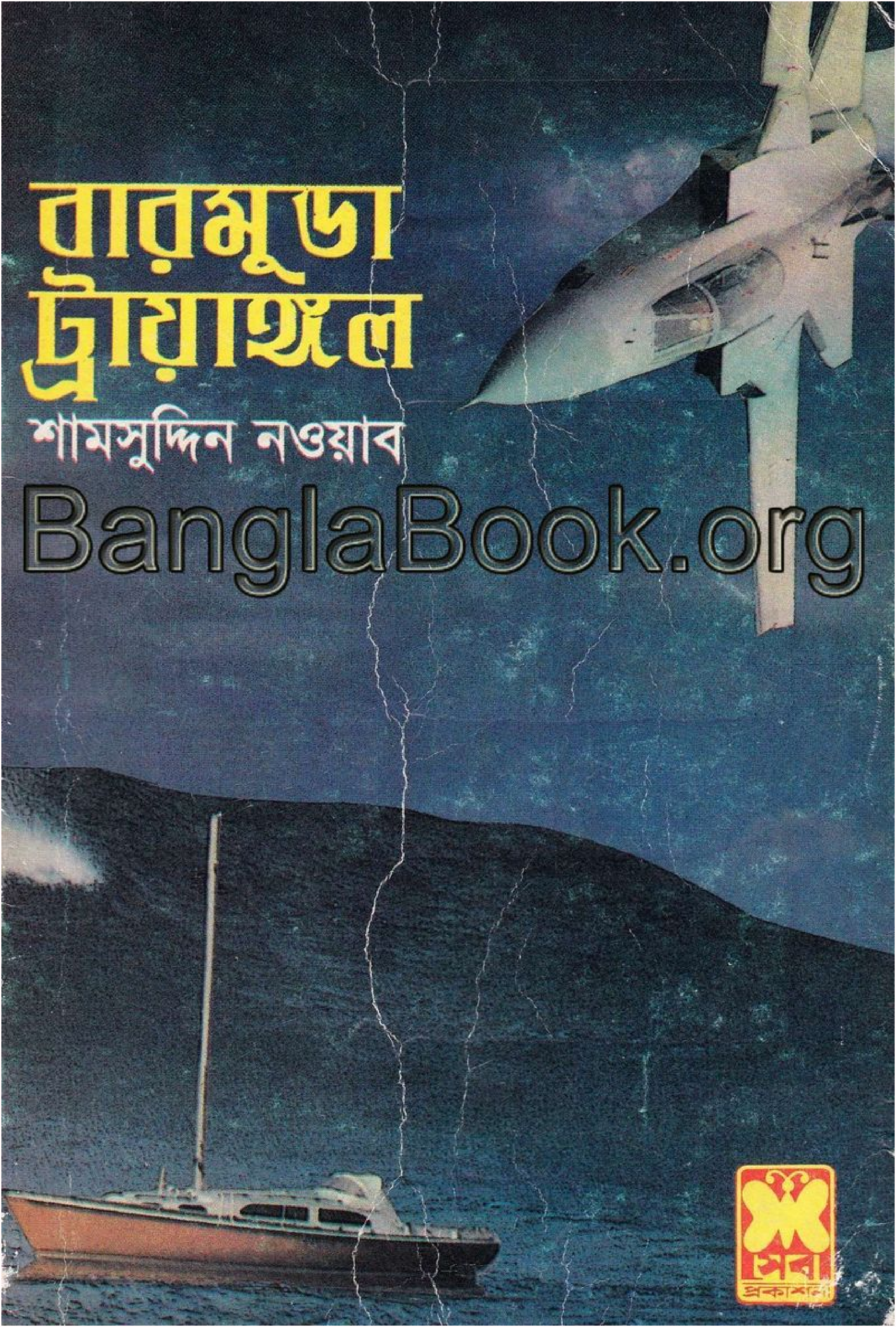

বারমুডা ট্রায়াঙ্গল

শামসুদ্দিন নওয়াব

সেবা
প্রকাশনী

বারমুডা ট্রায়াঙ্গল

গল্প নয়, সত্যিই কিছু আছে এখানে

শামসুদ্দিন নওয়াব

The Online Library of Bangla Books

সেবা প্রকাশনী

এক

অভিশপ্ত ত্রিভূজ

চোদ্দশো বিরানব্বই সালের এগারোই অক্টোবর। রাত দশটা। সান্টা মারিয়ার ডেকে পায়চারি করছেন গভীর চিন্তামগ্ন কলম্বাস। এমন সময় ব্যাপারটা চোখে পড়ল তাঁর। কয়েকশো গজ সামনে পানির একটু ওপরে একটা ক্ষুদ্র আলোর শিখা নেচে বেড়াচ্ছে। নিঃসীম সাগরের মাঝে ও কিসের আলো? কোন জাহাজ থেকে আসছে না, কোন নৌকা থেকেও না। কারণ তাহলে মাত্র তিন চারশো গজ দূর থেকে আবছা ভাবে হলেও জাহাজ বা নৌকার অবয়ব চোখে পড়ত কলম্বাসের। কয়েক মুহূর্ত নেচে নেচে হঠাৎ করেই নিভে গেল আলোটা। তারপরই এমন একটা ঘটনা ঘটল বুদ্ধি দিয়ে যার ব্যাখ্যা চলে না। আলোটা যেখানে জ্বলছিল তার থেকে আরও কয়েকশো গজ সামনের আকাশ থেকে ধূমকেতুর মত পুচ্ছ বিস্তার করে সাগরের পানিতে পড়ল একটা বিশাল আগুনের গোলা, কয়েক মুহূর্ত সেটা পানি তোলপাড় করে বেড়িয়ে ডুবে গেল। পেছনে ঈশ্বরকে ডাকার শব্দে চমকে উঠে ফিরে তাকালেন বিমূঢ় কলম্বাস। ঠিক তাঁর পেছনেই দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করতে করতে বুকে ক্রুশ চিহ্ন আঁকছে কয়েকজন নাবিক। অদ্ভুত ব্যাপারটা চোখে পড়েছে তাদেরও।

নতুন দেশ, যে দেশের বনে জঙ্গলে পাওয়া যায় প্রচুর সুগন্ধি

মশলা, খনিতে তাল তাল সোনা, সাত সাগর আর তেরো নদীর পারের সেই দেশের খোঁজে বেরিয়েছেন কলম্বাস। তিনটি জাহাজ নিয়ে গঠিত তার নৌবহর। নৌবহরের নাবিকরা সবাই ঘোর কুসংস্কারাচ্ছন্ন, জেলখাটা দাগী আসামী।

বিস্ময়ের প্রথম ঘোরটা কাটতেই সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল নাবিকেরা—যথেষ্ট হয়েছে সোনা আর মশলা খোঁজা, আর না, এবার প্রাণ থাকতে জলদি এই ভূতুড়ে এলাকা ছেড়ে ফিরে চলো মাতৃভূমি স্পেনে। কি জবাব দেবেন ওদেরকে কলম্বাস? ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করেন না তিনি, কিন্তু কয়েক মিনিট আগেই নিজের চোখে যা দেখেছেন তাকে মিথ্যে বলে উড়িয়ে দেন কি করে? তাছাড়া আটলান্টিকের এ অঞ্চলে প্রবেশ করার পর পরই আর একটা বিদঘুটে ব্যাপার লক্ষ করেছেন তিনি। রাতের বেলা, এমন কি দিনেও মাঝে মাঝে, পাগল হয়ে নাচানাচি করে কম্পাসের কাঁটা, কখনও ঘুরতে থাকে চরকির মত। কিসের প্রভাবে ঘটছে এসব? শেষ পর্যন্ত কিন্তু ফিরে না গিয়ে নতুন দেশ আবিষ্কার করে ছেড়েছিলেন কলম্বাস, সে দেশ আজকের আমেরিকা।

এর প্রায় সোয়াশো বছর পর আটলান্টিকের ওই অঞ্চল দিয়েই 'সী ভেঞ্চার' নামে এক জাহাজে চড়ে কলম্বাসের আবিষ্কৃত নতুন আমেরিকার ভারজিনিয়া কলোনিতে বসতি স্থাপন করতে যাচ্ছিল একদল ইংরেজ অভিযাত্রী। তাদের দলপতি স্যার জর্জ সোমার্স। সমুদ্র শান্ত সেদিন, বাতাসও চমৎকার, অন্ধকার রাতের আকাশ জুড়ে জ্বলছে তারার মেলা, এক রত্তি মেঘ নেই আকাশের কোথাও। জাহাজের কোয়ার্টার ডেকে রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রাতের সাগর দেখছিলেন সোমার্স। হঠাৎ করেই কোন রহস্যময় কারণে অশান্ত হয়ে উঠল সাগর, ফুঁসে উঠল বড়বড় ঢেউ, ঘন মেঘে ছেয়ে গেল সারা আকাশ, নিভে গেল তারার ঝিকিমিকি। কয়েক মুহূর্ত পরই আলোটা চোখে পড়ল তাঁর। ঢেউয়েব

মাথায় নাচতে নাচতে জাহাজের দিকেই এগিয়ে আসছে সে আলো। রাতের বেলায় আলো জ্বেলে শিকার করে কোন কোন সামুদ্রিক মাছ, আলোটা ওদেরই কারও বলে ভাবলেন তিনি। নাচতে নাচতে এগিয়ে এসে হঠাৎ লাফ মেরে জাহাজের ডেকে উঠে এল আলোটা, ওখান থেকে দড়ি বেয়ে স্ফীত পালের ওপর উঠে কিছুক্ষণ লাফালাফি করে এক লাফে বড় মাস্তুলটার মাথায় চড়ে বসল। তারপরই নিজ আকারটা একবারের জন্যে গুটিয়ে ছোট করে এনে পর মুহূর্তেই আবার আগের আকৃতি নিয়ে উড়ে গেল খোলা আকাশে। আস্তে আস্তে ছোট হতে হতে দূর আকাশে মিলিয়ে গেল সেই রহস্যময় আলোর শিখা।

ভূত-প্রেতে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করেন না সোমার্স। ব্যাপারটা স্বপ্ন বলে মনে হল তাঁর। চোখ রগড়ালেন, নিজের গায়ে চিমটি কেটে দেখলেন, না, জেগেই তো আছেন তিনি! এই ঘটনাটাকেই টেমপেস্ট নাটকে অমর করে রেখে গেছেন শেক্সপীয়র। রাজার জাহাজে উঠে এসে জাহাজের এখানে ওখানে আলোক রশ্মির মত নেচে বেড়ানো এরিয়েলকে রচনা করার মূলে ছিল সোমার্সের ডায়েরীতে বর্ণিত ওই রহস্যময় আলোর শিখা।

এই ঘটনার মাত্র কয়েকদিন পরই ঝড়ের কবলে পড়ল 'সী ভেঞ্চার।' নাম না জানা দ্বীপের উপকূলে আছড়ে পড়ে ভেঙে গেল জাহাজটা। দ্বীপটার নাম জাহাজের অন্যান্য অভিযাত্রীরা না জানলেও ঠিকই জানেন সোমার্স আর জাহাজের ক্যাপ্টেন নিউপোর্ট। নামটা বললেই প্রচণ্ড ভয় পেয়ে যাবে জাহাজের যাত্রীরা, তাই নামটা গোপন করে গেলেন ওঁরা। এক এক করে চারদিন ওই ভাঙা জাহাজেই কাটাল যাত্রীরা। জোয়ারের টানে এতদিন দ্বীপের একটা খাড়ির ভেতর ঢুকে পড়েছে সী ভেঞ্চার। শেষ পর্যন্ত যা থাকে কপালে, ভেবে, জাহাজ থেকে দ্বীপে নেমে পড়ল যাত্রীরা। নামিয়ে নেয়া হল জাহাজের সমস্ত মালপত্র। অবাক কাণ্ড, এই চারদিনে যা ঘটল না, যাত্রীরা নেমে যাবার

পর পরই কিনা তা ঘটে বসল। জোয়ারের টানে খাঁড়ি থেকে খোলা সাগরে বেরিয়ে গিয়ে ডুবে গেল সী ভেঞ্চার।

ও নিয়ে আর বেশি মাথা না ঘামিয়ে দ্বীপটাতে কি আছে না আছে তা খুঁজতে বেরিয়ে পড়ল অভিযাত্রীরা। জায়গাটা ভালই লাগল এদের। ইংল্যান্ডের চেয়ে একশো গুণ ভাল দ্বীপের আবহাওয়া। খাঁড়ির পানিতে আছে প্রচুর সামুদ্রিক মাছ, গলদা চিংড়ি, কাঁকড়া আর কচ্ছপ। জঙ্গলে বুনো শুয়োর আর নানা রকমের ফল। দেখেশুনে মনে হল মাটিও অনুর্বর নয়। অতএব ভারজিনিয়ায় যখন পৌঁছতে পারা গেল না, এখানেই বসতি স্থাপন করলে মন্দ কি?

কিন্তু রাজি হলেন না একজন লোক, হেনরি র‍্যাভেনস নামের একজন সম্ভ্রান্ত ইংরেজ। সী ভেঞ্চারের লাইফবোটটা বাঁচানো গিয়েছিল, সেটাতে চড়েই আমেরিকা পৌঁছানর পরিকল্পনা করলেন তিনি। এখান থেকে বেশি দূরে নয় আমেরিকার মূল ভূখণ্ড। সুতরাং প্রয়োজনীয় খাবার আর পানি সঙ্গে নিয়ে, সাতজন ইচ্ছুক নাবিক সহ, সী ভেঞ্চার ধ্বংস হওয়ার ঠিক এক মাস পর, আটাশে আগস্ট বেরিয়ে পড়লেন র‍্যাভেনস। তীরে দাঁড়িয়ে তাঁদের বিদায় সম্বর্ধনা জানাল দ্বীপে থেকে যাওয়া অভিযাত্রীরা।

মাত্র দুদিন পরেই ফিরে এলেন র‍্যাভেনস। ব্যাপার কি? কিছু না, আমেরিকা পৌঁছানর পথ ভুলে গেছেন তিনি। ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে ভালমত জেনে নিতে হবে। পয়লা সেপ্টেম্বর আবার নৌকা ভাসালেন র‍্যাভেনস। আবার সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে বিদায় জানানো হল র‍্যাভেনস আর তাঁর সঙ্গীদেরকে।

কথা ছিল পরের মাসেই আমেরিকা থেকে জাহাজ বোঝাই খাদ্য আর পানীয় সহ ফিরে আসবেন র‍্যাভেনস। নিয়ে যাবেন তাঁর ফেলে যাওয়া সঙ্গীদেরকে। কিন্তু পরের মাসে ফিরলেন না র‍্যাভেনস, ফিরলেন না আর কোনদিনই। অধীর আগ্রহে সাগরের কূলে দাঁড়িয়ে র‍্যাভেনসের

ফেরার অপেক্ষা করে দ্বীপের অভিযাত্রীরা, পাছে পথ চিনতে ভুল করেন, এজন্যে সারাক্ষণই আকাশে ধোঁয়ার কুণ্ডলী ওড়ায় দ্বীপবাসীরা। কিন্তু সব বৃথা। শেষ পর্যন্ত মনস্থির করে ফেলল ওরা, এ দ্বীপে আর নয়। জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে এনে সাগর পাড়ি দেবার উপযোগী বড় বড় দুটো নৌকা বানিয়ে ফেলল ওরা। যেদিন দ্বীপে নেমেছিল তার প্রায় এক বছর পর ১৬১০ সালের ১০ মে নৌকা দুটোয় চেপে ভারজিনিয়ার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমাল একশো তেতাল্লিশ জন অভিযাত্রী। প্রায় পাঁচশো আশি মাইল সমুদ্র পথ পেরিয়ে দু'সপ্তাহ পরে ভারজিনিয়ার জেমস টাউনে নির্বিঘ্নেই পৌঁছে গেল ওরা। পৌঁছে শুনল ভারজিনিয়ায় পৌঁছেননি র‍্যাভেনস আর তাঁর সঙ্গীরা। কোথায় গেলেন র‍্যাভেনস? ভারজিনিয়ায় বা তার আশেপাশের বহু দূরে, এমন কি সাগরের দ্বীপগুলোতে পর্যন্ত খোঁজা হল, কিন্তু কোথাও কোন খোঁজই পাওয়া গেল না র‍্যাভেনস বা তাঁর সঙ্গী সাথীদের। যেন লাইফ বোটটা সহ র‍্যাভেনস আর তাঁর সাতজন সঙ্গীকে বেমালুম গিলে নিয়েছে সাগর। কিন্তু সাগরের রহস্যময় ওই এলাকাটার নাম কি? সী ভেঞ্চার যে দ্বীপের উপকূলে ধ্বংস হয়েছিল সে দ্বীপটারই বা নাম কি?

দ্বীপটার নাম বারমুডা, এলাকাটা বারমুডা ট্রায়াঙ্গল। সভ্য জগতের জানা মতে তাই বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের প্রথম বলি হলেন র‍্যাভেনস আর তাঁর সাত সঙ্গী। আর ওই অদ্ভুত আলোর কথা প্রথম জানিয়ে গেছেন কলম্বাস। দ্বীপটি প্রথম আবিষ্কৃত হয় ১৫৬৫ সালে। আবিষ্কার করেন এক দুঃসাহসী স্প্যানিয়ার্ড নাবিক জুয়ান ডি বারমুডেজ। তাঁর নামানুসারেই নামকরণ করা হয় দ্বীপটির। বারমুডা থেকে শুরু করে দক্ষিণে পুয়েরটো রিকো, সেখান থেকে পশ্চিমে ফ্লোরিডা পার হয়ে গালফ অফ মেক্সিকোর যে কোন বিন্দু এবং এই বিন্দু থেকে আবার বারমুডা পর্যন্ত রেখা টানলে যে কল্পিত ত্রিভুজ রচিত হবে তার নাম বারমুডা ট্রায়াঙ্গল। এই ট্রায়াঙ্গলের ভেতরে শ'তিনেক কোরাল দ্বীপ

আছে, এগুলোর বেশির ভাগই জন বসতিহীন, শূন্য। পুরানো পুঁথি ঘাঁটলে জানা যায়, সেকালের সাদা দাড়িওয়ালা অভিজ্ঞ বুড়ো নাবিকেরা এই দ্বীপগুলোর নাম দিয়েছিল আইলস অফ দ্য ডেভিল, অর্থাৎ শয়তানের দ্বীপপুঞ্জ। দ্বীপগুলোকে ওরা যথাসাধ্য এড়িয়ে চলত, জাহাজে কেউ ওগুলোর নাম উচ্চারণ করার আগে ক্রুশ চিহ্ন এঁকে নিত বুকে। ওদেরকে দোষ দেয়া যায় না, কারণ আজকের আণবিক যুগের অনেক নাবিকও ও অঞ্চলে ঢোকার আগে তাই করে থাকে।

আজকের সভ্য মানুষের সামনে বারমুডা ট্রায়াঙ্গল একটা চ্যালেঞ্জ। ওই অভিশপ্ত ত্রিভুজের ভেতরে আসলে কি ঘটছে বলতে পারে না কেউ। মাঝে মাঝেই নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ সূত্র বাতিল করে দেয় বারমুডা ট্রায়াঙ্গল, বিকল করে দেয় রেডিও, কম্পাস বা অন্যান্য সব প্রয়োজনীয় নেভিগেশনাল ইন্সট্রুমেন্টস। কখনও কখনও এর চেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে। যেমন সবুজ রঙের উজ্জ্বল কুয়াশায় ঢাকা পড়ে ওখানকার সাগর, বিদঘুটে জলস্তম্ভ উঠে যায় আকাশে। কোথাও কিছু নেই, হঠাৎই সাগরের বুকে সৃষ্টি হয় প্রচণ্ড ঘূর্ণিপাক, হিংস্রভাবে জাহাজ গিলতে ছুটে আসে পাহাড় প্রমাণ ঢেউ। রেডিও, টেলিভিশন আর খবরের কাগজে এ নিয়ে যতই আলোচনা হচ্ছে, রহস্য জমাট বাঁধছে ততই। কেউ কেউ 'কিছু না' বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে রহস্য আরও জটিল করে তুলছে। আসলে কিসের প্রভাবে ঘটছে এসব, বলতে পারছে না কেউ।

দুই

ভানুমতির খেল!

আমেরিকা আবিষ্কার করে স্পেনের ভাগ্য ফিরিয়ে দিয়েছিলেন কলম্বাস। সন্ধান দিয়েছিলেন তিনি নতুন সমুদ্রপথ আর নতুন সম্পদের। কলম্বাসের বেশ কয়েক বছর পর মেকসিকোর কূলে অবতরণ করলেন ফারনানডেজ ডি করডোভা, এর দু'বছর পর গ্রিজভালা। ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, মার্সিকো এবং পেরুর উপর প্রভুত্ব বিস্তার করল স্পেন। এসব দেশ থেকে জাহাজ ভর্তি করে নিয়ে আসতে লাগল সোনা, রূপা, খনিজ রত্ন, কাপড় রাঙাবার নীল, আর হাজার হাজার ক্রীতদাস। এসব ক্রীতদাসের বেশির ভাগই আমেরিকার আরওয়াক ইণ্ডিয়ানের দল। ভুলিয়ে ভালিয়ে তাদেরকে জাহাজে তুলে স্বদেশে নিয়ে আসত স্প্যানীয়ার্ডরা।

বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের দক্ষিণ ঘেঁষে চলাচল করত ওই সব স্পেনীয় জাহাজ। সতেরোশো পঞ্চাশ সালের শরৎকালে ওই পথ ধরেই দেশের দিকে রওনা দিল বড় বড় পাঁচটা জাহাজের এক নৌবহর, এর ক্যাপ্টেন ডন জুয়ান ম্যানুয়েল ডি বোনিলা। বহু মূল্যবান সামগ্রী আর ক্রীতদাস বয়ে নিয়ে চলেছে জাহাজগুলো। আগে আগে চলেছে ফ্ল্যাগশীপ 'নুয়েস্ত্রা সেনোরা ডি গুয়াডালুপে', সারিবদ্ধভাবে তার পেছনে পেছনে চলেছে বাকি চারখানা জাহাজ। সবকটা জাহাজই সমুদ্রে চলার

উপযোগী এবং বেশ মজবুত।

ফ্লোরিডার দক্ষিণে বাহামা চ্যানেলের ভেতর দিয়ে উত্তর গালফ স্ট্রীম ধরে কেপ হ্যাটেরাসের দিকে চলল জাহাজগুলো। একটু পরই পুব আটলান্টিকে, বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের ভেতর ঢুকে পড়বে। গুয়াডালুপের কোয়ার্টার ডেকে দাঁড়িয়ে চিন্তিত মুখে দূর সাগরের দিকে তাকিয়ে আছেন ক্যাপ্টেন বোনিলা। বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের তখনও নামকরণ করা হয়নি, কিন্তু অভিজ্ঞ নাবিক মাত্রেই জানে আটলান্টিকের এই এলাকাটা অত্যন্ত খারাপ। জিজ্ঞেস করলে সঠিক কারণটা কেউই বলতে পারবে না, কিন্তু একটা ব্যাপারে সবাই একমত, ভূতুড়ে সব কাণ্ড কারখানা নাকি ঘটে এখানে। গালফ স্ট্রীমের উত্তরমুখের স্রোত ক্রমাগত যেখানে ধাক্কা খেয়ে চলেছে আর্কটিকের শীতল স্রোতের সাথে, সেখানটায় এবং তার আশেপাশের কিছুটা অঞ্চল নাকি ঝড়ের দিনে পাগল হয়ে যায়। দুশো ফুট উঁচু হয়ে ছুটে আসে ঘোলাটে পানির ঢেউ, ঘন কুয়াশায় ঢেকে যায় চারদিক।

এসব কথা এতদিন কেবল শুনে এসেছেন ক্যাপ্টেন বোনিলা, কিন্তু সেদিন নিজের চোখে দেখলেন। হঠাৎ লক্ষ করলেন তিনি, ঘোর কালবর্ণ হয়ে যাচ্ছে সাগরের পানি। একটু পরই পানির এখানে ওখানে সৃষ্টি হল বিশাল সব ঘূর্ণি, বদলে গেল আকাশের রঙ, দিনের বেলায়ই রাতের আঁধার নেমে এল সাগরের বুকে। লক্ষণ দেখে বোঝা গেল এগিয়ে আসছে প্রচণ্ড ঝড়। নাবিকদের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি, 'হুঁশিয়ার; ঝড়ের জন্যে তৈরি থাকো সবাই।'

একটু পরই ঢেউ উঠল সাগরে, পাহাড় প্রমাণ বিশাল সব ঢেউ। কানে তালা লাগানো শব্দ করে জাহাজের দিকে ছুটে আসছে ওগুলো। যে কোন মুহূর্তে এখন ভেঙেচুরে তলিয়ে যেতে পারে জাহাজ।

মাস্তুল নামাবার আদেশ দিলেন নাবিকদেরকে ক্যাপ্টেন বোনিলা। কিন্তু ডেকের ওপরই স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছে না নাবিকেরা, মাস্তুল

নামাবে কি? বেশ কিছুক্ষণ তুমুল ঝড়ের সাথে লড়াই করে শেষ পর্যন্ত ভেঙে পড়ল মাস্তুলটা। অবাক কাণ্ড! মাস্তুলটা ভেঙে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কমে আসতে লাগল ঝড়ের তীব্রতা, দেখতে দেখতে থেমেই গেল একেবারে। শান্ত হয়ে গেল সাগর। আকাশের এখনকার চেহারা দেখে কল্পনাই করা যাবে না একটু আগে প্রচণ্ড ঝড় বয়ে গেছে এই এলাকায়। জাহাজের দিকে তাকালে কিন্তু তা পরিষ্কার বোঝা যায়। ভাঙা মাস্তুল, ছিন্নভিন্ন পাল আর ডেকের ওপর জমে থাকা পানি একটু আগের ঝড়ের স্বাক্ষর বহন করছে। সে রাতটা কোনরকমে কাটিয়ে দিল জাহাজের লোকেরা। পরদিন সকালে প্রথমেই জাহাজের ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ তলিয়ে দেখতে লাগলেন ক্যাপ্টেন বোনিলা। জাহাজের খোলে বোঝাই করা মালপত্রগুলো অক্ষত অবস্থায়ই আছে।

নিজের জাহাজ গুয়াডালুপের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে নিয়ে আশ্বস্ত হবার পর পেছনের বাকি চারটে জাহাজের কথা মনে পড়ল ক্যাপ্টেন বোনিলার। তাই তো, জাহাজগুলো গেল কোথায়? ঝড়ের দাপটে কি বহু পেছনে পড়ে গেছে ওরা, নাকি পথ হারিয়ে ভুল পথে চলে গেছে? চোখে দূরবীণ লাগিয়ে গুয়াডালুপের পেছনের বহুদূর পর্যন্ত সমুদ্র বক্ষ নিরীক্ষণ করে দেখলেন ক্যাপ্টেন। অনেকক্ষণ পর একটা জাহাজ চোখে পড়ল তাঁর, কোনমতে নির্জীবের মত এগিয়ে আসছে ওটা। বাকি তিনটে জাহাজ দেখতে পেলেন না ক্যাপ্টেন। চারপাশের সাগরের দিগন্তসীমা পর্যন্ত খুঁটিয়ে দেখেও জাহাজগুলো চোখে পড়ল না ক্যাপ্টেন বোনিলার।

গুয়াডালুপে আর ঝড়ের হাত থেকে বেঁচে যাওয়া জাহাজটাকে নিয়ে চারপাশের সাগর বক্ষের বহুদূর পর্যন্ত তল্লাশী চালিয়েও বাকি তিনটে জাহাজের কোন হদিস করতে পারলেন না ক্যাপ্টেন বোনিলা। আশ্চর্য! গেল কোথায় জাহাজগুলো? ঝড়ে ডুবে গিয়ে থাকলেও তো জাহাজের দু'এক টুকরো ভাঙা কাঠ, ছেঁড়া পালের অংশ, ডেকের ওপরে

রাখা মালপত্রের এক আধটা অথবা কোন মৃতদেহ পানিতে ভাসতে দেখা যাবার কথা। কিন্তু সে সবের কিছুই পাওয়া গেল না। বেমালুম গায়েব হয়ে গেছে তিন তিনটে জলজ্যান্ত জাহাজ।

দুটো ভাঙা জাহাজ সহ ধুঁকতে ধুঁকতে সাউথ ক্যারোলিনার একটি বন্দরে এসে পৌঁছুলেন ক্যাপ্টেন বোনিলা। সেখানে জাহাজ দুটো মেরামত করিয়ে নিয়ে নিরাপদেই দেশে ফিরে এলেন তিনি ও তাঁর লোকেরা। কিন্তু হারিয়ে যাওয়া জাহাজ তিনটে স্বদেশের বন্দরে এসে পৌঁছেনি তখনও। কোনদিনই আর দেশে ফেরেনি সেই তিনটে জাহাজ, এমন কি লোকমুখেও তাদের আর কোন খোঁজ খবর পাওয়া যায়নি কখনও।

মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী সহ ক্যাপ্টেন বোনিলার তিনটি জাহাজ উধাও হয়ে যাবার বাষট্টি বছর পরের ঘটনা। এই সময়ের মাঝে অবশ্য বেশ কিছু জাহাজ আর বড় নৌকা বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের মধ্যে নিখোঁজ হয়েছে কিন্তু সবগুলোর বিশদ বিবরণ দেয়া সম্ভব নয়। এখন যে কাহিনীটি বলতে যাচ্ছি তা এক সুন্দর রমণীর করুণ গাঁথা। বহু কবিতা, বহু গল্প উপন্যাস রচিত হয়েছে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে।

ছিমছাম, সুন্দর, ছোট্ট জাহাজ পেট্রিয়ট। সাউথ ক্যারোলিনা থেকে রওনা দিয়ে নিউইয়র্ক সিটিতে যাবে জাহাজটি। নাম করা যুদ্ধজাহাজ ছিল পেট্রিয়ট। যুদ্ধের পর থেকে ডাক, উপকূলের বন্দরের যাত্রী, আর মাঝে মধ্যে কোন নামী সওদাগরের মাল বহনের জন্যে ব্যবহৃত হয় জাহাজটি। একদিন এই জাহাজেই থিওডোসিয়া বার অ্যালস্টনের জন্যে একটি কেবিন ভাড়া করা হল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন উপরাষ্ট্রপতি অ্যারন বার-এর কন্যা আর সাউথ ক্যারোলিনার গভর্নর জোসেফ অ্যালস্টনের পত্নী থিওডোসিয়া। অপরূপ সুন্দরী এই মহিলার গভীর কালো চোখের তারায় লুকিয়ে আছে

যেন অজানা ব্যথা। শিশু বয়সেই মাকে হারায় থিওডোসিয়া, তারপর থেকে পিতার সান্নিধ্যও তেমন পায়নি। ভাইস প্রেসিডেন্ট হবার পর পরই আলেকজান্ডার হ্যামিলটনের সাথে বিরোধ বাধে অ্যারন বারের, শেষ পর্যন্ত দ্বন্দ্ব যুদ্ধ। যুদ্ধে হেরে গিয়ে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ কাঁধে নিয়ে পালিয়ে যান অ্যারন বার। কিন্তু অল্পদিন পরই ধরা পড়তে হয় তাঁকে, তারপর বিচার হয়। বিচারে অবশ্য সাজা হয়নি তাঁর, কিন্তু জনমত স্বপক্ষে না থাকায় দেশ ছেড়ে ইল্যান্ডে চলে যেতে হয় তাঁকে।

থিওডোসিয়ার বয়স তখন সতেরো। সবে মাত্র জোসেফ অ্যালস্টনের সাথে বিয়ে হয়েছে তার, কিন্তু স্বামী সারাক্ষণ কাজের মধ্যে ব্যস্ত থাকায় স্বামীর সান্নিধ্যও খুব একটা পায় না থিওডোসিয়া। এক এক করে দিন কাটতে লাগল। কিছুদিন পর একটা ছেলে হল থিওডোসিয়ার। নানার নামে ছেলের নাম রাখা হল—অ্যারন। ওদিকে ইংল্যান্ড থেকে চিঠি লিখলেন অ্যারন বার—শীঘ্রই আমেরিকায় ফিরছেন তিনি। নিউইয়র্কে বসতি স্থাপন করে ওখানকার আদালতে অ্যাটর্নিগিরি করবেন। খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠল থিওডোসিয়ার মন।

সত্যিই একদিন নিইউয়র্ক ফিরে এলেন অ্যারন বার। ছেলে সহ থিয়ডোসিয়া এখন পলিজ আইল্যান্ডে গ্রীষ্মাবকাশ কাটাচ্ছে। বাবার পৌঁছানর খবর পেয়ে থিওডোসিয়া ঠিক করল কারও সাথে ছেলেকে পাঠিয়ে দিয়ে প্রথমে চমকে দেবে সে অ্যারন বারকে। কিন্তু থিওডোসিয়ার মনের আশা মনেই থেকে গেল। জ্বরে পড়ল ছেলে। ম্যালেরিয়া। ম্যালেরিয়ার কোন ওষুধ ছিল না তখন। কাজেই বাঁচানো গেল না ছেলেটাকে। আঠারোশো বিরাশি সালের জুনের শেষে মারা গেল থিওডোসিয়ার ছেলে। ছেলের শোকে বিছানা নিল থিওডোসিয়া। ক্রমেই অবনতির দিকে যাচ্ছে তার স্বাস্থ্য। শেষ পর্যন্ত চিন্তিত জোসেফ ঠিক করলেন নিউইয়র্কে অ্যারন বারের কাছে পাঠিয়ে দেবেন

থিওডোসিয়াকে, বাবার কাছে থাকলে হয়ত আবার ভাল হয়ে উঠতে পারে সে। কিন্তু কার সাথে পাঠানো যায় থিওডোসিয়াকে? বেশি ভাবতে হয় না জোসেফকে। অ্যারন বারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহযোগী টিমথি গ্রীন এলেন পলিজ আইল্যান্ডে। জোসেফের সাথেও তাঁর পরিচয় আছে। স্বেচ্ছায় তিনি বন্ধু কন্যাকে নিউইয়র্কে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব কাঁধে নিলেন। কেবিন ভাড়া করা হল পেট্রিয়ট জাহাজে।

আঠারোশো বিরাশি সালের একত্রিশে ডিসেম্বর জর্জটাউন বন্দর থেকে নিউইয়র্কের উদ্দেশ্যে রওনা হল পেট্রিয়ট। জাহাজের ক্যাপ্টেনের নাম ওভারস্টক্স। তাঁর সমকক্ষ নাবিক সে সময়ে আর আটলান্টিকের উপকূলে দ্বিতীয় ছিল না। নিউইয়র্ক পৌঁছতে পাঁচদিন সময় লাগবে পেট্রিয়টের, আবহাওয়া পরিষ্কার থাকলে আর অনুকূল বাতাস থাকলে আরও আগেই পৌঁছে যেতে পারবে।

নির্দিষ্ট দিনে নিউইয়র্ক বন্দরে এসে অপেক্ষা করতে থাকলেন অ্যারন বার। কিন্তু পাত্তা নেই পেট্রিয়টের। সেদিন গেল, পরদিন গেল, তার পরদিন গেল; কিন্তু নিউইয়র্ক বন্দরে এসে পৌঁছল না পেট্রিয়ট। কোনদিন পৌঁছল না আর। আবহাওয়া অফিসে খোঁজ নিয়ে জানা গেল জর্জটাউন ছাড়ার পর থেকে পেট্রিয়টের যাত্রা পথে পর পর প্রায় দু'সপ্তাহ কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটেনি। তাহলে সুদক্ষ নাবিক-পরিচালিত অমন একটা জাহাজ কোথায় গায়েব হয়ে গেল? অনেক চেষ্টা করেও আর পেট্রিয়টের কোন খোঁজ পায়নি কেউ।

কমান্ডার জনসন ব্লেকলি। আঠারোশো শতকের গোড়ার দিকে আমেরিকান নৌবহরের প্রত্যেকটি লোক এই দুর্ধর্ষ কমান্ডারের নাম শ্রদ্ধাভরে উচ্চারণ করত। আঠারোশো এগারো সালের গোড়ার দিকে ইউ এস নেভির যুদ্ধ জাহাজ 'ওয়াসপ'-এর কমান্ডার পদে নিযুক্ত করা হয় যুবক ব্লেকলিকে। ব্রিটিশ-মার্কিন যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ নৌবাহিনীর মাঝে রীতিমত ত্রাসের সঞ্চার করেছিল জনসন ব্লেকলির 'ওয়াসপ'।

আঠারোশো চোদ্দ সালে 'রেনডিয়ার' নামে একটা দুর্ধর্ষ ব্রিটিশ যুদ্ধ জাহাজকে ধ্বংস করে দেয়ার পর সারা আমেরিকা আর ব্রিটিশ নৌবহরের লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল ব্লেকলির নাম।

সতেরোশো একাশি সালের মাঝামাঝি ইংল্যান্ডে জন্ম হয় ব্লেকলির। জন্মের বছর খানেক পর শিশু ব্লেকলিকে নিয়ে ভাগ্যান্বেষণের উদ্দেশ্যে আমেরিকায় রওনা হন তাঁর মা বাবা। ব্লেকলির একটি সদ্যজাত ভাইও ছিল ওঁদের সাথে। জাহাজেই রোগে পড়ল তাঁর মা ও শিশু ভাইটি। জাহাজ সাউথ ক্যারোলিনার চার্লসটন বন্দরে পৌঁছবার আগেই মারা গেলেন ব্লেকলির মা আর ভাই।

ব্লেকলিকে নিয়ে তাঁর বাবা বছরখানেক চার্লসটনে থাকার পর উইলমিংটনে চলে যান। কিছুকাল কাজের ধান্দায় ঘুরে বেড়িয়ে শেষ পর্যন্ত ব্যবসা শুরু করেন তিনি। এবার ভাগ্যলক্ষ্মী সদয় হলেন। অবস্থা ফিরে গেল ব্লেকলিদের। স্কুলে ভর্তি হলেন ব্লেকলি। স্কুল পাস করার পর ভর্তি হলেন নর্থ ক্যারোলিনার চ্যাপেল হিল বিশ্ববিদ্যালয়ে। গণিত, জরিপ আর বিশেষ করে নৌবিদ্যায় দারুণ আগ্রহ ব্লেকলির। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ হবার আগেই মারা গেলেন বাবা, আগুন লেগে পুড়ে গেল বাড়ি ঘর দোর। সোজা কথায় একেবারে পথে বসলেন তিনি। বন্ধ হয়ে গেল পড়ালেখা। অবশ্য তাঁর বাবার বন্ধু এডওয়ার্ড জেনিস তাঁকে পড়াতে চেয়েছিলেন কিন্তু রাজি হলেন না ব্লেকলি। ইউ এস নেভিতে মেশিনম্যানের চাকরি নিলেন তিনি।

তদানিন্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট জন অ্যাডামসের উদ্যোগে তখন সবে মাত্র গড়ে উঠতে শুরু করেছে ইউ এস নেভি। তিনি বুঝেছিলেন, দেশের দুই দিকে মহাসমুদ্র নিয়ে উপযুক্ত নৌবাহিনী ছাড়া বিদেশী শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করা যাবে না দেশকে। তাছাড়া দূর দেশে যাতায়াতকারী আমেরিকান বাণিজ্য জাহাজগুলোকে জলদস্যুর কবল থেকে বাঁচাতে হলেও নৌবাহিনীর দরকার।

মনের মত কাজ পেয়ে গেলেন জনসন ব্লেকলি। সাগরকে ভালবাসেন তিনি, ক্রমাগত হাতছানি দিয়ে ডাকে তাঁকে দূর সাগর। মনপ্রাণ দিয়ে কাজ করে যাবার ফলে চাকরিতে দ্রুত উন্নতি হতে লাগল ব্লেকলির। অপূর্ব রণকৌশলী আর সিংহের মত সাহসী জনসন ব্লেকলি শেষ পর্যন্ত কমাডান্টের পদে উন্নীত হলেন, রণতরী 'ওয়াসপে'র ভার দেয়া হল তাঁকে।

সে সময় আমেরিকার সাথে যুদ্ধ বেধেছে ব্রিটেনের। ব্রিটিশ বাণিজ্যতরী দেখলেই তা ধ্বংস করে দেবার ভার দেয়া হল ব্লেকলিকে। একটা পুরো জাহাজের অধিকর্তা হতে পেরে খুশিতে আত্মহারা হয়ে গেলেন তিনি। তাঁর জাহাজের নাবিকদের যুদ্ধ বিদ্যা শেখানর ভার নিজের হাতে তুলে নিলেন। সে যুগে তাঁর জাহাজের নাবিকদের মত নৌ-যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী নাবিক আর কোন জাহাজেই ছিল না।

ব্লেকলির ওয়াসপের আগে আর একটা 'ওয়াসপ' নামের আমেরিকান জাহাজ ব্রিটেনের সাথে লাগতে গিয়ে ধ্বংস হয়ে যায়, বোধহয় সে বদনাম ঘুচাবার জন্যেই আদাজল খেয়ে লাগেন ব্লেকলি। দেখেশুনে বাইশটা কামান বসালেন তিনি তাঁর জাহাজের বিভিন্ন স্থানে। অফিসার আর সাধারণ নাবিক নিয়ে ওয়াসপের লোক সংখ্যা মোট একশো সাঁইত্রিশ। ব্রিটিশ, স্প্যানিশ, ফরাশী আর মালয়ী জলদস্যুদের সাথে লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা ছিল তাদের সবারই।

নিজের দেশের সাগর সীমানা ছাড়িয়ে দূর সাগরে ব্রিটিশ জাহাজের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে লাগল ওয়াসপ। বাণিজ্যতরী ছাড়াও মাঝে মাঝেই ব্রিটিশ রণতরীর সাথেও দেখা হয়ে যেত ওয়াসপের। আর একবার দেখা হলে ওয়াসপের কবল থেকে তারা বাঁচতে পারত না কেউই।

'রেনডিয়ার'কে ডুবিয়ে দেবার পর তার চেয়ে শক্তিশালী একটা

জাহাজ অ্যাভনকে ডুবিয়ে দিল ওয়াসপ। 'আটলান্টা' নামের একটা জাহাজকে বন্দী করে পাঠিয়ে দিল আমেরিকায়। ব্রিটিশ জাহাজের নাবিকেরা 'ওয়াসপ' এর নাম শুনলেই চমকে উঠত। ওরা বুঝে গিয়েছিল ওয়াসপের সাথে দেখা হওয়া মানে নিশ্চিত মৃত্যু। এহেন ওয়াসপকে একদিন তার দুর্ধর্ষ ক্যাপ্টেন আর নাবিক সহ সম্পূর্ণ গিলে নিল বারমুডা ট্রায়াঙ্গল।

ওই অঞ্চলে টহল দিচ্ছিল তখন ওয়াসপ। রোজই কোন না কোন ব্রিটিশ জাহাজের সাথে তার টক্কর লাগার খবর আসছে দেশে। কিন্তু হঠাৎ একদিন আর কোন খোঁজখবর নেই। ক্রমে শঙ্কিত হয়ে উঠল আমেরিকান নেভি। ব্যাপার কি? কি হল ওয়াসপের? কেউ কোন খবর জানে কি?

খবর দিতে পারল 'অ্যাডোনিস' নামের একটা সুইডিশ জাহাজ। অদৃশ্য হয়ে যাবার কিছুদিন আগে ওয়াসপের সাথে দেখা হয় অ্যাডোনিসের। দু'জন বন্দী আমেরিকান লেফটেন্যান্টকে অ্যাডোনিসে তুলে দেয় একটা ব্রিটিশ রণতরী। আমেরিকান কোন জাহাজের সাথে দেখা হলে লেফটেন্যান্ট দু'জনকে তাতে তুলে দিতে পারবে অ্যাডোনিসের ক্যাপ্টেন। এরপর ওয়াসপের সাথেই প্রথম দেখা হয় অ্যাডোনিসের। আমেরিকান লেফটেন্যান্ট দু'জনকে ওয়াসপে তুলে দিলেন অ্যাডোনিসের ক্যাপ্টেন। ক্যাপ্টেনকে ব্লেকলি জানিয়েছিলেন, সাউথ ক্যারোলিনার উদ্দেশেই রওনা হয়েছে ওয়াসপ।

অ্যাডোনিসের ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে নিয়ে চললেন ওয়াসপকে ব্লেকলি। মধ্য আটলান্টিক অর্থাৎ সেই বিভীষিকার রাজ্যে ঢুকতে যাচ্ছে ওয়াসপ।

ভালমত খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছিল প্রথম ওয়াসপকে ব্রিটিশরা ডুবিয়ে দেয়নি, বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের ভেতর প্রবেশ করেই আসলে আর ফিরে আসেনি সে। তবে কি 'ওয়াসপ' নামটার ওপর কোন দুর্বলতা

আছে বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের?'

কেউ বলে 'ক্লাসিক কেস,' কেউ বলে 'ডেডলি মিস্ট্রি অফ দ্য ডেভিলস ট্রায়াঙ্গল', ১৮৮০ সালে 'আটলান্টা' নামের একটা জাহাজকে 'ক্লাসিক কেস' বা 'ডেডলি মিস্ট্রি'র সৃষ্টি হয়, আলোড়ন ওঠে সারা পৃথিবী জুড়ে।

'এইচ এম এস জুনো' নামে একটা যুদ্ধ জাহাজকে সাগরে ভাসানো হয় ১৮৪৫ সালে। চল্লিশটি কামান বসানো জাহাজটি ছিল তখনকার দিনের জন্যে রীতিমত উন্নতমানের যুদ্ধ জাহাজ। কিন্তু চল্লিশ বছর পরই একটা সেকেলে বাতিল জাহাজে পরিণত হল জুনো। বহুদিন বন্দরে পড়ে থাকল জাহাজটা।

এই সময় একদিন 'ইউরাইডিস' নামের একটা ট্রেনিং শিপ সাগরে ডুবে যাওয়ায় তৎক্ষণাৎ আরেকটা জাহাজের প্রয়োজন হয়ে পড়ল। কোথায় পাওয়া যায় জাহাজ? অগত্যা প্রায় বাতিল জুনোকে ঠিকঠাক করে, যতটা সম্ভব আধুনিক বানিয়ে নাম দেয়া হল 'আটলান্টা'।

১৮৭৯ সালের ৭ নভেম্বর পনেরো জন অফিসার, পঁয়ষট্টি জন ক্রু এবং দুশো জন নতুন ভর্তি হওয়া ক্যাপ্টেনকে নিয়ে তাদের ট্রেনিং দেবার জন্যে ইংল্যান্ডের পোর্টসমাউথ বন্দর থেকে দূর সাগরের দিকে চলল আটলান্টা। তীরে দাঁড়িয়ে ক্যাডেটদের বিদায় জানাল তাদের মা-বাবা হিতাকাঙ্ক্ষীরা।

পোর্টসমাউথ ছেড়ে দক্ষিণে অ্যাজোরস দ্বীপে যাবার পথে ঝড়ের মুখে পড়ল আটলান্টা। এরপর থেকে আবহাওয়া প্রায়ই জাহাজের প্রতিকূলে থাকে। একদিন কি করে যেন পানিতে পড়ে গেল একজন নাবিক, উদ্ধার করা গেল না তাকে। তাই নিয়ে অসন্তোষ দেখা দিল নাবিকদের মধ্যে।

এর মাঝেই হঠাৎ একদিন ইয়েলো ফিভারে আক্রান্ত হল তিনজন নাবিক। জাহাজ তখন বারবেডসের কাছাকাছি। বারবেডস পৌঁছেই

হাসপাতালে ভর্তি করে দেয়া হল তিনজনকে। দু'জনই হাসপাতালে মারা গেল, কিন্তু বেঁচে গেল তৃতীয়জন—ভারলিং।

দিন কয়েক বারবেডসে অপেক্ষা করে আবার রওনা হল আটলান্টা। উত্তর বারমুডা পৌঁছতে পৌঁছতে চরমে উঠল নাবিকদের অসন্তোষ। অবস্থা এমন, যে কোন সময় বিদ্রোহ করে বসতে পারে ওরা। জাহাজে মহামারীর আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, ওদিকে দ্রুত অবনতি হচ্ছে আবহাওয়ার।

আর দেরি করা উচিত মনে করলেন না আটলান্টার ক্যাপ্টেন স্টার্লিং। ক্যারিবিয়ান সফর বাতিল করে তাড়াতাড়ি পোর্টসমাউথের দিকে জাহাজের মুখ ঘোরাবার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু কোনদিনই আর পোর্টসমাউথে ফিরে এল না আটলান্টা।

ক্যাপ্টেন স্টার্লিং-এর অকস্মাৎ মত পরিবর্তনের কথা কিন্তু অ্যাডমিরালটি জানল না। অথচ এসব ক্ষেত্রে নিয়ম হল নিয়মের বহির্ভূত কিছু করার আগে, বা একান্তই আগে জানানো সম্ভব না হলে করে ফেলার পর যত শীঘ্র সম্ভব অ্যাডমিরালটিকে তা জানাতে হবে। কিন্তু অ্যাডমিরালটিকে না জানালেও স্ত্রীকে খবরটা ঠিকই জানিয়েছিলেন স্টার্লিং। ৩০ জানুয়ারি একটা দ্রুতগামী জাহাজ বারমুডা থেকে ইংল্যান্ড যাচ্ছিল, সেই জাহাজের ক্যাপ্টেনের হাতে স্ত্রীকে একটা চিঠি পাঠিয়েছিলেন তিনি, জানিয়েছিলেন মার্চের গোড়াতেই দেশে ফিরে আসছেন।

আটলান্টার আরও একজন লোক খবর পাঠিয়েছিলেন ইংল্যান্ডে—জাহাজের নেভিগেটর লেফটেন্যান্ট স্টিফেনস। পোর্টসমাউথের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কাছে চিঠি লিখেছিলেন স্টিফেনস, পয়লা মার্চের মধ্যেই তিনি ইংল্যান্ডে পৌঁছুবার আশা রাখেন।

নির্দিষ্ট সময়ে অর্থাৎ মার্চের প্রথম সপ্তাহে পোর্টসমাউথ বন্দরে এসে ভিড়ল না আটলান্টা। কিন্তু তাতে একটুও উদ্বিগ্ন হলেন না মিসেস

স্টার্লিং বা স্টিফেনসের বন্ধু। মাঝে মধ্যে অমন এক আধটু দেরি করেই থাকে জাহাজ, এ তাঁরা জানেন।

আর অ্যাডমিরালটির তো চিন্তিত হবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। কারণ তারা জানেই না যে যাত্রা বাতিল করে পোর্টসমাউথের দিকে রওনা হয়েছে আটলান্টা। এক মাস পরে অর্থাৎ এপ্রিলের প্রথম দিকেও যখন জাহাজ ফিরল না তখনও চিন্তিত হল না অ্যাডমিরালটি। কারণ তাদের মতে মাত্র ফেরার সময় হয়েছে আটলান্টার, আরও দু'একদিন দেরি হলে ক্ষতি কি? প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট খাবার আর পানি আছে জাহাজে। বোধহয় আবহাওয়া খারাপের জন্যে ফিরছে না। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও জানতে পারল না তারা, আরও এক মাস আগেই ফেরার কথা ছিল ওটার।

এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহও পেরিয়ে যাবার পথে, কিন্তু ফিরল না অ্যাটলান্টা। অ্যাডমিরালটি তবুও চিন্তিত নয়। ওদিকে দেরি দেখে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছে দুশো ক্যাডেটের অভিভাবকেরা। অ্যাডমিরালটি অফিসে চিঠি, টেলিগ্রাম কিংবা সশরীরে উপস্থিত হয়ে রোজ খোঁজ নিতে শুরু করল তারা।

এপ্রিলের তেরো তারিখে আটলান্টার বিলম্বের কথা প্রথম ছাপা হল লন্ডন টাইমস পত্রিকায়। তারপর থেকে প্রতিদিনই জাহাজটার কথা কিছু না কিছু ছাপা হতে থাকল পত্রিকায়। কানাঘুষা শুরু হল।

এই সময় 'টামার' নামে একটা জাহাজ ইংল্যান্ডে ফিরে এল। কে একজন বলে বসল টামার জাহাজের ক্যাপ্টেন নাকি আটলান্টিকের কোথায় একটা উল্টে যাওয়া জাহাজ দেখে এসেছেন। ব্যস। শুরু হল চেঁচামেচি। সব ক'জন অভিভাবক আর তাদের বন্ধু-বান্ধবরা সমস্বরে চেঁচাতে লাগল, আসলে উল্টে যাওয়া জাহাজটাই আটলান্টা। অভিভাবকদের চাপে বাধ্য হয়ে অ্যাডমিরালটি টামার জাহাজের ক্যাপ্টেনকে ব্যাপারটা সত্যি কিনা জিজ্ঞেস করল। শুনে ক্যাপ্টেন তো

অবাক! না, এ রকমের কোন কথাই তো তিনি কখনও বলেননি!

হঠাৎ একদিন অভিভাবক আর উৎসাহী জনতার প্রচণ্ড ভিড় দেখা গেল পোর্টসমাউথ জাহাজ ঘাটায়। ব্যাপার কি? না, কোত্থেকে জানি খবর পেয়েছে তারা ফিরে এসেছে আটলান্টা।

১৭ এপ্রিল অ্যাডমিরালটি অফিসে হানা দিয়ে প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ল দুশো ক্যাডেটের অভিভাবকরা। তারা জানতে চায়, কি করছে অ্যাডমিরালটি। বসে বসে ঝিমুচ্ছে, না জাহাজের খোঁজ খবর নিচ্ছে কিছু?

আর অপেক্ষা করা সম্ভব হল না। 'ওয়াই' নামে একটা সন্ধানী জাহাজ অ্যাজোরস দ্বীপের দিকে পাঠাল অ্যাডমিরালটি। উদ্দেশ্য আটলান্টার কোন খবর যদি পাওয়া যায়।

১৯ এপ্রিল 'অ্যাভন' নামে একটা গানবোট এসে ভিড়ল পোর্টসমাউথ বন্দরে। অ্যাভনের ক্যাপ্টেন জানালেন অ্যাজোরসের ফায়াল বন্দরের কাছে জাহাজের ধ্বংসাবশেষ দেখে এসেছেন তিনি। তবে সেটা কোন্ জাহাজের বলতে পারবেন না। এপ্রিলের গোড়ার দিকে প্রচণ্ড ঝড় হয়েছিল অ্যাজোরসে। দুশো ক্যাডেটের অভিভাবকেরা ধরেই নিল ওই ঝড়ে পড়েই ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে আটলান্টা, আর তাই দেখে এসেছেন 'অ্যাভন' জাহাজের ক্যাপ্টেন। অতএব কাঁদতে বসে গেল তারা।

এতদিনে অ্যাজোরস সাগরে গিয়ে পৌঁছেছে ওয়াই। এই সময় একদিন জাহাজের নাবিকেরা দেখল, তাদের জাহাজ থেকে দূরে একটা দাঁড় টানা ছোট্ট নৌকা ভাসছে সাগরের বুকে। দূরবীন দিয়ে নৌকাটাকে পরীক্ষা করতে লাগল ওয়াই-এর অফিসাররা। দেখা গেল একজন মানুষ পড়ে আছে নৌকাটায়, তবে সে জীবিত না মৃত বোঝা যাচ্ছে না। দ্রুত নৌকার কাছে পৌঁছে গেল জাহাজ। নৌকা থেকে লোকটাকে জাহাজে তুলে আনল নাবিকেরা। বেঁচেই আছে লোকটা,

তবে অবস্থা আশঙ্কাজনক।

কানে স্টেথোস্কোপ লাগিয়ে লোকটাকে পরীক্ষা করলেন জাহাজের ডাক্তার। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে হতাশ ভাবে মাথা নেড়ে বললেন, 'বহু আগেই মারা যাওয়া উচিত ছিল ওর। এখনও যে বেঁচে আছে সেটাই আশ্চর্য।'

আর বেশিক্ষণ অবশ্য ডাক্তারকে আশ্চর্য করে রাখল না লোকটা। বহু চেষ্টা করা হল, কিন্তু কথা বলার অবস্থা ফিরে পেল না, এবং মারা গেল একটু পরই। যে নৌকায় সে ভাসছিল সেটা কোন জাহাজের নৌকা বা আদৌ কোন জাহাজের নৌকা কিনা জানা গেল না। আরও সামনে এগিয়ে চলল ওয়াই।

পথে একটা জাহাজের সাক্ষাৎ পেল। ইংল্যান্ডে যাচ্ছে জাহাজটা। ওটাকে থামিয়ে খোঁজ খবর করল ওয়াইয়ের লোকেরা, কিন্তু আটলান্টার কোন খবর দিতে পারল না জাহাজের লোকেরা। বরং নৌকায় ভাসমান লোকটার কথা জেনে গেল তারা। অল্প কয়দিন পরই খবরটা পৌঁছে গেল ইংল্যান্ডে।

আবার এসে অ্যাডমিরালটি অফিসে চড়াও হল দুশো ক্যাডেটের অভিভাবকেরা। ওদের প্রত্যেকেরই বিশ্বাস, নৌকা থেকে উদ্ধার করা লোকটা আসলে তারই ছেলে। অ্যাডমিরালটি আশ্বাস দিল তাদেরকে—আগে পোর্টসমাউথে ফিরে আসুক ওয়াই, তারপর মৃত লোকটা যার ছেলে, অবশ্যই শেষকৃত্যের জন্যে কফিন সুদ্ধ মৃতদেহটা তাকে দিয়ে দেয়া হবে।

আরও কয়েকদিন পর অনুসন্ধান শেষ করে পোর্টসমাউথে ফিরে এল ওয়াই। খবর পেয়ে সাথে সাথেই শোকের পোশাক পরে মৃত ছেলেকে গোরস্থানে নিয়ে যাবার জন্যে এসে হাজির হল দুশো ক্যাডেটের অভিভাবক। কিন্তু সে কপালেও হল না তাদের। মৃতদেহটা আসলে একজন বৃদ্ধ পর্তুগীজ জেলের। দেখলে যে কেউই স্বীকার

করবে তা।

শোকের পোশাক পরে পোর্টসমাউথ বন্দরে এসে কিন্তু ভুল করেনি সেদিন দুশো ক্যাডেটের অভিভাবক। কারণ ওয়াইয়ের ক্যাপ্টেনের দেয়া রিপোর্ট থেকে তারা জেনে গেল ছেলের খোঁজে আর কোনদিন পোর্টসমাউথ বন্দরে আসতে হবে না তাদের। কোনদিনই আর ঘরে ফিরে আসবে না তাদের ছেলেরা। কিন্তু তবু এর পরেও বহুদিন পোর্টসমাউথ জাহাজ ঘাটায় এসেছিল অবুঝ অভিভাবকেরা। জানত তারা আটলান্টা আর ফিরে আসবে না কোনদিন, তবুও অ্যাডমিরালটি অফিসে আটলান্টার কোন খবর আছে কিনা, খোঁজ নিত তারা। আসলে জলজ্যান্ত ছেলেগুলো চিরকালের জন্যে হারিয়ে গেছে এটা কিছুতেই স্বীকার করে নিতে পারছিল না বাপ-মায়ের মন।

অ্যাডমিরালটি কিন্তু ভাবছে অন্য কথা। কি করে গায়েব হয়ে গেল জাহাজটা? অনেক ভেবেও কোন কারণ বের করতে পারল না তারা।

ইতিমধ্যে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে একদিন দেশে ফিরে এল ভারলিং। আটলান্টা ফেরেনি শুনে সে বলে বেড়াতে লাগল—ও জাহাজ ফিরবে কি! যা মাথাভারি ওটার, আরও আগেই যে উল্টে যায়নি তাই আশ্চর্য। জাহাজটা উল্টে যাবে, একথা নিয়ে নাকি প্রায়ই আটলান্টার অফিসারদের সাথে তর্ক হত তার।

আবার শুরু হল অভিভাকদের তুমুল বিক্ষোভ। এমন একটা মাথাভারি জাহাজে করে কেন অতগুলো সোনার ছেলেকে মরতে পাঠানো হল, এই বলে তীব্র সমালোচনা শুরু করল সংবাদপত্রগুলো। ভারলিংও সায় দিল তাতে। টিকতে না পেরে একদিন অ্যাডমিরালটির একজন উচ্চপদস্থ অফিসার দেখা করল ভারলিং-এর সাথে। তাদের মধ্যে কি কথা হল কে জানে, কিন্তু তারপর থেকে ভারলিং একদম চুপ। আটলান্টা সম্পর্কে হ্যাঁ না আর কিছুই বলে না সে।

এবার কাজে নামল ব্রিটেনের রয়্যাল নেভি। চ্যানেল স্কোয়াড্রনের

পাঁচটা জাহাজ নিয়ে উত্তর আটলান্টিকের পূর্ব অঞ্চল তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াল। সম্ভাব্য সব রকমের খোঁজ খবর নিল। কিন্তু আটলান্টার সামান্যতম খবরও জোগাড় করা গেল না। এমন তো হবার কথা নয়? ঝড় বা কোন প্রাকৃতিক কারণে জাহাজ ধ্বংস হয়ে গেলে তার কোন না কোন চিহ্ন বা খবর পাওয়া যায়ই। তাহলে কি হল জাহাজটার?'

এই সময় আরেকটা জাহাজ হারানর খোঁজ পাওয়া গেল। জাহাজটার নাম 'বে অফ বিস্কে'। রেঙ্গুন থেকে লিভারপুল আসছিল। ৭ মে অ্যাজোরস পৌঁছবার কথা ওটার। হিসেব করে দেখা গেল একই সময়ে অ্যাজোরস পৌঁছবার কথা আটলান্টারও। সন্দেহ করা হল, ঠিক সময়েই অ্যাজোরস পৌঁছেছিল দুটো জাহাজ এবং কোন অসতর্ক মুহূর্তে একটার সাথে আর একটার ধাক্কা লেগে দুটোই ডুবে গেছে সাগরে।

ভাল কথা। নাহয় বোঝা গেল যে দুটো জাহাজই পরস্পরের সাথে ধাক্কা লেগে ডুবে গেছে। এর আগেও অমন ধাক্কাধাক্কি হয়েছে দুটো জাহাজের মধ্যে, কিন্তু সেক্ষেত্রে তাদের ডুবে যাওয়ার কোন না কোন নিদর্শন পাওয়া গেছেই।

কিন্তু 'বে অফ বিস্কে' আর 'আটলান্টা' যে ডুবে গেছে তার নিদর্শন কোথায়? আর যে জায়গায় ডুবে গেছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে সে এলাকাটা মোটেই নির্জন নয়। প্রায় রোজই কোন না কোন জাহাজ সে পথে যাচ্ছে—আসছে।

এই সময়ই একদিন একটা কাণ্ড ঘটল। সাগরের দুই বিভিন্ন এলাকা হতে উদ্ধার করা হল দুটো ভাসমান বোতল। বোতল দুটো খুলে দেখা গেল সত্যিই মেসেজ আছে বোতলে। দুটো বোতলেরই মেসেজের অর্থ এক, কিন্তু ভিন্ন হাতের লেখা। দুটো মেসেজেই একটা নির্দিষ্ট দিন এবং স্থান দিয়ে বলা হয়েছে, ওই দিন ওই স্থানে ডুবে যাচ্ছে আটলান্টা। অ্যাডমিরালটির কেমন সন্দেহ হল। তারা ভাল মত

পরীক্ষা করে দেখল মেসেজ দুটো। ঠিকই সন্দেহ করেছিল তারা। দুটো মেসেজই ভুয়া।

শেষ পর্যন্ত কোন সমাধান হল না আটলান্টা রহস্যের। আটলান্টার কথা উঠলেই নাকি ডেভিলস ট্রায়াঙ্গলকে। (বারমুডা ট্রায়াঙ্গলকে এই নামে অভিহিত করে থাকে কেউ কেউ) অভিশাপ দিত দুশো ক্যাডেটের অভিভাবক। কিন্তু সে অভিশাপে কি কোন্ ক্ষতি হয়েছে ডেভিলস ট্রায়াঙ্গলের?

চলতি শতকের ঘটনা। ১৯১৮ সাল। ইউ এস নেভির কয়লাবাহী জাহাজ ‘ইউ এস এন সাইক্লপসে’ এবার কিন্তু কয়লার পরিবর্তে ম্যাঙ্গানিজ বোঝাই করা হল। মালবাহী বিশাল এই জাহাজটির দৈর্ঘ্য পাঁচশো বেয়াল্লিশ ফুট। উনিশ হাজার ছশো টনের জাহাজ ওটি। মার্চের চার তারিখে বারবেডস বন্দর ত্যাগ করল সাইক্লপস।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিখ্যাত বন্দর বারবেডস। এখান থেকে জাহাজ যাবে আমেরিকার পূর্ব উপকূলে নরফোক বন্দরে। কিন্তু নরফোক পৌঁছল না সাইক্লপস। তখন যুদ্ধের সময়। শত্রু পক্ষের জাহাজকে ঘায়েল করার জন্যে মাইন পাতা থাকত সাগরে। মাইনের সাথে টক্কর লেগে কি ডুবে গেল জাহাজটি? নাকি জার্মান সাবমেরিন টর্পেডো মেরে ডুবিয়ে দিয়েছে ওটাকে?’

খোঁজ নিয়ে দেখা গেল দুটোর কোনটাই নয়। শত্রুপক্ষের কোন জাহাজ ডুবিয়ে দিতে পারলে সে-কথা গলা ফাটিয়ে জানান দিত জার্মানরা। কিন্তু সাইক্লপসের ব্যাপারে ওরা একেবারে চুপ। না, সাইক্লপসকে ডোবায়নি ওরা। যুদ্ধের পর জানা গেল সাইক্লপস যে পথে গিয়েছে সে পথে কখনও কোন মাইন পাতেনি জার্মানরা। সবচেয়ে বড় কথা, মাইন বা টর্পেডোর আঘাতে জাহাজ ডুবে যাবার আগে অন্তত একবার এস. ও. এস পাঠাবার সময় পাওয়া যায়। কিন্তু সাইক্লপস

থেকে কোন জরুরী তারবার্তা পাওয়া যায়নি। লাইফ বোটে করেও কেউ প্রাণ বাঁচাতে পারেনি। জাহাজ ডুবে যাবার পর কোন না কোন চিহ্ন সাগরের পানিতে ভাসতে দেখা যায়। সে রকম কোন চিহ্নের নাম গন্ধও পাওয়া যায়নি।

তবে কি ঝড়ের টানে ভুল পথে চলে গেল জাহাজ? কিন্তু তাহলেও তো ওয়্যারলেসের মাধ্যমে বিপদ সংকেত পাঠানো হত সাইক্লপস থেকে। অভ্যন্তরীণ কোন বিস্ফোরণ ঘটেছিল যাতে প্রথমেই ধ্বংস হয়ে যায় জাহাজের রেডিও রুম? হতে পারে। এবং এ সন্দেহের ওপর ভিত্তি করে জাহাজের যাত্রাপথের দুপাশের শত শত মাইল দূর পর্যন্ত সাগরের পানি আর দ্বীপগুলোতে তন্ন তন্ন করে সূত্র খোঁজা হল। কিন্তু কিসের কি? বিন্দুমাত্র খোঁজ পাওয়া গেল না সাইক্লপসের। শেষ পর্যন্ত লিটারারি ডাইজেস্টের মত খ্যাতনামা পত্রিকাও মন্তব্য করে বসল এত করেও খোঁজ পাওয়া গেল না সাইক্লপসের, কে জানে স্কুইড গোষ্ঠীর কোন অজানা অতিকায় প্রাণী শুঁড় বাড়িয়ে জাহাজখানাকে সাগরের তলায় টেনে নিল কিনা?

১৯৫০ সালের কথা। তিনশো টন কীটনাশক পদার্থ বোঝাই করে ভেনিজুয়েলার পুয়েরটো ক্যারেলো বন্দরের উদ্দেশ্যে জর্জিয়ার সাভানা ত্যাগ করল তিনশো পঞ্চাশ ফুট দীর্ঘ মালবাহী জাহাজ সান্ড্রা আটাশজন লোক সহ। কোনদিনই আর গন্তব্য স্থানে পৌঁছায়নি জাহাজটি। তাহলে গেল কোথায়? বারমুডা ট্রায়াঙ্গল কথা বলতে পারলে হয়ত তার উত্তর পাওয়া যেত।

মাত্র সেদিনের কথা। ১৯৭৩ সালের ২৩ মার্চ ভারজিনিয়ার নিউ পোর্ট নিউজ বন্দরে কয়লা বোঝাই করে দেশের দিকে রওনা দিল ৩০০০ টনের জার্মান মালবাহী জাহাজ 'অ্যানিটা'। বত্রিশ জন নাবিক সহ নিরুদ্দেশ হয়ে গেল জাহাজটি।

সেই প্রাচীন কাল থেকেই এই বারমুডা ট্রায়াঙ্গলে এসে একের পর

এক হারিয়ে যাচ্ছে জাহাজগুলো। লয়েডস অফ লন্ডনের হিসেব মতে মাত্র গত দশ বছরেই এই এলাকায় মোট ষাটখানি জাহাজ এবং নশো পঁয়ত্রিশ জন লোক হারিয়ে গেছে।

আবার ফিরে যাচ্ছি পঞ্চাশ ষাট বছর আগে। 'পোর্টানোকা' নামে একটা সুন্দর যাত্রীবাহী জাহাজ অনেকটা বাস সার্ভিসের মত যাতায়াত করত তখন ফ্লোরিডার ট্যাম্পা থেকে কিউবার কিছু দূরের আইল অফ পাইনস এবং সেখান থেকে গ্র্যান্ড কেম্যান আইল্স পর্যন্ত। ছোট বড় অনেকগুলো দ্বীপ আছে এই রুটে। এদের প্রত্যেকটি দ্বীপে স্টপেজ ছিল পোর্টানোকার।

র‍্যাড মিলার নামে একজন চিত্র শিল্পী বাস করতেন তখন আইল অফ পাইনসে। পোর্টানোকার নিয়মিত যাত্রী ছিলেন র‍্যাড মিলার। রং-তুলি ক্যানভাস নিয়ে এ দ্বীপ থেকে ও দ্বীপে ঘুরে বেড়াতেন চিত্রকর, আর প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি আঁকতেন।

উনিশশো ছাব্বিশ সালের এক সুন্দর সকালে ছবি আঁকার সরঞ্জাম সহ প্রস্তুত হয়ে আইল অফ পাইনসের জাহাজ ঘাটায় এসে অন্যান্য যাত্রীদের সাথে পোর্টানোকার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন র‍্যাড মিলার। একটু পরই দূরে জাহাজটাকে আসতে দেখলেন তিনি। ক্রমশ জেটির দিকে এগিয়ে আসছে জাহাজটা। কাঁধে ব্যাগ তুলে নিয়ে সবার আগে জাহাজে ওঠার জন্যে সামনে এগিয়ে গেলেন র‍্যাড মিলার। এমন সময় তাঁর চোখে পড়ল অদ্ভুত ব্যাপারটা। তার মনে হল উজ্জ্বল একটা সাদা আলো ঠিকরে পড়ছে যেন জাহাজের গা থেকে। আগুন ধরে গেল জাহাজটায়? নাকি মাথা খারাপ হয়ে গেল তাঁর? মাত্র কয়েক সেকেন্ড ওই উজ্জ্বল আলো দেখতে পেলেন র‍্যাড মিলার, তারপরই তা মিলিয়ে গেল ভোজবাজির মত। আধঘন্টা পরই জেটিতে ভিড়ল পোর্টানোকা। হুড়োহুড়ি করে জাহাজে উঠে গেল যাত্রীরা। কিন্তু আগের জায়গায় স্থির দাঁড়িয়ে থাকলেন চিত্রকর।

চিৎকার করে জাহাজ ছাড়ার নির্দেশ দিলেন ক্যাপ্টেন। চমক ভাঙল র‍্যাড মিলারের। দ্রুত কয়েক পা এগিয়ে গেলেন তিনি। কিন্তু কি ভেবে থমকে দাঁড়ালেন আবার। নাহ্, এ জাহাজে আজ আর যাবেন না তিনি।

ঘরে ফিরে এলেন র‍্যাড মিলার। নিয়মিত যাত্রীদের মধ্যে একমাত্র র‍্যাড মিলারই সেদিন জাহাজে ওঠেননি। বেঁচে গেলেন একমাত্র তিনিই। কারণ পরবর্তী স্টপেজে আর পৌঁছায়নি পোর্টানোকা।

ঝকঝকে পরিষ্কার ছিল সেদিনের আকাশ। সমুদ্র শান্ত। প্রাকৃতিক দুর্যোগের চিহ্ন মাত্রও ছিল না। তাছাড়া আইল অফ পাইনস থেকে পরবর্তী স্টপেজের দূরত্বও একেবারে অল্প। পরিষ্কার আবহাওয়ায় ওইটুকু সমুদ্র পথের কোথায় হারিয়ে গেল পোর্টানোকা? তবে কি ওই উজ্জ্বল আলোর সাথে এ রহস্যের কোন যোগাযোগ আছে? পোর্টানোকা থেকে অন্তত একজন যাত্রীও বেঁচে ফিরে আসতে পারলে হয়ত সমাধান হয়ে যেত রহস্যটার।

বেস্ট নোন সেইলার অভ আমেরিকা বলতে জোশুয়া স্লোকামকেই বোঝায়। পালতোলা এক মাস্তুলের ছোট্ট একটা জাহাজে চেপে সারা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে এসেছিলেন তিনি, একা। ছেচল্লিশ হাজার মাইল সমুদ্র পথ পার হবার সময় জলদস্যুর তাড়া খেয়েছেন, প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে পড়েছেন, অসভ্য বুনো মানুষের আক্রমণ ঠেকিয়েও দেশে ফিরে আসতে পেরেছিলেন এই জোশুয়া স্লোকাম। আর একবার আটকা পড়ে গিয়েছিলেন ভয়ঙ্কর শৈবাল সাগরে। এক সপ্তাহ আটকে থাকার পর সামুদ্রিক আগাছার জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন তিনি। এমন দুঃসাহসী, বহুদর্শী, অভিজ্ঞ নাবিকও বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের হাত থেকে রেহাই পাননি। সেকাহিনী বর্ণনার আগে তাঁর সম্পর্কে আরও কিছু বলে নেয়া দরকার।

নোভাস্কিয়ার ব্রায়ারস আইল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন জোশুয়া

স্লোকাম। দুঃসাহসী জেলে বলে নাম আছে এ দ্বীপের লোকদের। প্রচণ্ড ঝড়ের দিনেও খ্যাপা সাগরকে তুচ্ছ করে মাছ ধরতে বেরিয়ে পড়ে ওরা। ভাল জাহাজ তৈরি করতেও ওস্তাদ ওরা। জন্মসূত্রে দুটো গুণেরই অধিকারী হতে পেরেছিলেন স্লোকাম। বালক বয়সেই নৌকা নিয়ে একা একা বেরিয়ে পড়তেন খোলা সাগরে; পৃথিবী প্রদক্ষিণের স্বপ্ন দেখতেন তখন থেকেই। ষোলো বছর পেরোতে না পেরোতেই একটা জাহাজের ক্যাপ্টেন হয়ে ভয়ঙ্কর বিপদ সঙ্কুল উত্তর আলাস্কান সাগর ঘুরে এলেন স্লোকাম। এ ঘটনার পর পরই সানফ্র্যানসিসকো থেকে হনলুলু পর্যন্ত যাতায়াতকারী একটি জাহাজের ক্যাপ্টেন নিযুক্ত হলেন তিনি। আরও কিছুদিন পর চলে গেলেন ফিলিপাইনে। বসে থাকার পাত্র তিনি নন। ফিলিপাইনে গিয়ে ব্যবসা শুরু করলেন। কাজের ফাঁকে ফাঁকে জাহাজ নিয়ে দুঃসাহসী অভিযানও চলল। সারা পৃথিবীর নাবিক মহলে ছড়িয়ে পড়ল জোশুয়া স্লোকামের নাম। কেউ কেউ বলে বেড়াতে লাগল সাগরকে আসলে যাদু করতে জানেন স্লোকাম।

ছেলেবেলা থেকেই মনে মনে পুষে রাখা ইচ্ছাটা কাজে পরিণত করার সময় এসে গিয়েছে। প্রস্তুত হতে শুরু করলেন স্লোকাম। সবচে আগে একটা মজবুত জাহাজ দরকার। ছত্রিশ ফুট লম্বা এক মাস্তুলের পাল তোলা একটা স্লুপ জাহাজ তৈরি করলেন তিনি। নাম দিলেন 'স্প্রে'। জাহাজ তৈরি শেষ হতেই তার পৃথিবী প্রদক্ষিণের কথা ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

১৮৯৭ সালের এক শুভ দিন দেখে স্প্রেতে চেপে বেরিয়ে পড়লেন স্লোকাম। পৃথিবীর যে বন্দরেই যান বিপুল সম্বর্ধনা জানায় তাঁকে লোকে। এভাবেই ছেচল্লিশ হাজার মাইল সমুদ্রপথ পাড়ি দিয়ে আঠারোশো আটানব্বই সালে দেশে ফিরে এলেন পরিশ্রান্ত স্লোকাম।

নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নেবার জন্যে জ্যামাইকার অদূরে গ্র্যান্ড কেম্যান নামে এক দ্বীপে চলে গেলেন তিনি। এককালে জলদস্যুদের রাজত্ব ছিল

দ্বীপটায়। কয়েক বছর চুপচাপ কাটাবার পরই হাঁপিয়ে উঠলেন স্লোকাম। হাতছানি দিয়ে আবার তাকে ডাকতে শুরু করেছে রহস্যময় সাগর। বেরিয়ে পড়ার তাগিদ অনুভব করতে লাগলেন তিনি। কাজেই ছোটখাট মেরামতের জন্যে ডক ইয়ার্ডে পাঠালেন স্প্রেকে

কয়েকদিনের মধ্যেই তৈরি হয়ে ফিরে এল স্প্রে। ১৯০৯ সালের ১৪ নভেম্বর অনুকূল বাতাসে পাল তুলে দক্ষিণ আমেরিকার দিকে যাত্রা করলেন স্লোকাম। কিন্তু গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারলেন না তিনি। কারণ বারমুডা ট্রায়াঙ্গলকে যাদু করার কায়দা হয়ত শিখতে পারেননি সাগরের যাদুকর।

কি হল স্প্রে আর স্লোকামের? আগুন লেগেছিল? কিন্তু আগুন নেভানর তো সব ব্যবস্থাই ছিল জাহাজে। ঝড়ের কবলে পড়েছিল? তাও না, কারণ ওই সময়ে ওই এলাকায় ঝড়ের কোন রিপোর্ট নেই আবহাওয়া অফিসে। কেউ কেউ আবার বলেন রাতের বেলা কোন বিশাল স্টীমারের সঙ্গে ধাক্কা লেগে ডুবে গেছে স্প্রে। কিন্তু জোশুয়া স্লোকামের মত অভিজ্ঞ নাবিক আর যেভাবেই মরুক, অন্তত অন্য জাহাজের গায়ে ধাক্কা খেয়ে মরতে পারেন না। তাছাড়া যে স্টীমারের সাথে ধাক্কা লাগত তার কোন না কোন যাত্রী বা নাবিকের মুখ থেকে কথাটা প্রকাশ হয়ে পড়তই। কাজেই এ অনুমানও ধোপে টেকে না। তাহলে? একই উত্তর, বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের আর এক রহস্য।

সফেস্ট অ্যান্ড ফাইনেস্ট ক্র্যাফট অ্যাফ্লোট—পঁয়তাল্লিশ ফুট লম্বা, 'রেভোনক' নামের ইয়টটিকে ওই নামেই আখ্যায়িত করেছিলেন কনোভার-ন্যাসট পাবলিকেশন ইনক্-এর প্রেসিডেন্ট মি. হারভে কনোভার। কোটিপতি ব্যবসায়ী মি. কনোভার। 'ইয়টিং' এবং 'অ্যাভিয়েশন এজ' নামক দুটো পত্রিকাও বেরোত তাঁর প্রতিষ্ঠান থেকে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে কনোভার এয়ার কোরের পাইলট

ছিলেন তিনি। নাবিক হিসেবেও যথেষ্ট নাম ছিল তাঁর। মিয়ামি থেকে ন্যাসো পর্যন্ত ইয়ট রেসে তিন তিনবার জিতেছিলেন তিনি। রেভোনক ইয়টখানি তাঁরই। নিজের নাম Conover-এর অক্ষরগুলো উল্টে দিয়ে তিনি ইয়টের নাম রাখেন Revonoc. সারা আমেরিকায় তখন তাঁর ইয়টখানির জুড়ি ছিল কিনা সন্দেহ।

১৯৫৮ সালের জানুয়ারি সবে শুরু হয়েছে। সেদিন বুধবার। সকাল থেকেই আকাশ পরিষ্কার, ঝড়ের কোন লক্ষণ নেই। ফ্লোরিডার কি ওয়েস্ট জাহাজ ঘাটে সমবেত হয়েছেন কয়েকজন ইয়ট যাত্রী। এঁরা হলেন মিসেস কনোভার, সাতাশ বৎসর বয়স্ক কনোভার জুনিয়র এবং তাঁদের বন্ধু মিস্টার ও মিসেস উইলিয়াম ফুগেনম্যানস। এঁরা সবাই কনোভারের রেভোনকে চড়ে হাওয়া খেতে চলেছেন।

একে একে সবাই উঠে গেল রেভোনকে। ইয়টে উঠেই কিন্তু ঘাবড়ে গেলেন মিসেস ফ্লুগেনম্যানস। কেন জানি মনে হল তাঁর উল্টে যাবে ইয়টটা। শেষ পর্যন্ত নেমেই গেলেন তিনি ইয়ট থেকে। একটু পরই পাল তুলে দিয়ে রাজহংসীর মত সাগরে ভেসে চলল রেভোনক। এক এক করে কেটে গেল চারদিন। ইতিমধ্যে ঝড় উঠল গালফ স্ট্রীমে। টনক নড়ল বন্দর কর্তৃপক্ষের। তাই তো, যেখানে রোজ তিন চারবার করে রেভোনক থেকে ওয়্যারলেসে খবর আসার কথা সেখানে চার দিন পর্যন্ত একটা খবরও এল না, এ কেমন কথা?’

ঠিক একই দুশ্চিন্তায় ভুগতে শুরু করলেন কনোভারের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বন্দর কর্তৃপক্ষের সাথে দেখা করে মিয়ামি কোস্টগার্ডকে খবর দেয়ার ব্যবস্থা করলেন তিনি। প্রথমে হালকা ভাবে নিল সবাই ব্যাপারটা, তারপর সত্যি সত্যিই চিন্তিত হয়ে পড়ল। রেভোনককে খুঁজতে বেরোল মিয়ামি কোস্টগার্ডের জাহাজ, বিমান। সম্ভাব্য সমুদ্র সীমার ভেতর প্রত্যেকটি দ্বীপে, প্রত্যেকটি বন্দরে খোঁজ নেয়া হল। কিন্তু পাত্তা নেই রেভোনকের।

এক লক্ষ বর্গ মাইলের ভেতর কোথাও দেখা গেল না রেভোনককে। শেষ পর্যন্ত মিয়ামির আশি মাইল উত্তরে এক জায়গায় বারো ফুট লম্বা রেভোনক জুনিয়রকে সাগরে ভাসতে দেখা গেল। দেখে শুনে অনুমান করা হল ইয়ট থেকে স্থানচ্যুত হয়ে সাগরে পড়ে গিয়েছিল লাইফবোটটি।

অসম্ভব মনে হল ব্যাপারটা। রেভোনকের মত ইয়ট আর যাই হোক গালফ স্ট্রীমের ওই সামান্য ঝড়ে কিছুতেই ডুবে যেতে পারে না। এর আগে অনেক ভয়ঙ্কর ঝড়ের সাথে টক্কর দিয়ে একাধিকবার নিরাপদে বন্দরে ফিরে এসেছে রেভোনক। তাহলে?

বোধহয় সেফেস্ট অ্যান্ড ফাইনেস্ট ক্র্যাফটের দম্ভ ভেঙে দেয়ার জন্যেই কাজটা করল বারমুডা ট্রায়াঙ্গল। একটা চিঠি পেলেন সেদিন আমেরিকার মোটর বোটিং পত্রিকার সম্পাদক। চিঠিটা লিখেছেন কাউন্ট ক্রিস্টোফার ডি গ্র্যাবাউসকি নামে আমেরিকাবাসী, এক পোলিশ ভদ্রলোক। চিঠির বিষয়বস্তু হল, উনষাট ফুট দীর্ঘ একটি ইয়টে চেপে নাকি তিনি ছ'মাসে আট হাজার মাইল সমুদ্র পথ পাড়ি দেবেন। তাঁর সাথে থাকবেন ইয়টের মালিক ও তাঁর স্ত্রী।

'এনচ্যানট্রেস' নামে ওই ইয়টটির ক্যাপ্টেন ডি গ্র্যাবাউসকি। দুঃসাহসিক নাবিক হিসেবে ইতিপূর্বেই খ্যাতি অর্জন করেছেন তিনি। একবার পঁচিশ ফুট লম্বা 'টেথিস' নামের একটা নৌকায় চেপে তাঞ্জিয়ার থেকে আটলান্টিক পার হয়ে, বারমুডা ট্রায়াঙ্গল অতিক্রম করে নিউইয়র্ক পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন তিনি, একা।

আনকোরা নতুন নয় অবশ্য এনচ্যানট্রেস ইয়টখানি, তবে নতুন জাহাজের চেয়ে কোন অংশে কম নয় এটা। ডেক এবং অন্যান্য অংশ সেগুন ও মেহগনি কাঠের তৈরি। অতিরিক্ত শক্তিসম্পন্ন ইঞ্জিন তো আছেই, পালও আছে ইয়টটায়। ইঞ্জিন থাকলেও ইয়টে পাল রাখা আজকালকার একটা ফ্যাশন। রেডিও ট্র্যান্সমিটার, রেডিও টেলিফোন,

রেডিও ডিরেকশন. ফাইন্ডার, সবই বসানো আছে জাহাজে। আছে প্রচুর পরিমাণে লাইফ জ্যাকেট আর লাইফ বেল্ট। ফাইবার গ্লাসের তৈরি আট ফুট লম্বা একটি লাইফবোটও আছে।

ইয়টটি কিনতে পেরে তার মালিক পেলটন খুব খুশি। এর আগে কখনও ইয়টে চেপে সাগর পাড়ি দেননি পেলটন। তবে তাঁর বহুদিনের ইচ্ছে এরকম সুন্দর একটি ইয়টে চেপে বেরিয়ে পড়েন দূর সাগরে, যেখানে আছে নারকেল গাছে ছাওয়া অজানা ছোট্ট দ্বীপ, আছে সোনালী বেলাভূমি। সেই দ্বীপে নেমে জোয়ারের পানিতে ভেসে আসা রঙিন কাঁকড়া আর চিংড়ির কাটলেট দিয়ে দুপুরের খাওয়া, তারপর নারকেল গাছের হালকা ছায়ায় বসে সাগরের মিষ্টি হাওয়া উপভোগ করতে করতে নাম না জানা অপূর্ব সব পাখির ঝাঁক দেখা। আঃ, সে কি মজা!

তখনও ডি গ্র্যাবাউসকির সাথে পরিচয় হয়নি পেলটনের। এনচ্যানট্রেসের ক্যাপ্টেন নিযুক্ত করলেন তিনি ম্যাসাচুসেটসের এক বোট ইয়ার্ডের ম্যানেজার ফ্রাংক ডেভিসকে। ১৯৬৩ সালের ২৮ নভেম্বর ইয়টে করে প্রথম সাগর ভ্রমণে বেরোলেন পেলটন, সাথে তাঁর স্ত্রী ও দুই বালক পুত্র। ১৩ ডিসেম্বর চার্লস্টন বন্দরে এসে ভিড়ল তাঁর ইয়ট। ক্যাপ্টেন ফ্রাংক ডেভিস ছুটি নিলেন এখান থেকে, বড়দিনের উৎসবে বাড়ি যাবেন তিনি।

খুঁজতে খুঁজতে এখানেই আরেকজন অত্যন্ত অভিজ্ঞ নাবিকের সন্ধান পেয়ে গেলেন পেলটন। সেই নাবিকই কাউন্ট ক্রিস্টোফার ডি গ্র্যাবাউসকি। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৩ সালের মধ্যে পঞ্চাশ হাজার মাইল সমুদ্র পথ ঘুরে বেড়িয়েছেন তিনি, একা, সে কথা আগেই বলেছি। অতুলনীয় সাহসী, দক্ষ এই অভিজ্ঞ নাবিক ক্যাপ্টেন জোশুয়া স্লোকামের স্মরণে ও সম্মানে প্রতিষ্ঠিত স্লোকাম সোসাইটির ভাইস কমোডর।

ডি গ্র্যাবাউসকিকে পেয়ে মহা খুশি পেলটন। কারণ এতবড় দক্ষ নাবিকের তত্ত্বাবধানে সাগরের যেখানে খুশি যেতে পারবেন তিনি।

অতএব আবার যাত্রা শুরু হল এনচ্যানট্রেসের। ১৯৬৪ সালের ১০ জানুয়ারি বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের ভেতর দিয়ে ইয়ট চালিয়ে চললেন ডি গ্র্যাবাউসকি, গন্তব্য ভারজিন আইল্যান্ডের সেন্ট থমাস বন্দর।

এনচ্যানট্রেস চার্লসটন বন্দর ত্যাগ করার ঠিক তিন দিন পর জ্যাকসভিল বিচ স্টেশনের কোস্ট গার্ডরা একটা বিপদ সংকেত পেল, হ্যাঁ, বিপদ সংকেত পাঠানো হচ্ছে এনচ্যানট্রেস থেকেই। ফ্লোরিডার একটু দূরে ঝড়ের মুখে পড়েছে ইয়টখানি। ইয়টের রেডিও অপারেটরকে এক, দুই, তিন এভাবে সংখ্যা গুণে যেতে অনুরোধ করল কোস্ট গার্ডদের রেডিও অপারেটর, তাহলে সিগন্যালের ফ্রিকোয়েন্সি হিসেব করে এনচ্যানট্রেসকে খুঁজে বের করা সহজ হবে।

সংখ্যা গুণতে শুরু করল এনচ্যানট্রেসের রেডিও অপারেটর। কিন্তু অপারেটরের কণ্ঠস্বর অদ্ভুত ভাবে বদলে যাচ্ছে কেন? প্রথমে একজন পুরুষের গলায় ওয়ান থেকে থ্রী পর্যন্ত শোনা যাবার পরই কণ্ঠস্বর বদলে গেল। টেন পর্যন্ত গোণা হতেই থেমে গেল কণ্ঠস্বরটা। সাথে সাথেই তার খেই ধরে টেন, নাইন, এইট এভাবে উল্টো দিকে গুণে যেতে লাগল একটি বালক। ক্রমেই দুর্বল হতে হতে এক সময় একেবারেই মিলিয়ে গেল বালকের কণ্ঠস্বর। তারপর একেবারে চুপ।

হিসেব করে বের করল কোস্ট গার্ডরা, চার্লসটনের একশো আটান্ন মাইল দক্ষিণ পুবের কোন এক জায়গায় বিপদে পড়েছে এনচ্যানট্রেস। রেডিও সিগন্যাল পাবার কয়েক মিনিটের মধ্যে রওনা হয়ে পড়ল সার্চ অ্যান্ড রেসকিও স্কোয়াড। অল্পক্ষণেই জায়গা মত পৌঁছেও গেল ওরা। কিন্তু এনচ্যানট্রেস কই? কোস্ট গার্ডদের জাহাজ, বিমান এমন কি পরে নৌবাহিনীর কয়েকটা জাহাজ মিলে বারো হাজার বর্গ মাইল ঘুরেও কোন খোঁজ পেল না এনচ্যানট্রেসের। না কোন আরোহীর লাশ বা ইয়টের ভাঙা অংশ, নিদেনপক্ষে জাহাজে অসংখ্য জিনিসের একটা ভাঙা বা ছেঁড়া টুকরো কিছুই পাওয়া গেল না। ঝড়ে ইয়ট ডুবে যাবার

পর তো কোন না কোন লক্ষণ থাকবেই। কেন থাকল না? সেই পুরানো রহস্য।

এর ঠিক তিন বছর পর। সেবারেও বড়দিনের সময়। ১৯৬৭ সালের বাইশে ডিসেম্বর রাতের বেলা আলোর মালায় ঝিকমিক করছে উৎসবের জন্যে সাজানো মিয়ামি বিচ শহর। এই শহরেরই নামের সাথে মিলিয়ে রাখা হোটেল মিয়ামি বিচের মালিক ড্যান বুরাকের একটি তেইশ ফুট লম্বা ছোট্ট, মজবুত ইয়ট আছে, নাম 'উইচক্র্যাফট'। সেদিন সন্ধ্যার পর তাঁর বন্ধু ফোর্ট লডারডেলের সেন্ট জর্জস ক্যাথলিক চার্চের ফাদার প্যাট্রিক হোর্গানকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল বুরাক, উদ্দেশ্য আলোয় মোড়া মিয়ামিকে দূর থেকে কেমন লাগে দেখা। আপত্তি করলেন না ফাদার হোর্গান। আর আপত্তির আছেই বা কি? পরিষ্কার ঝকঝকে রাতের আকাশ। ফুরফুরে হাওয়া বইছে সাগরের দিক থেকে। তাছাড়া তীর থেকে মাত্র তো মাইল খানেক দূরে যাবে ওরা।

ঠিক রাত নটায় মিয়ামি কোস্ট গার্ডের ওয়্যারলেস অপারেটর একটা বিপদ সংকেত পেল। বিপদ অবশ্য তেমন কিছু না, পানির তলার কোন কিছুর সাথে আটকে গিয়ে বেঁকে গেছে উইচক্র্যাফটের প্রপেলার। বের করা যাচ্ছে না উইচক্র্যাফটকে। না, বিপদ এখন তেমন কিছু নেই, তবে শীঘ্র সাহায্য না পেলে বিপদ ঘটতে কতক্ষণ?

খবর পাবার তিন মিনিটের মাথায় বেরিয়ে পড়ল কোস্ট গার্ডরা, জায়গামত পৌঁছে গেল উনিশ মিনিটের মাথায়। কিন্তু কোথায় উইচক্র্যাফট? ক্রমাগত উইচক্র্যাফটের উদ্দেশে বার্তা পাঠাল কোস্ট গার্ডরা, 'তোমাদের পজিশন আমাদের জানাও, তোমাদের পজিশন আমাদের জানাও।' কিন্তু পজিশন জানাল না উইচক্র্যাফট, কিংবা জানাতে পারল না। রেডিও খারাপ হয়ে গিয়ে থাকতে পারে উইচক্র্যাফটের, কিন্তু তাহলেও তো আলোক সংকেত পাঠাতে পারত

বিপন্ন ইয়ট।

হাওয়ার জোর এখন একটু বেড়েছে। কিন্তু তাতে একটা ছোট্ট নৌকাও ডুবে যাবার কথা নয়। আর দেরি করা সমীচীন মনে করল না কোস্ট গার্ডরা। গরু খোঁজা শুরু করল ওরা। উপকূল বরাবর এবং বাইরের সাগরের প্রায় সাড়ে চব্বিশ হাজার বর্গমাইল পর্যন্ত খোঁজা হল। নেই উইচক্র্যাফট। ডুবে যাবারও কোন নির্দশন নেই। আর একবার ভানুমতির খেল দেখাল বারমুডা ট্রায়াঙ্গল।

'স্করপিয়ন' এই নামের দুটো প্রাণী আছে, একটি ডাঙায় বাস করে, অন্যটি সাগরে, প্রথমটির বাংলা নাম কাঁকড়া বিছে। চার থেকে ন'ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয় এই প্রাণীগুলো। কাঁকড়ার মত দাঁড়া দুটো সামনে বাড়িয়ে দিয়ে চলাফেরা করে এরা। টিকটিকির লেজের মত দেখতে কিন্তু তারচে অনেক শক্ত আর গিটওয়ালা লেজটা বাঁকিয়ে পিঠের ওপর তুলে এনে বিপদের জন্যে তৈরি থাকে কাঁকড়া বিছে। ওই লেজের মাথার সাংঘাতিক বিষাক্ত হুল দুটো কাজে লাগায় ওরা—আত্মরক্ষা এবং শিকারের প্রয়োজনে। বড় আকারের কাঁকড়া বিছেদের ওই হুল এত বিষাক্ত যে তা ফুটিয়ে দিলে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটার সম্ভাবনা থাকে।

স্করপিয়ন নামের দ্বিতীয় প্রাণীটি এক রকমের মাছ। কই মাছের কানকোর মত ধারাল পাখনা থাকে এদের। এই পাখনার কাঁটাগুলোর মাথায় মারাত্মক বিষ থাকে। ওই কাঁটাওয়ালা পাখনা দিয়ে মানুষকে চরম আঘাত হানতে পারে স্করপিয়ন ফিশ।

বোধহয় দু'রকমের স্করপিয়নকে ভিত্তি করেই সাবমেরিনটার নাম রাখা হয়েছিল Scorpion-ss278. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় শত্রু মহলে রীতিমত ত্রাসের সঞ্চার করেছিল এই সাবমেরিনটা। হুল ও পাখনা দুটোই ছিল ওটার, তবে ভিন্ন জাতের। বিশ্বযুদ্ধের সময়েই রহস্যজনক ভাবে জাপানের অদূরবর্তী ডেভিলস সীতে হারিয়ে যায়

Scorpion-ss278. সে অন্য কাহিনী। এত বীরত্ব দেখিয়েছিল সাবমেরিনটা আর এত জাপানী জাহাজের ক্ষতি করেছিল যে আমেরিকানরা তাকে ভুলতে পারেনি। তারই স্মরণে পরবর্তীকালে কানেকটিকাট স্টেটের গ্রোটনে জেনারেলের ডাইনামিকস করপোরেশনের ইলেকট্রিক বোট কোম্পানি ডিভিশনের তত্ত্বাবধানে একটা নতুন সাবমেরিন তৈরি করল আমেরিকানরা। নাম দিল Scorpion-ss(N) 589.

২১৫ ফুট ৯ ইঞ্চি পারমাণবিক শক্তি চালিত এই সাবমেরিনটির ভেতরেই বসানো আছে নিউক্লিয়ার রি-অ্যাকটর। এ ধরনের পারমাণবিক শক্তি চালিত সাবমেরিনকে স্কিপজ্যাক ক্লাসের সাবমেরিন বলা হয়। একসঙ্গে ছয়টা পর্যন্ত টর্পেডো ছোঁড়া যায় এসব সাবমেরিন থেকে। প্রয়োজনীয় সমস্ত যন্ত্রপাতি বসানো ছিল Scorpion-ss (N) 589 সাবমেরিনটায়, কিন্তু সাগরের বেশি গভীরে নামতে পারত না ওটা। আসলে ওভাবেই বানানো হয়েছে ওটাকে। কারণ এর আগে 'থ্রেশার' নামের একটা সাবমেরিন পানির বেশি গভীরে নেমে গিয়ে কোন রহস্যময় কারণে অদৃশ্য হয়ে যায়।

১৯৫৯ সালের ১৯ ডিসেম্বর ক্যাপ্টেন ম্যাক্সিমিলিয়ান জি সিমিডের মেয়ে মিসেস এলিজাবেথ বি মরিসন মহা জাঁকজমকের সাথে পানিতে ভাসালেন Scorpion-ss(N) 589 কে। কমান্ডার নরম্যান বি বেস্যাকের নেতৃত্বে ১৯৬০ সালের ২৯ জুলাই প্রথম ডিউটিতে বেরোল স্করপিয়ন। আটলান্টিক ফ্লিটের বাষট্টি নম্বর সাবমেরিন ডিভিশনের ছ'নম্বর স্কোয়াড্রনের অন্তর্ভুক্ত করা হয় সাবমেরিনটিকে।

অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাল নতুন সাবমেরিন। বারমুডা ফ্লোরিডা ও পুয়েরটোরিকো এলাকায় অনুষ্ঠিত আক্রমণকারী এবং আত্মরক্ষাকারী মহড়ায় তার ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারল না মহড়ায় অংশ গ্রহণকারী অন্যান্য সাবমেরিন। একটার পর একটা পুরস্কার লাভ করতে থাকল

স্করপিয়ন। মার্কিন নৌবহরের প্রত্যেকটি লোক অত্যন্ত গর্বিত ভাবে উচ্চারণ করে এখন স্করপিয়নের নাম। ব্যাটল এফিশিয়েন্সি প্রতিযোগিতায় পর পর দু'বার জিতল স্করপিয়ন।

সাগরে নামার পর থেকে বহুদিন শিপ ইয়ার্ডে আসেনি স্করপিয়ন, অতএব ১৯৬৭ সালের পয়লা ফেব্রুয়ারি ভারজিনিয়া স্টেটের নরফোক ন্যাভাল শিপইয়ার্ডে আনা হল স্করপিয়নকে। আগাগোড়া চেকআপ করে প্রয়োজনীয় মেরামত বা যন্ত্রাংশ বদল করা হল, নিউক্লিয়ার রি-অ্যাকটর রিফুয়েল করা হল। আবার তৈরি হয়ে গেল স্করপিয়ন। দূর যাত্রার ডিউটিতে পাঠানো হবে এবার তাকে।

নতুন করে আর একবার ট্রেনিং দেয়া হল স্করপিয়নের নাবিকদের। আর একবার আগাগোড়া চেকআপ করে স্করপিয়নকে পাঠানো হল পুয়েরটোরিকোতে, সেখান থেকে ভারজিন আইল্যান্ডে। আক্রমণ ও আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্রগুলো পরীক্ষা করা হল এই দু'জায়গায়।

১৯৬৮ সালের গোড়ার দিকে পুরোপুরি শেষ হল স্করপিয়নের মেরামতি এবং ট্রেনিং নেবার কাজ। ফ্রান্সিস এ স্লেটারি স্করপিয়নের নতুন কমান্ডার নিযুক্ত হলেন। ১৫ ফেব্রুয়ারি সিক্সথ ফ্লিটের গার্ড নিযুক্ত করে ভূমধ্যসাগরে পাঠানো হল স্করপিয়নকে। আটলান্টিক অতিক্রম করে মার্চের প্রথম দিকে স্পেনের রোটা ঘাঁটিতে এসে পৌঁছল স্করপিয়ন, সেখান থেকে ইটালির ট্যারান্টো ঘাঁটি অর্থাৎ গন্তব্যস্থানে পৌঁছে গেল ১০ মার্চ। এবার কাজের পালা।

পুরোদমে কাজ করে গেল স্করপিয়ন। আস্তে আস্তে হাঁপিয়ে উঠছে নাবিকেরা এমন সময় এল দেশে ফেরার নির্দেশ। খুশি হয়ে উঠল নাবিকদের মন। মে মাসের এক সুন্দর সকালে আমেরিকার নরফোক বন্দরের উদ্দেশ্যে রওনা হল স্করপিয়ন। অ্যাজোরস পৌঁছে ঘাঁটিতে মেসেজ পাঠাল যে, 'ভাল আছি আমরা। ঘাঁটিতে পৌঁছতে আরও দিন সাতেক লাগবে।' সাত দিন কেন, সাত বছর পরেও আর ঘাঁটিতে ফিরে

যায়নি স্করপিয়ন।

সাতদিন পর স্করপিয়নের জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে নরফোক বেস। কিন্তু কথা মত ফিরল না স্করপিয়ন। পথে কোন বিপদ আপদ ঘটল না তো? কোন যান্ত্রিক গোলযোগ? আরও দু'দিন অপেক্ষা করার পর একটা বুলেটিন প্রচার করল ইউ এস নেভি, 'স্করপিয়ন ওয়াজ ওভারডিউ।' স্করপিয়নের সাথে যোগাযোগের ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে গলদঘর্ম হয়ে গেল নরফোক বেসের রেডিও অপারেটরের দল, কিন্তু বিন্দুমাত্র সাড়া দিল না ডুবো জাহাজ।

নয় আর সাতে ষোলো দিন পার হয়ে যাবার পর পরিষ্কার বোঝা গেল কোনদিনই ফিরবে না স্করপিয়ন। নিরানব্বই জন অফিসার আর নাবিক সহ হারিয়ে গেছে সে। সরকারী ভাবে ঘোষণা করা হল, 'স্করপিয়ন ইজ লস্ট।'

লস্ট বলেই কিন্তু চুপ করে থাকল না আমেরিকান নেভি। বোর্ড অভ এনকয়েরি গঠন করে অনুসন্ধানের প্রস্তুতি নিল ওরা। কিন্তু কথা হল অনুসন্ধান শুরু হবে কোত্থেকে? এতবড় মহাসাগরে সামান্যতমও সূত্র ছাড়া কি করে খুঁজবে তারা স্করপিয়নকে?

কিন্তু তবু খোঁজা শুরু হল। প্রথমে স্করপিয়নের যাত্রাপথ থেকে অত্যাধুনিক টিভি ক্যামেরা দিয়ে অ্যাজোরস থেকে নরফোকের মধ্যে সাগরের তলার সমস্ত জায়গার ছবি তুলতে থাকল সাবমেরিনের দল। স্করপিয়নকে খুঁজে বের করার কাজটা শুধু কঠিনই নয়, রীতিমত দুঃসাধ্য। তবু চেষ্টার ত্রুটি করল না আমেরিকান নেভি। অবশেষে পাওয়া গেল তাকে। পেল মার্কিন নৌবাহিনীর একটি রিসার্চ শিপ 'মিজার'। অ্যাজোরসের পাঁচশো মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে, লিম্বো অফ দ্য লস্টের (বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের সীমানার বাইরের একটা জায়গাকে এই নামে অভিহিত করা হয়। জায়গাটা বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের মতই বিপজ্জনক) ধার ঘেঁষে দশ হাজার ফুট পানির নিচে মরে পড়ে আছে

স্করপিয়ন।

কিন্তু প্রশ্ন হল এমন একটা মজবুত আর অ্যাটমিক পাওয়ারড সাবমেরিন হঠাৎ মরে যায় কি করে? বিশেষজ্ঞরা বলল, যায়। সামুদ্রিক পাহাড়ে ধাক্কা খেলে বা নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্টে বিস্ফোরণ ঘটলে এমন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। অথবা কোন কারণে পানি ঢুকে যেতে পারে সাবমেরিনে, অন্য জাহাজের সাথে ধাক্কা লাগতে পারে, কিংবা ভেতর থেকে স্যাবোটাজ করতে পারে কেউ।

শুরু হল তদন্ত। স্করপিয়ন এবং তার আশেপাশের অঞ্চলের অন্তত সাড়ে বারো হাজার ছবি তোলা হল। খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল সেগুলো বোর্ড অফ এনকয়েরি।

পরীক্ষা করে রায় দিল এনকয়েরি বোর্ড ওই অঞ্চলে কোন সামুদ্রিক পাহাড় নেই, পাওয়ার প্ল্যান্টেও বিস্ফোরণ ঘটেনি। সাবমেরিনে হঠাৎ পানি ঢুকে যাবার সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দেয়া যায় না, কিন্তু তার জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা তো ছিল স্করপিয়নে। আর অন্য সাবমেরিন বা জাহাজের সাথে ধাক্কা লাগলে সেকথা গোপন থাকত না।

বাকি থাকল স্যাবোটাজের প্রশ্ন। ন্যাভাল সিকিউরিটি গার্ডের চোখে ধুলো দিয়ে কোন বিদেশী স্পাই স্করপিয়নের ভেতরে ঢুকে তার কোন যন্ত্র বিকল করে দিয়ে থাকলে দুর্ঘটনা বহু আগেই ঘটত। কিন্তু সাবমেরিনের ভেতর থেকে যদি কাজটা করে থাকে কোন সুইসাইড স্কোয়াডের লোক?

হ্যাঁ, সে-সম্ভাবনাটা ফেলনা নয়। শুরু হল খোঁজা। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেকটি দিন মাস বছরের খোঁজ নেয়া হল স্করপিয়নের নিরানব্বই জন অফিসার আর নাবিকের। পাওয়া গেল না। প্রত্যেকটি লোকের অতীত দুধের মত সাদা। কারও বিরুদ্ধে এতটুকু দেশ বিরোধী কার্যকলাপের রিপোর্ট নেই।

তাহলে? অনেক চেষ্টা করেও এই তাহলের কোন সদুত্তর পাওয়া যায়নি আজও।

তিন

জাহাজগুলো এখানে কেন?

শুধু যে হারিয়ে যায় তাই নয়, মাঝে মাঝে ভূতুড়ে জাহাজকেও ভাসতে দেখা যায় বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের ভেতরে। এর ভেতরে এ পর্যন্ত যতগুলো ভূতুড়ে কাণ্ড ঘটেছে 'মেরি সিলেস্ট' জাহাজের রহস্য তাদের মধ্যে একটি। আঠারোশো বাহাত্তর সালে হঠাৎ একদিন দেখা গেল অ্যাজোরস আইল্যান্ড এবং পর্তুগালের মাঝের সাগরে এক জায়গায় পরিত্যক্ত অবস্থায় ভাসছে জাহাজখানি। এলাকাটা অবশ্য পুরোপুরি বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের আওতায় পড়ে না। বারমুডা ট্রায়াঙ্গল এক্সটেনশন হিসাবে ধরা হয় এলাকাটাকে, নাম লিম্বো অফ দ্য লস্ট।

গত প্রায় এক শতাব্দী ধরে মেরী সিলেস্টকে নিয়ে অসংখ্য কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে। খুব একটা বড় নয় জাহাজটা। লম্বায় একশো তিন ফুট। দুশো বিরাশি টনের জাহাজ। জাহাজখানিকে পরিত্যক্ত অবস্থায় আবিষ্কার করে 'ডাই গ্রেসিয়া' জাহাজের ক্যাপ্টেন মুর হাউস। দুটো জাহাজই একত্রে মাল বোঝাই করে নিউইর্য়ক বন্দরে। আঠারোশো বাহাত্তর সালের সাতই নভেম্বর ইটালির জেনোয়া বন্দরের উদ্দেশে নিউইর্য়ক ত্যাগ করে মেরি সিলেস্ট। আর ওই মাসেরই পনেরো তারিখে জিব্রালটার বন্দরের উদ্দেশে যাত্রা করে ডাই গ্রেসিয়া।

ডাই গ্রেসিয়া নিউইয়র্ক ছাড়ার পর এক মাস পেরিয়ে গেল।

জিব্রালটার তখনও পাঁচশো নব্বই মাইল দূরে। এমন সময় একটা জাহাজ চোখে পড়ল মুর হাউসের। দেখেই চিনতে পারলেন তিনি জাহাজটাকে—মেরি সিলেস্ট। রীতিমত আশ্চর্য হলেন ক্যাপ্টেন। মেরি সিলেস্ট এখনও এখানে কি করছে? ওর তো এতদিনে জিব্রালটার ছাড়িয়ে যাবার কথা। আরও কাছে এগিয়ে দেখলেন মুর হাউস, এলোমেলো গতিতে ভেসে যাচ্ছে মেরি সিলেস্ট। কয়েকজন নাবিককে একটা নৌকোয় করে মেরি সিলেস্টে পাঠিয়ে দিলেন মুর হাউস। এই নাবিকদের সবারই জানা আছে মেরি সিলেস্টের ক্যাপ্টেন ব্রিগস-এর স্ত্রী-কন্যা ছাড়াও আট জন নাবিক রয়েছে ওই জাহাজে।

মেরি সিলেস্টে উঠে হতবাক হয়ে গেল নাবিকেরা। একেবারে জনশূন্য জাহাজ। লাইফবোট নেই। তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করে দেখা হল জাহাজটাকে। যে অবস্থায় নিউইয়র্ক ত্যাগ করেছিল মেরি সিলেস্ট, তখনও সে অবস্থায়ই আছে, অদৃশ্য হয়েছে শুধু লাইফবোট আর লোকগুলো। সম্পূর্ণ অক্ষত আছে ইঞ্জিন, নাবিক থাকলেই আবার চলতে শুরু করবে জাহাজ।

একটা অদ্ভুত ব্যাপারে লক্ষ্য করল ডাই গ্রেসিয়ার নাবিকেরা। খাদ্য, খাবার পানি, ১৭০০ পিপে ভর্তি মদ সব ঠিক ঠিক জায়গায়ই পড়ে আছে। রান্না ঘরে খাবার তৈরি, একটু পরই বোধহয় খেতে বসত মেরি সিলেস্টের লোকেরা। আয়নার সামনে সাজানো অবস্থায় পড়ে আছে দাড়ি কামানর ক্ষুর, সাবান, হয়ত দাড়ি কামাতে যাচ্ছিল কেউ। এক জায়গায় কাশির ওষুধের একটা শিশি ছিপিখোলা অবস্থায় পড়ে আছে, পাশে পানি ভর্তি গ্লাস, ওষুধ খেতে যাচ্ছিল কেউ। মিসেস ব্রিগসের কেবিনের সেলাই মেশিনটায় শিশুর জামা সেলাই করার নমুনা দেখা গেল। কাপড়টা অর্ধেক-সেলাই অবস্থায় মেশিনেই লাগানো আছে। সেলাই করার সময় আঙুলে পরার ক্যাপ, এমনকি মেশিনে দেবার তেলের কৌটাটাও খোলা অবস্থায় পড়ে আছে, সেলাই

করছিলেন মিসেস ব্রিগস। জাহাজের ডেকে শুকোতে দেয়া হয়েছিল কিছু ভিজে কাপড়, তেমনি অবস্থাতেই আছে ওগুলো। নিজের ঘরে বসে একটুকরো কাগজে হিসেব করছিলেন জাহাজের মেট, শেষ হয়নি হিসেব।

বিদ্রোহ করেছিল নাকি মেরি সিলেস্টের নাবিকেরা? স্ত্রীপুত্র সহ ক্যাপ্টেন ব্রিগসকে হত্যা করে পালিয়ে গেছে ওরা? কিন্তু সেরকম কোন চিহ্নই পাওয়া গেল না। ক্যাপ্টেনের ক্যাশ বাক্স, মিসেসের বাক্সের অলঙ্কারগুলো জায়গামতই পড়ে আছে, ছোঁয়ওনি কেউ ওগুলো।

নাবিকেদের মুখে সবকথা শুনে সেকেন্ড মেটকে নিয়ে নিজেই মেরি সিলেস্টে উঠে এলেন ক্যাপ্টেন মুর হাউস। আর একবার খুঁজে দেখা হল জাহাজখানা। অনেক খোঁজাখুজির পর ক্যাপ্টেনের ঘরে খাপেবদ্ধ একটা তলোয়ার পাওয়া গেল, তার ফলায় একটা দাগ। তা রক্তেরও হতে পারে, মদেরও হতে পারে। কিন্তু সবাই একমত হল, দাগটা আসলে মরিচা। জাহাজের একপাশের রেলিঙের এক জায়গায় কুড়ালের আঘাতের চিহ্ন দেখা গেল। কিন্তু তা যে কুড়ালের দাগ তা কেবল বিস্মিত নাবিকের অনুমান মাত্র। জাহাজে মাল বোঝাই করার সময় ওই দাগের সৃষ্টি হতে পারে।

হাল পরীক্ষা করে দেখা গেল পানির ওপর থেকে হালের কিছুটা অংশ কেটে নেয়া হয়েছে। কিন্তু কেটেই নিয়েছে, কোন কিছুর সাথে বাড়ি লেগে ভেঙে যায়নি তার নিশ্চয়তা কি?

জাহাজের লগবুক পরীক্ষা করে দেখা গেল চব্বিশে নভেম্বর পর্যন্ত রোজনামচা লেখা আছে তাতে। তবে পঁচিশে নভেম্বর সকালের ঘটনা একটা শ্লেটে লিখে গেছে কেউ।

ক্যাপ্টেন মুর হাউস পরিত্যক্ত অবস্থায় মেরি সিলেস্টকে পেয়েছেন পাঁচই ডিসেম্বর। মাঝের দশ দিনের কোন খবরই নেই লগবুক বা অন্য কোথাও। লগবুকে জানা গেল চব্বিশে নভেম্বর ৩৬.৫৬ নর্থ ল্যাটিচিউড

এবং ২৬.২০ পশ্চিম লঙ্গিচিউডে ছিল মেরি সিলেস্ট। অথচ পরিত্যক্ত জাহাজটিকে পাওয়া গেল ৩৮.২০ নর্থ ল্যাটিচিউডে এবং ১৭.১৫ পশ্চিম লঙ্গিচিউডে। দশ দিনে প্রায় চারশো কুড়ি মাইল ভেসে এসেছে জাহাজটা। এটাও তো বিশ্বাস করা কঠিন।

মেরি সিলেস্টকে ওখানেই ফেলে রেখে যাওয়াটা মনঃপুত হল না মুর হাউসের। নিজের জাহাজের কয়েকজন নাবিককে মেরি সিলেস্টে তুলে দিয়ে জাহাজটাকে জিব্রালটারে চালিয়ে নিয়ে আসার নির্দেশ দিলেন তাদের মুর হাউস।

যথাসময়ে মেরি সিলেস্টকে জিব্রালটার বন্দরে নিয়ে এল নাবিকেরা। মেরি সিলেস্টের উদ্ধার এবং পারিশ্রমিক বাবদ জাহাজটার মালিকের কাছে সতেরোশো পাউন্ড দাবি করলেন মুর হাউস, মিটিয়ে দেয়া হল তার পাওনা।

ক্যাপ্টেন ব্রিগস, তাঁর স্ত্রী-কন্যা আর মেরি সিলেস্টের আটজন নাবিকের আর কোন খোঁজই পাওয়া যায়নি। কোথায় গেল ওরা? মেরি সিলেস্ট সম্পর্কে বহু লোকে বহু কথাই বলেছে, কিন্তু রহস্যের সমাধান হয়নি আজও।

আর একটি ভূতুড়ে ঘটনা ঘটেছিল ১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। এক সুন্দর সকালে একটা বিস্ময়কর দৃশ্য দেখে অবাক নর্থ ক্যারোলিনার উপকূলের কেপ হ্যাটেরাস কোস্ট গার্ডরা। তারা দেখল, ডায়মন্ড শোলস নামে এক কুখ্যাত ও বিপজ্জনক জায়গায় আটকে আছে একটা পাঁচ মাস্তুলের শুনার জাহাজ।

জেনেশুনে এ এলাকায় মরতে আসে না কোন জাহাজ। কারণ এর ভেতর একবার ঢুকে পড়লে বেরোনো কঠিন। এমন এলাকায় জাহাজটা এল কেন? গত রাতে ঝড় হয়নি ওই অঞ্চল বা তার আশেপাশের অঞ্চলে যে ঝড়ের দাপটে ওখানে এসে ঢুকবে জাহাজটা।

বেশিক্ষণ অযথা মাথা না ঘামিয়ে নিজেদের কর্তব্যে মন দিল কোস্ট গার্ডরা। গত রাতে সত্যিই ঝড় হয়েছিল কিনা খোঁজ-খবর নিল তারা। হয়েছিল, তবে ওই এলাকা থেকে বহুদূরে। সেই ঝড়ে পড়ার কথা নয় জাহাজটার। কোন জাহাজ থেকে গত রাতে কোন বিপদ সংকেত এসেছিল কিনা খোঁজ নিল তারা। আসেনি।

প্রয়োজনীয় খোঁজ খবর নেয়া শেষ হলে জাহাজটাকে উদ্ধার করতে চলল কোস্টগার্ডরা। জাহাজে জীবিত লোক থাকতে পারে, নিদেনপক্ষে তাদেরকে তো উদ্ধার করতে হবে। কিন্তু হবে বললেই তো আর হল না, আসলে লাইফবোট নিয়ে জাহাজটার ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারল না ওরা। কারণ ওই এলাকার সমুদ্র ভীষণ অশান্ত। ওই অশান্ত সমুদ্রে প্রাণ হাতে করে কে যাবে জাহাজের কাছে?

জাহাজের চারশো গজ দূরে লাইফবোট থেকে দূরবীন দিয়ে জাহাজটাকে দেখতে লাগল কোস্টগার্ডরা। ওখান থেকে পড়া গেল নামটা—ক্যারল এ ডিয়ারিং। জাহাজের ডেকে কোন লোকজনকে দেখা গেল না। মেগাফোন মুখে লাগিয়ে জাহাজের জীবিত লোকদের উদ্দেশ্যে অনেকক্ষণ ধরে চেঁচিয়েও জবাব পেল না কোস্টগার্ডরা।

জাহাজের বাঁ দিক থেকে পানির দিকে ঝুলে আছে একটা মই। জাহাজের লাইফবোটগুলো দেখা যাচ্ছে না। জাহাজ ছেড়ে লাইফবোট নিয়ে চলে গেছে আরোহীরা? দেখে তো মনে হয় না কোন ক্ষতি হয়েছে জাহাজটার। বহুক্ষণ চেষ্টার পরও কিছু করতে বা বুঝতে না পেরে ফিরে এল কোস্ট গার্ডরা। নাম যখন জানা গেছে জাহাজটা কার খুঁজে বের করতে এখন আর অসুবিধে হবে না।

মেরিন রেজিস্টার খুলে জাহাজের মালিকের নাম পাওয়া গেল। জাহাজটা মেন স্টেটের পোর্টল্যান্ডের জি. জি. ডিয়ারিং কোম্পানির। মালিক দু'জন, জি. জি. ডিয়ারিং এবং ক্যাপ্টেন উইলিয়াম মেরিট। মি. ডিয়ারিং-এর ছেলের নাম ক্যারল এ ডিয়ারিং, তার নামেই নামকরণ

করা হয়েছে জাহাজের। ১৯২০ সালে প্রায় দু'লক্ষ ডলার খরচ করে তৈরি করা হয়েছিল দু'হাজার একশো চোদ্দ টনের ওই জাহাজটা।

আর দেরি না করে খবরটা ডিয়ারিং কোম্পানিকে জানিয়ে দিল কোস্ট গার্ডরা। খবর শুনে নর্থ ক্যারোলিনার উইলমিংটন থেকে নৌকা বোঝাই করে এল সাহায্যকারী দল, কাছাকাছি অঞ্চল থেকে আরও কোস্ট গার্ড। সমুদ্র কিছুটা শান্ত হয়েছে এখন। অতঃপর জাহাজের গায়ে নৌকা ভিড়ানো গেল।

তন্ন তন্ন করে খুঁজেও জাহাজটিতে জীবিত বা মৃত কোন মানুষকে পাওয়া গেল না। শুধু দুটো জ্যান্ত বিড়াল পাহারা দিচ্ছে অতবড় জাহাজখানাকে। অবস্থা দেখে মনে হল হঠাৎ করেই জাহাজ ত্যাগ করেছে আরোহীরা। টেবিলে খাবার সাজানো রয়েছে, দেখে মনে হয় খেতে বসেই চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছিল খাদ্য গ্রহণকারীরা। কয়েকটা কেবিনে আলো জ্বলছে তখনও।

জাহাজের কিছু প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, চার্ট এবং অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি খুঁজে পাওয়া গেল না। আর পাওয়া গেল না কিছু ভারি মালপত্র, যেমন ক্যাপ্টেনের বড় ট্রাংক, অফিসার ও নাবিকদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, ক্যাম্বিসের ব্যাগ ইত্যাদি। হঠাৎ করে জাহাজ ছাড়লে এসব ভারি জিনিস নেয়া সম্ভব নয় কিছুতেই।

একটা কেবিনে কয়েকজোড়া রবারের বুট পাওয়া গেল যেগুলো ক্যারল এ ডিয়ারিং-এর নাবিক বা অফিসারদের নয়। কেবিনের বাড়তি ঘরটাতে ঘুমিয়ে ছিল কেউ এবং তার প্রমাণও পাওয়া গেল। একটা নেভিগেশন চার্টের কিছুটা লিখেছিলেন জাহাজের ক্যাপ্টেন ওয়ার্মেল, তারপর থেকে লিখেছে অন্য কেউ, হস্তাক্ষর দেখেই তা বোঝা গেল।

এরপর ডিয়ারিং রহস্য সমাধানের জন্যে বোর্ড অফ এনকয়েরি বসল। কোস্ট গার্ড এবং মার্কিন সরকারের ছয়টা বিভাগ—নেভি, ট্রেজারি, স্টেট, নেভিগেশন, কমার্স এবং জাস্টিস জড়িত হয়ে পড়ল

তাতে। খুঁজে খুঁজে ক্যারল এ ডিয়ারিং সম্পর্কে বহু তথ্য সংগ্রহ করল তারা।

১৯২০ সালের আগস্ট মাসে ভারজিনিয়ার নিউপোর্ট নিউজ বন্দরে কয়লা বোঝাই করে দক্ষিণ আমেরিকার রিও ডি জেনিরো বন্দরের দিকে যাত্রা করে ক্যারল এ ডিয়ারিং। জি. জি. ডিয়ারিং কোম্পানির দ্বিতীয় অংশীদার উইলিয়াম মেরিট নিজেই ছিলেন এ জাহাজের ক্যাপ্টেন। জাহাজের ফার্স্ট মেট ছিল তাঁর ছেলে।

অদ্ভুত কিছু ঘটনা ঘটতে শুরু করল জাহাজটা যাত্রা করার পর থেকেই। ডেলাওয়ার স্টেটের লেউয়েস বন্দরে জাহাজ থামতেই অজানা কারণে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন ক্যাপ্টেন মেরিট। তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হল তাঁকে। উইলিয়াম মেরিটকে হাসপাতালে পাঠানর পর পরই তাঁর ছেলেও অসুস্থ হয়ে পড়ল। অতএব তাকেও হাসপাতালে যেতে হল। ক্যাপ্টেন ছাড়া জাহাজ চালাবে কে? সুতরাং লিউয়েস বন্দরেই আটকে থাকল জাহাজ।

ক্যাপ্টেন আর ফার্স্ট মেটের অসুস্থতার খবর পাঠানো হল জাহাজ কোম্পানির অফিসে। একজন নতুন ক্যাপ্টেন পাঠানর অনুরোধও করা হল।

যাকে তাকে তো আর ক্যাপ্টেন নিযুক্ত করা যায় না। অতএব খুঁজতে হবে। অনেক খুঁজে শেষ পর্যন্ত উইলিয়াম বি ওয়ার্মেল নামে একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ ক্যাপ্টেন পাওয়া গেল। ছেষট্টি বছরের এই ক্যাপ্টেনের বাড়ি বোস্টনে। প্রায় সমস্ত জীবনই সাগরে সাগরে কাটিয়েছেন তিনি, দেখেছেনও অনেক। উত্তর আটলান্টিকের হারিকেন, চায়না সী-র টাইফুন ইত্যাদি সব কিছুর সাথেই পরিচিত ক্যাপ্টেন ওয়ার্মেল।

নাবিকদের কাছ থেকে কাজ আদায় করে নেবার একটা ক্ষমতা ছিল ক্যাপ্টেন ওয়ার্মেলের। সব রকমের জাহাজ চালাতে পারতেন

তিনি, জাহাজের সব কাজ জানতেন। প্রয়োজন হলে নিচু স্তরের নাবিকদের কাজ করতেও পিছ পা হতেন না কখনও। এ-সবের জন্যেই সবার শ্রদ্ধাভাজন হতে পেরেছিলেন সর্বগুণে গুণান্বিত ওই ক্যাপ্টেন।

একটানা এক বন্দরে আটকে থাকতে থাকতে হাঁপিয়ে উঠেছিল ক্যারল এ ডিয়ারিং-এর নাবিকেরা। ক্যাপ্টেন ওয়ার্মেল এসে উঠতেই ছেড়ে দেয়া হল জাহাজ।

যাবার পথে আর কোন গোলমাল হল না। নিরাপদেই রিও ডি জেনিরো বন্দরে পৌছল জাহাজ। কয়লা খালাস করার পর খালি জাহাজ নিয়েই তেসরা ডিসেম্বর রিও ডি জেনিরো ত্যাগ করলেন ওয়ার্মেল।

রিও ডি জেনিরোর পরেই বারবেডস। সেখানে পৌঁছে দেখলেন ওয়ার্মেলের একটা মেসেজ অপেক্ষা করছে তাঁর জন্যে। জাহাজ নিয়ে তখুনি ভারজিনিয়ার নরফোক বন্দরে চলে যাবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাঁকে।

মেসেজ পেয়ে ডিয়ারিং কোম্পানির ব্রিজ টাউন প্রতিনিধির সাথে দেখা করে বললেন ক্যাপ্টেন ওয়ার্মেল, 'এখন আমার পক্ষে ভারজিনিয়ায় যাওয়া সম্ভব নয়। শরীরটা ভাল নেই।'

আশ্চর্য হলেন প্রতিনিধি, 'বলছেন কি? আপনার, মানে ক্যাপ্টেন ওয়ার্মেলের শরীর খারাপ? এমন কথা শুনেছে কেউ কখনও? আসলে একটু ম্যাজম্যাজে ভাব হয়ত, সেরে যাবে। তা নরফোক কবে রওনা হচ্ছেন?'

একটু হতাশ হয়েই ফিরে এলেন ক্যাপ্টেন ওয়ার্মেল। ১৯২১ সালের ৯ জানুয়ারি বারবেডসের ব্রিজটাউন বন্দর ছাড়ল ডিয়ারিং। এর পর আর কোন বন্দরে নোঙর ফেলেনি জাহাজটা।

২১ জানুয়ারি ডিয়ারিংকে নর্থ ক্যারোলিনার উপকূলের অদূরে 'কেপফিয়ার' লাইটশিপ পার হতে দেখল সেই এলাকার কোস্ট গার্ডরা। তারা বলল, স্বাভাবিক আর স্বচ্ছন্দ গতিতেই তখন চলছিল জাহাজটা।

এর ছ'দিন পর ডায়মণ্ড শোলসের একটু দূরে কেপ লুকআউট লাইট শিপ পার হল ডিয়ারিং। এবারও কোস্ট গার্ডরাই দেখল জাহাজটাকে। কেপ ফিয়ার আর কেপ লুকআউট লাইট শিপের মধ্যে দূরত্ব মাত্র আশি মাইল। ওইটুকু পথ আসতে ডিয়ারিং-এর ছয় দিন লেগে গেল। অত্যন্ত বেশি সময় লাগায়নি কি জাহাজটা?

কিন্তু দেরিটা হল কেন? উত্তর দিতে পারল না কেউ।

এক প্রশ্নের জবাবে কেপ লুকআউট লাইট শিপের ক্যাপ্টেন বলেছিলেন, '২৯ জানুয়ারি, শনিবার একটা শুনার জাহাজ দেখি আমি। জাহাজের কোয়ার্টার ডেকে দাঁড়িয়ে—ঝড়ে দুটো নোঙরই ছিঁড়ে গেছে, বলে চেঁচাচ্ছে একজন লোক। খবরটা অন্য কোন জাহাজে পৌঁছে দেবার অনুরোধও করছিল লোকটা। লালচুলো লোকটার কথায় বিদেশী টান। না, ক্যাপ্টেন ওয়ার্মেল না ও, এ ব্যাপারে নিশ্চিত আমি, কিন্তু জাহাজটা ডিয়ারিংই।'

রেডিও বিকল হয়ে যাওয়ায় ডিয়ারিং-এর খবরটা তখুনি পাঠাতে পারেনি লাইট শিপের ক্যাপ্টেন। পরে লাইট শিপের সামনে দিয়ে যাওয়া একটা জাহাজের কাছে ডিয়ারিং-এর সংবাদ জানিয়েছিল সে। কিন্তু আশ্চর্য, তার কথা শুনেও উত্তর দেয়নি জাহাজের কোন লোক। জাহাজের নামটাও পড়তে পারেননি লাইট শিপের ক্যাপ্টেন।

এভাবে চোরের মত সরে গেল কেন জাহাজটা? পাইরেট শিপ? মদ চোরা চালানির জাহাজ?

পরে অবশ্য একটা কানাঘুষা উঠেছিল, জাহাজটার নাম 'হিউইট', তবে তা কতখানি সত্যি জান যায়নি। কারণ 'হিউইট' নামের একটা জাহাজ সত্যিই ছিল, কিন্তু 'ডিয়ারিং' রহস্যের পর আর তার কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। কেউ কেউ বলে, ডিয়ারিং-এর নাবিক আর অফিসারদেরকে উদ্ধার করে হিউইট, এবং তারপরেই সমস্ত লোকজন সহ বারমুডা ট্রায়াঙ্গলে হারিয়ে যায়।

২১ ফেব্রুয়ারি নিউ জারসির তীর ভূমি থেকে বেশ দূরে সাগরের বুকে একটা অগ্নিকাণ্ডের পর ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখা যায়। কারও মতে টেকসাসের স্যাবিন বন্দরে গন্ধক বোঝাই করে ফ্লোরিডা ঘুরে পোর্টল্যান্ডের দিকে যাচ্ছিল সে সময় হিউইট। পথে ডিয়ারিং-এর সাথে দেখা হলে সে জাহাজের সমস্ত বিপন্ন লোকদের তুলে নেয়।

তারপর হিউইট জাহাজে কোন কারণে আগুন লেগে গিয়ে বিস্ফোরিত হয়ে যায় জাহাজটা। গন্ধক বোঝাই জাহাজে আগুন লেগে যাওয়াটা বিচিত্র কিছু নয়। কথাটা বিশ্বাসযোগ্য হবার আরও একটা কারণ আছে। ডিয়ারিং জাহাজটা ডায়মন্ড শোলসে আটকে যাবার দিন কয়েক পরেই ঘটেছিল বিস্ফোরণটা, এবং তারপর থেকেই আর হিউইট জাহাজকে দেখা যায়নি।

কিন্তু আশ্চর্য, অগ্নিকাণ্ডের পর পরই, ঘটনাস্থলে গিয়েও কোন জাহাজের ভাঙা কাঠ বা মানুষের লাশ পানিতে ভাসতে দেখা যায়নি। যেন বিস্ফোরণের পর পরই হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে তার সমস্ত চিহ্ন।

সেই প্রাচীন যুগ থেকেই বোতলের মধ্যে মেসেজ ভরে পাঠানর রেওয়াজ চলে আসছে সাগরে জাহাজ ডুবি হয়ে কোথাও আটকে পড়া নাবিক এবং যাত্রীদের মধ্যে। একদিন নর্থ ক্যারোলিনার উপকূলে এসে ঠেকল তেমনি একটা বোতল। বোতলের মেসেজটা হল, 'ওটা ট্যাংকার, না সাবমেরিন বুঝতে পারছি না, আক্রমণ করেছে আমাদেরকে। আমাদের সব কজন নাবিককেই আটকে রাখা হয়েছে। বোতলটা কেউ পেলে দয়া করে হেড কোয়ার্টারে খবর দেবেন কি?'

কিন্তু কোন্ হেড কোয়ার্টারে খবর দিতে হবে তার উল্লেখ নেই। কোন্ জাহাজের লোক, বা কে লিখেছে মেসেজটা তারও নাম নেই।

ক্রিস্টোফার কলম্বাস গ্রে নামে এক ভদ্রলোক বোতলটা কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। তাঁর মতে ডিয়ারিং নয়, নর্থ ক্যারোলিনা উপকলের কোন

জেলে-নৌকা থেকে আসলে ভাসানো হয়েছে বোতলটা।

কিন্তু মেসেজের লেখা সনাক্ত করা গেল। সনাক্ত করলেন ক্যাপ্টেন ওয়ার্মেলের স্ত্রী এবং কন্যা। তাঁরা বললেন ওই হস্তাক্ষর ডিয়ারিং জাহাজের ইঞ্জিনিয়ার হেনরি বেটসের। বেটসের হাতের লেখা যাচাই করে তার অনুকূলে রায় দিল তিনজন হস্তাক্ষর বিশেষজ্ঞ।

মিসেস ওয়ার্মেল তো বলেই বসলেন—পাইরেট, না হয় বলশেভিকরা ডিয়ারিং জাহাজ লুট করার পর বন্দী করে নিয়ে গেছে তার স্বামী ও অন্যান্যদের।

মিসেস ওয়ার্মেলের অনুমান সত্যি হলে দুটো ব্যাপার ঘটতে পারে. জলদস্যুরা জাহাজ লুট করার পর বন্দীদের হত্যা করে সাগরে ভাসিয়ে দিয়েছে। আর বলশেভিকরা হলে বন্দীদের চালান করে দিয়েছে রাশিয়ায়।

কিন্তু কথা হল ডিয়ারিং জাহাজ থেকে কি লুট করবে জলদস্যুরা? জাহাজে তো তেমন কিছু দামী মালপত্র ছিল না। বলশেভিকদের ব্যাপারে প্রশ্ন উঠলে নিউইয়র্কের পুলিশ বিভাগ জানাল, 'ইউনাইটেড রাশিয়ান ওয়ারকারস অফ দ্য ইউনাইটেড স্টেটস অ্যান্ড কানাডা' নামে একটা প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব জানা গেছে বছর খানেক হল। জাহাজে চাকরি নিয়ে সুযোগ বুঝে বিদ্রোহ করে জাহাজ সহ রাশিয়ান কোন বন্দরে পালিয়ে যাওয়া তাদের কাজ।

'বাবা এবং ডিয়ারিং জাহাজের অন্য সবাইকে হত্যা করে সাগরে ভাসিয়ে দেয়া হয়েছে। কেপ লুকআউট লাইট শিপের ক্যাপ্টেনের দেখা ডিয়ারিং-এর কোয়ার্টার ডেকের লোকগুলোই আসলে হত্যাকারী।' সোজা-সাপটা রায় দিল ক্যাপ্টেন ওয়ার্মেলের কন্যা লুলু ওয়ার্মেল।

কে হত্যা করবে বৃদ্ধ ওয়ার্মেলকে? তাতে কি স্বার্থ তার? হত্যাকাণ্ডের কোন চিহ্ন তো পাওয়া যায়নি ডিয়ারিং জাহাজে?

কেউ কেউ বলল, কোন অজানা দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে

পড়েছিল জাহাজের সকলে। তাতে করে সবাই স্থির করল আত্মহত্যা করা উচিত, অতএব আত্মহত্যা করল সবাই। মুচকে হেসে বলল বিপক্ষের লোকেরা, তাহলে আত্মহত্যা করার পর সেই রোগেই হয়ত গায়েব হয়ে গিয়েছে মৃতদেহগুলো।

ডায়মন্ড শোলস থেকে ক্যারল এ ডিয়ারিংকে আর বের করে আনা যায়নি। পরিত্যক্ত অবস্থায় সেখানে পড়ে থাকতে থাকতে শেষে নষ্ট হয়ে যায় জাহাজটা। তারপর প্রবল ঝড়ে একদিন টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেল ডিয়ারিং। কেপ হ্যাটেরাসের কোন কোন দোকানে ট্যুরিস্টদের দেখানর জন্যে আজও সযত্নে রক্ষিত আছে ক্যারল এ ডিয়ারিং-এর কিছু কিছু ভাঙা অংশ।

চার

আকাশের গোলক ধাঁধায়

শুধু সাগরেই নয়, বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের আকাশেও একের পর এক ঘটে চলেছে রহস্যময় সব ঘটনা। বেছে বেছে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করছি। ১৯৪৯ সালের ২৮ ডিসেম্বর। সন্ধ্যার পর পরই পুয়েরটো রিকোর স্যান জুয়ান বিমান বন্দর ছাড়ল একটি ডগলাস DC-3 বিমান। গন্তব্যস্থান আমেরিকার মিয়ামি এয়ারপোর্ট। বড় দিনের ছুটি কাটাতে দেশে এসেছিল বিমানের যাত্রীরা, এখন ছুটির পর আবার কর্মক্ষেত্রে ফিরে যাচ্ছে।

আকাশ জুড়ে জ্বলছে তারার মেলা, মেঘের নাম গন্ধও নেই

কোথাও। স্বচ্ছন্দ গতিতে মিয়ামির দিকে এগিয়ে চলেছে বিমান। যাত্রীদের কুকি আর পাঞ্চ সরবরাহ করে গেছে এয়ার হোস্টেস। ছুটি কাটানর পর ঝরঝরে হয়ে গেছে দেহমন, কাজেই সবার মনেই আনন্দ। কেউ কেউ তো আনন্দের চোটে গানই জুড়ে দিয়েছে।

একটু পরই গন্তব্যস্থান এসে গেল। মাইক্রোফোনে মুখ রেখে মিয়ামি এয়ারপোর্টের কনট্রোল টাওয়ারের উদ্দেশ্যে বলতে লাগল বিমানের ক্যাপ্টেন, মিয়ামি টাওয়ার, দিস ইজ এয়ারবোর্ন ট্র্যান্সপোর্ট এন ওয়ান সিক্স জিরো জিরো টু, ওভার।'

সাথে সাথে উত্তর এল টাওয়ার থেকে, 'এয়ারবোর্ন ট্র্যান্সপোর্ট এন ওয়ান সিক্স জিরো টু, দিস ইজ মিয়ামি টাওয়ার, গো অ্যাহেড।'

আবার কথা বলল বিমানের ক্যাপ্টেন। তার বাংলা করলে দাঁড়ায়, পুয়েরটো রিকোর স্যান জুয়ান থেকে মিয়ামির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এন ১৬০০২। মিয়ামি শহর থেকে পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণে উড়ছি এখন আমরা, শহরের আলো দেখতে পাচ্ছি। ঠিকই আছি আমরা। ল্যান্ড করার নির্দেশ দাও। ওভার।'

এবারও সাথে সাথেই উত্তর দিল মিয়ামি টাওয়ার, 'এন ওয়ান সিক্স জিরো জিরো টু, এগিয়ে এসো তোমরা। এয়ারপোর্ট দেখতে পেলেই আমাদের জানাবে। ওভার।'

আর কথা বলল না DC-3-এর ক্যাপ্টেন। একটুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার কথা বলল মিয়ামি টাওয়ার।

'এন ওয়ান সিক্স জিরো টু, মিয়ামি টাওয়ার বলছি। উত্তর দাও। ওভার।'

কিন্তু উত্তর দিল না কেউ।

'কি হল, কথা বলছ না কেন এন ওয়ান সিক্স জিরো জিরো টু? রেডিও কাজ করছে না তোমাদের?

এবারেও কথা বলল না বিমানের কেউ।

'হল কি তোমাদের? শুনতে পাচ্ছ জিরো জিরো টু?'

এতবার জিজ্ঞেস করার পরও উত্তর না পাওয়ায় উদ্বিগ্ন হল টাওয়ারের রেডিও অপারেটার, 'এয়ারবোর্ন ট্র্যান্সপোর্ট এন ওয়ান সিক্স জিরো জিরো টু, মিয়ামি টাওয়ার বলছি। শুনতে পাচ্ছ আমাদের কথা? শুনতে পাচ্ছ? শুনতে পাচ্ছ? উত্তর দাও? ওভার।'

তবুও উত্তর দিল না এয়ারবোর্ন ট্র্যান্সপোর্ট এন ১৬০০২। আর অপেক্ষা করা সঙ্গত মনে করল না মিয়ামি টাওয়ার। নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছে N 16002 DC-3-এর।

বিপদ সংকেত ঘোষণা করল মিয়ামি টাওয়ার। সংকেত পাওয়া মাত্রই বিমান ঘাঁটির সাথে রেডিও যোগাযোগ করার চেষ্টা করতে লাগল নিউ অরলিয়ন্স, স্যান জুয়ান ওভারসিজ রিভিও এবং আমেরিকান কোস্ট গার্ড। ব্যর্থ হল প্রত্যেকেই।

আশে পাশের সবাইকে হুঁশিয়ার করে দিল আমেরিকান কোস্ট গার্ড, এয়ারবোর্ন ট্র্যান্সপোর্ট এন ওয়ান সিক্স জিরো জিরো টু মিসিং।'

মিয়ামি থেকে কয়েকশো বর্গ মাইলের ভেতরের সাগরে যে কটি জাহাজ এবং আকাশে বিমান ছিল সবাই সর্তক হয়ে গেল। এন ১৬০০২-এর কোন খোঁজ পেলে সাথে সাথে কোস্ট গার্ডদের সাথে যোগাযোগ করে জানিয়ে দিতে পারবে ওরা। কিন্তু এতেই নিশ্চিত থাকতে পারল না আমেরিকান কোস্ট গার্ড, তাদের কয়েকটা সার্চ প্লেনও উঠে গেল আকাশে।

আবহাওয়া অফিসের সাথে যোগাযোগ করে জানা গেল আবহাওয়া সম্পূর্ণ পরিষ্কার। আর আবহাওয়া অপরিষ্কার হলেই বা কি? যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে পড়ার আগে তো একবার অন্তত বিপদ সংকেত জানাতে পারত এন ১৬০০২ বিমানখানি? রেডিও গড়বড় হয়ে গেলে উত্তর দিতে পারবে না ঠিকই, কিন্তু তত্ক্ষণে তো মিয়ামি বন্দরে বিমানখানির পৌঁছে যাবার কথা। কিন্তু পৌঁছল না N 16002 DC-3। বত্রিশ জন যাত্রী নিয়ে কোথায় যেন গায়েব হয়ে গেল সে।

খোঁজার বিন্দুমাত্র ত্রুটি হল না। স্যান জুয়ান থেকে ফ্লোরিডার মাঝখানের সাগর, গালফ অফ মেক্সিকো, ক্যারিবিয়ান, এভার গ্লেড, ফ্লোরিডা বে. কিজ. কিউব. হিসপানিওলা, এবং বাহামার সর্বত্র আতি পাতি করে খোঁজা হল। কিন্তু কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না বিমানখানির। দুর্ঘটনা ঘটলে বিমানের কাঠের টুকরো, লাইফ জ্যাকেট, তেলের টিন, মৃতদেহ ইত্যাদি পাওয়া যাবার কথা, কিন্তু তেমন কিছুই পাওয়া গেল না। যাবে কোথেকে? ঘটনাটা তো ঘটেছে বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের ভেতর।

সমুদ্রের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে জ্যাক্সনভিল শহর। এই জ্যাক্সনভিল শহরেই রয়েছে আমেরিকান এরোনটিসক-এর বিমান ক্ষেত্র সিসিলফিল্ড। রহস্যময় ঘটনাটা ঘটেছিল উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালের এক চমৎকার বিকেলে।

'ওভার ওয়াটার নেভিগেশনাল ফ্লাইট নামে একটা নিয়মিত রুটিন মহড়া আছে সিসিল ফিল্ডের বৈমানিকদের। সবাই এরা অত্যন্ত দক্ষ পাইলট, তবুও বোমা নিক্ষেপ সম্পর্কে উচ্চতর ট্রেনিং নেবার জন্যেই প্রতিদিন দু'ঘণ্টা ধরে একশো মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে বারোটা বিমানের একটা স্কোয়াড্রন এই মহড়ায় অংশ গ্রহণ করত।

স্কোয়াড্রনের বারোটা বিমানের দশটায় থাকত শিক্ষার্থীরা, বাকি দুটোতে ইন্সট্রাক্টর। প্রত্যেকটা বিমানে দু'জন করে বৈমানিক থাকত, একজন পাইলট, অন্যজন বম্বার রেডিওম্যান। এসব মহড়ার সময় 'মে ওয়েস্ট' নামে এক ধরনের আবরণী গলায় পরত বৈজ্ঞানিকরা। তাছাড়া থাকত রাবার-বোট, জরুরী ওষুধপত্র ও খাবার। আকাশে উঠে নিজ নিজ নির্ধারিত পথে উড়ে আবার বিমান ক্ষেত্রে ফিরে আসত বিমানগুলো।

যতই দিন যাচ্ছে ততই আবিষ্কৃত হচ্ছে নতুন মডেলের উন্নত সব বিমান। এ মহড়ার আগে, যেসব বিমান ব্যবহার করা হত, তার নাম

ছিল 'এস বি ডি ডন্টলেস'। পরে সেগুলোরই পরিবর্তন করে তৈরি হল 'এস বি টু সি হেল ড্রাইভার' নামের বম্বার। মোট দুশো পঞ্চাশখানা এ ধরনের বিমান ছিল তখন সিসিল ফিল্ডে।

বিমানগুলো আকাশে ওঠার আগেই তাদের ইঞ্জিন ভালমত পরীক্ষা করে দেখা হত। সেদিন যথারীতি নির্ধারিত সময়ে আকাশে উঠল বারোটা বিমান, কিন্তু মহড়া শেষ করে ফিরে এল দশটা।

বাকি দুটো আসছে না কেন? এমন তো হয় না কখনও?

আরও অনেকক্ষণ কেটে যাবার পরও বিমান দুটো থেকে কোন প্রকার সংকেত না পেয়ে সন্দিগ্ধ হয়ে পড়ল সিসিল ফিল্ড কর্তৃপক্ষ। সার্চ প্লেন পাঠানো হল ওদের খোঁজে। নির্দিষ্ট এলাকার বাইরেও বহুদূর পর্যন্ত খোঁজা হল বিমান দুটোকে। কিন্তু পাওয়া গেল না। বিমান দুটোর নিরুদ্দেশ সংবাদ রেডিও মারফত জানিয়ে দেয়া হল দিকে দিকে। কিন্তু কোথায় কি? অনেক খুঁজেও পাওয়া গেল না ওগুলোকে, পাওয়া গেল না ওদের কোন চিহ্ন।

'গ্রেটেস্ট অ্যাভিয়েশন মিস্ট্রি অভ অল টাইম।' পাঁচ পাঁচটা বিমান একসাথে গায়েব হয়ে যাবার পর, তাদের খুঁজতে যাওয়া বিমানটিও যদি একইভাবে গায়েব হয়ে যায়, তাহলে মিস্ট্রিটাকে এছাড়া আর কি নামে আখ্যায়িত করা যায়?

যে বছর হেল ড্রাইভার বিমান দুটো নিখোঁজ হয়ে যায় সে বছরেই ৫ ডিসেম্বর। ফ্লোরিডা ফোর্ট লয়ারডেল এয়ার স্টেশন। এখানেও পাইলটের ট্রেনিং দেয়া হয়। তুখোড় পাইলট, যাদের কম পক্ষে সাড়ে তিনশো থেকে চারশো ঘন্টা ওড়ার অভিজ্ঞতা আছে তারাই শুধু এই এয়ার স্টেশনে ট্রেনিং নিতে পারে। ডন্টলেস বা হেল ড্রাইভারের ধারে কাছেও যায় না এখানকার পাইলটরা। টি বি এম অ্যাভেঞ্জার টরপেডো বম্বার নিয়ে মহড়া দেবার জন্যেই এখানে আসে ওরা। কিন্তু এখানে

আসার আগেই এ ধরনের বিমানে অন্ততপক্ষে পঞ্চান্ন ঘণ্টা আকাশে ওড়ার অভিজ্ঞতা নিয়ে আসতে হয় পাইলটের। অর্থাৎ একটা আনাড়ি লোককেও স্থান দেয়া হয় না এখানে।

তখন পর্যন্ত যত বোমারু বিমান আবিষ্কৃত হয়েছিল তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল এই অ্যাভেঞ্জার বিমান। এগুলোর ডানার বিস্তার ছিল বায়ান্ন ফুট। ষোলোশো হর্স পাওয়ার ইঞ্জিনের শক্তিতে ঘণ্টায় তিনশো মাইল বেগে উড়তে পারত এরা। দু'হাজার পাউন্ড পর্যন্ত টর্পেডো বম্ব বহন করতে পারত প্রতিটি বিমান। একজন পাইলট, একজন রেডিওম্যান এবং একজন গানার, মোট এই তিন জনের বসার জায়গা থাকত বিমানগুলোতে।

যেদিনকার ঘটনা বলছি সেদিনের মহড়ায় অংশ গ্রহণ করেছিল মোট পাঁচটা বিমান। মহড়াটার নাম ফ্লাইট নাইনটিন। মোট চোদ্দ জন লোক ছিল পাঁচটা বিমানে (ফ্লাইট লিডারের বিমানে গানার থাকে না)। চোদ্দ জন লোকই অ্যাভেঞ্জার প্লেন চালনায় অত্যন্ত অভিজ্ঞ।

ঠিক হল আকাশে উঠে প্রথমে পুবে একশো ষাট মাইল দূরে যাবে পাঁচটা অ্যাভেঞ্জার, তারপর উত্তরে চল্লিশ মাইল গিয়ে দক্ষিণ পুবে ঘুরে একটি ত্রিকোণর রচনা করে ফিরে আসবে এয়ারবেসে। এর আগেও বহুবার এ ধরনের ত্রিকোণ রচনা করেছে ওই পাইলটরা।

সেদিন সকাল থেকেই কিন্তু ঘটল অঘটন। ঘন মেঘে ছেয়ে গেল আকাশ। এক হিসেবে পাইলটদের জন্যে ভাল হল, কারণ আকাশে মেঘ থাকলে মহড়া হবে না, আর মহড়া না হলে বাড়িতে চিঠি লেখার সময় পাওয়া যাবে। তাছাড়া সন্ধ্যায় এয়ারবেস থিয়েটারে বসে নতুন নাটক 'হোয়াট নেক্সট, করপোরাল হারগ্রেভ' দেখা যাবে।

দুপুর হতেই চোদ্দজন আকাশযাত্রীকে হতাশ করে দিয়ে মেঘ কেটে গেল। সদ্য মেঘ কেটে যাওয়া আকাশে হেসে উঠল সূর্য। সেদিনের চোদ্দ জনের মধ্যে তিনজন ছিল ঘনিষ্ঠ বন্ধু, একেবারে ত্রিমূর্তি

যাকে বলে। এ তিনজনের নাম সার্জেণ্ট রবার্ট গ্যালিভান, প্রাইভেট ফার্স্ট ক্লাস রবার্ট গ্রুবেল এবং করপোরাল অ্যালেন কসনার। একই ব্যারাকে থাকত তিনজন।

নিয়ম ছিল প্লেন নিয়ে আকাশে ওঠার আগে অপারেশন বিল্ডিঙে গিয়ে আর একবার নির্দেশ নেবার পর খাতা পত্র সই করে, বিমানের চাবি নিতে হবে, এবং রুটিনে কোন পরিবর্তন হলে তা জেনে নিতে হবে।

নিজেদের বাংকে শুয়ে বই পড়ার ফাঁকে ফাঁকে সেদিন গল্প করছিল ওরা তিন বন্ধু। নির্দিষ্ট সময়ের আর ঘণ্টাখানেক বাকি থাকতে উঠে পড়ল গ্যালিভান আর গ্রুবেল। হাতমুখ ধুয়ে এসে ইউনিফর্ম পরতে শুরু করল দু'জনে। কসনার কিন্তু যেমন ছিল তেমনি শুয়ে থেকেই বন্ধুদের তৈরি হওয়া দেখতে লাগল।

'কিরে শালা, শুয়ে আছিস যে এখনও? যাবার ইচ্ছে নেই নাকি?' হাসিমুখে জিজ্ঞেস করল গ্যালিভান।

'যাব না।'

'যাবি না? কেন?'

'ভাল্লাগছে না। তাছাড়া এ মাসের ফ্লাইটটাই পুরো হয়ে গেছে আমার। না গেলে জোর করতে পারবে না কেউ। কেন জানি মনে হচ্ছে আজ গেলেই অ্যাক্সিডেন্ট করে বসব। কিছু মনে করিস না গ্যালিভান, আমাকে ফেলেই তোরা যা আজ।'

আর পীড়াপীড়ি করল না গ্যালিভান। কাপড় পরে বেরিয়ে যাবার আগে দুজনেই 'সো লং' জানিয়ে গেল কসনারকে।

গ্যালিভান আর গ্রুবেল বেরিয়ে যেতেই উঠে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এসে আবার শুয়ে পড়ল কসনার। হঠাৎই অকারণে মনটা বিষণ্ন হয়ে গেল ওর। কেন জানি বার বার মনে হতে লাগল গ্যালিভান আর গ্রুবেলের সাথে আর কোনদিন দেখা হবে না তার।

দ্রুত অপারেশন বিল্ডিঙের দিকে এগিয়ে চলল গ্যালিভান আর গ্রুবেল। দু'জনেই গানার। তবে আকাশে ওড়ার ব্যাপারে গ্যালিভানের চাইতে গ্রুবেলের উৎসাহই বেশি। আসলে মানুষ হয়ে না জন্মে পাখি হয়ে জন্মালেই যেন খুশি হত ও। তাছাড়াও তার আকাশে ওড়ার আরেকটা কারণ ছিল। অতিরিক্ত ধর্মপ্রবণ গ্রুবেল। আকাশে উঠলেই কল্পনা করত স্বর্গের অনেকটা কাছাকাছি পৌঁছে গেছে সে। এখানকার ট্রেনিং শেষ হলে বিমান বহরে চাকরি না নিয়ে ডিভিনিটি স্কুলে ভর্তি হয়ে পাদ্রী হবার ইচ্ছে আছে ওর। খুব শীঘ্রিই শেষ হয়ে যাচ্ছে ট্রেনিং। তাই বেশ খুশি মনেই হাঁটছে সে।

ধর্ম কর্ম নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামায় না গ্যালিভান। আকাশে ওড়ার দিকেও তেমন ঝোঁক নেই তার। তবে চাকরিটা ভাল, তাই এখন পর্যন্ত টিকে আছে। হাঁটতে হাঁটতে সে কিন্তু ভাবছে অন্য কথা। কসনারটা এল না কেন আজ? এখানে আসার পর থেকে তিনজনই একসাথে ডিউটিতে গেছে, আজই এর ব্যতিক্রম হল। জোর করে মন থেকে চিন্তাটা দূর করে দিল গ্যালিভান। মাত্র তো কয়েক ঘণ্টা। ফিরে এসে তিন বন্ধুতে একসাথে জাঁকিয়ে বসে নাটক দেখা যাবে।

অপারেশন বিল্ডিঙে পৌঁছে ওরা দেখল ওদের আগেই পৌঁছে গেছে অন্য পাইলটরা। রিজার্ভ বাহিনী থেকে লোক দেয়া হল কসনারের জায়গায়। বিমানের ইঞ্জিন, খুঁটিনাটি যন্ত্রপাতি, ফুয়েল, রেডিও ইত্যাদি পরীক্ষা শেষ। এবার ওড়ার পালা।

ঠিক একটা ত্রিশ মিনিটে নিজ নিজ বিমানের সামনে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল বৈমানিকেরা। ঠিক দুটোয় প্রথম টেক অফ করল লীডার প্লেন। তার পেছন পেছন বাকিগুলো। আকাশে উঠেই তীর চিহ্ন রচনা করে ফেলল পাঁচখানা অ্যাভেঞ্জার প্লেন। পুব অ্যাটলান্টিকের দিকে উড়ে চলল ওরা। একটা ভাঙা জাহাজকে আগে হতেই ফেলে রাখা হয়েছে ওদিকের সাগরের এক জায়গায়। ওটাই অ্যাভেঞ্জারগুলোর লক্ষ্য বস্তু।

ভাঙা জাহাজটার ওপরই বোমা ফেলা অভ্যেস করবে বৈমানিকেরা।

বিমানগুলো এয়ার স্টেশন ত্যাগ করতেই বাংক থেকে উঠে পড়ল কসনার। টেবিলের সামনে এসে বাড়িতে চিঠি লিখতে শুরু করল সে। তিনটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে চিঠি লেখা শেষ হল তার। আর পনেরো মিনিট পর ডিউটি শেষ করে ফিরে আসবে গ্যালিভান আর গ্রুবেল।

লডারডেল কন্ট্রোল টাওয়ারে বসে সামনের দেয়ালের বড় গোল ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বসে আছে তখন রেডিওম্যান। চারটে বাজলেই তার ছুটি। শেষবারের মত লগবুক চেক করতে লাগল সে। ঠিক সেই সময় ব্যাকুল কণ্ঠে কথা বলে উঠল তার সামনের রেডিওটা, 'কন্ট্রোল টাওয়ার। দিস ইজ অ্যান ইমারজেন্সি, উই আর ইন ডেঞ্জার। দিকভ্রান্ত হয়ে পড়েছি আমরা—মাটি দেখতে পাচ্ছি না—রিপিট, মাটি দেখতে পাচ্ছি না।'

উনিশ নম্বর ফ্লাইটের ছ'বছরের অভিজ্ঞ লেফটেন্যান্ট চার্লস টেলরের গলা চিনতে ভুল করল না রেডিওম্যান। সাথে সাথেই উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল সে, 'ফ্লাইট নাম্বার নাইনটিন, ঠিক কোথায় আছ তোমরা?'

'বলতে পারছি না,' উত্তর দিল টেলর, 'বুঝতে পারছি, হারিয়ে গেছি আমরা।'

স্তব্ধ হয়ে গেল রেডিওম্যান আর কন্ট্রোল টাওয়ারের প্রত্যেকটি লোক। বলে কি টেলর? আকাশে মেঘ নেই, কুয়াশা নেই, ঝড়ের চিহ্নও নেই, সবকটা প্লেনের মেশিন ভাল। এরকম পরিস্থিতিতে পথ ভুল করেছে টেলরের মত অভিজ্ঞ পাইলট?

'পশ্চিমে প্লেনের মুখ ঘোরাও।' টেলরকে পরামর্শ দিল কন্ট্রোল টাওয়ার।

'কোন্ দিক পশ্চিম সেটাই তো বুঝতে পারছি না। ঠিক মত কাজ করছে না ইনস্ট্রুমেন্টগুলো, সূর্য দেখতে পাচ্ছি না। নিচের ওটা সাগর

কিনা তাও বোঝা যাচ্ছে না!'

পাগল হয়ে গেল নাকি টেলর? এক সাথে, একই সময়ে পাঁচ পাঁচটা কম্পাসই বা বিকল হয় কি করে? সূর্য ডুবতে তখনও অনেক দেরি। তাহলে সূর্য দেখতে পাচ্ছে না কেন টেলর? তাছাড়া এয়ারপোর্ট থেকে খুব বেশি দূরে যায়নি প্লেনগুলো, তাহলে ডাঙাই বা চোখে পড়ছে না কেন ওদের?

কয়েক মুহূর্ত পরই পাঁচখানা বিমানের লোকেরা রেডিওর মাধ্যমে কথা বলতে শুরু করল নিজেদের মধ্যে, কন্ট্রোল টাওয়ারের লোকেরাও তা শুনতে পেল। কথার ধরনে বোঝা গেল সাংঘাতিক ভয় পেয়েছে ওরা।

ভীষণ নার্ভাস হয়ে পড়ল টেলর। নিজের হাতে আর কমান্ড রাখার ভরসা পেল না সে। অতএব তার ভার দখল করল মেরিন ক্যাপ্টেন জর্জ স্টিভার্স।

বিদ্যুৎ বেগে এই দুঃসংবাদ ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত লডারডেল এয়ারবেসে। হন্তদন্ত হয়ে রেডিও টাওয়ারে ছুটে এল উদ্বিগ্ন অ্যালেন কসনার। টাওয়ারের ঘড়িতে তখন বাজে চারটে পঁচিশ।

রেডিওতে জর্জ স্টিভার্সের কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে তখন। ক্রমশ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছে ওর গলার আওয়াজ। বোঝা যাচ্ছে, বিকল হয়ে যাচ্ছে প্লেনের রেডিও। স্টিভার্স বলছে, 'যদ্দূর মনে হয় তোমার স্টেশন থেকে দুশো পনেরো মাইল উত্তর পুবে উড়ছি আমরা। মনে হচ্ছে আমরা···।'

এটুকু বলেই চুপ হয়ে গেল স্টিভার্স। দাঁতে দাঁত চেপে কথাগুলো শুনল কসনার। স্টিভার্সের প্লেনেই উড়ছে গ্যালিভান আর গ্রুবেল, জানে সে।

স্টিভার্স আর কোন কথা বলে কিনা শোনার জন্যে টাওয়ারের রেডিওর কাছে কানখাড়া করে দাঁড়িয়ে রইল সে। হঠাৎ অতি ক্ষীণভাবে

আবার শোনা গেল স্টিভার্সের গলার স্বর। একটা কথাই শুধু বলল সে, 'উই আর কমপ্লিটলি লস্ট।'

যতভাবে সম্ভব ফ্লাইট নাম্বার নাইনটিনের সাথে এরপর বৃথা যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করল টাওয়ারের রেডিও অপারেটর। ব্যর্থ হয়ে বিপদ সংকেত ঘোষণা করল সে।

রেডিওর মাধ্যমে দূর থেকে দূরে ছড়িয়ে পড়ল সে দুঃসংবাদ। সন্ধ্যা নাগাদ সতর্ক হয়ে গেল ওদিককার সাগরে ভাসমান সমস্ত জাহাজ। বিমানগুলোকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়ল কোস্ট গার্ডরা।

ফোর্ট লডারডেলের একশো পঞ্চাশ মাইল উত্তরে ব্যানানা রিভার ন্যাভাল এয়ার স্টেশন নামে একটা এয়ারবেস আছে। বর্তমানে তার নাম পালটে গিয়ে হয়েছে পলট্রিক এয়ারবেস। এই বেসের কন্ট্রোল টাওয়ারের রেডিও থেকে বিকেল পাঁচটা পাঁচ মিনিটে (কারও কারও মতে সময়টা কয়েক মিনিট আগে বা পরে) একটা সাংকেতিক শব্দ শোনা গেল, 'এফ টি...এফ টি...'

মাত্র দু'বার। তারপরেই সব চুপ। নিঃসন্দেহে নিরুদ্দিষ্ট পাঁচখানা অ্যাভেঞ্জার বিমানের কোন একটি থেকেই এসেছে ওই শব্দ। কারণ কঠোর নির্দেশ দেয়া আছে, ফ্লাইট নাম্বার নাইনটিন ছাড়া আর কেউ ওই সংকেত ব্যবহার করতে পারবে না।

খবরটা পাওয়া মাত্র বারোজন বৈমানিক সহ বিশাল মার্টিন মেরিনার পি বি এস বিমান নিয়ে আকাশে উঠলেন ব্যানানা রিভার এয়ারবেসের লেফটেন্যান্ট হ্যারি। কোন বিমান বা বৈমানিক দুর্ঘটনা বশত পানিতে পড়ে গেলে তাকে উদ্ধার করার জন্যেই বিশেষ ভাবে তৈরি হয়েছে এই মার্টিন মেরিনার। ভীষণ অশান্ত সাগরের বুকেও স্বচ্ছন্দে নামতে পারে ওই বিমান। রবারের নৌকো আছে বিমানে, সে নৌকো পানিতে ডুববে না কিছুতেই। বিমানে বসানো ওয়াটার প্রুফ রেডিও ট্র্যান্সমিটারটা এমনভাবে তৈরি যে পানির সংস্পর্শে এলেই

বিপদ সংকেত পাঠাতে শুরু করবে। তাছাড়া চব্বিশ ঘণ্টা আকাশে ওড়ার মত তেল নেয়া যায় এর অয়েল ট্যাঙ্কে।

যেদিক থেকে শেষ বিপদ সংকেত পাঠিয়েছে অ্যাভেঞ্জার, আন্দাজে সেদিকে উড়ে চলল মার্টিন মেরিনার। বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে তল্লাশি চালাল ওটা। একটু পর পরই নিজের অবস্থান জানিয়ে রিপোর্ট করতে লাগল কন্ট্রোল টাওয়ারে।

হঠাৎ করেই খবর পাঠানো বন্ধ করে দিল মার্টিন মেরিনার। একটানা খবর পাঠাতে লাগল টাওয়ারের রেডিও অপারেটর, কিন্তু সাড়া দিল না মেরিনার। ব্যাপার কি? মেরিনারেরও কোন দুর্ঘটনা ঘটল নাকি? যাই ঘটুক না কেন, আর ফিরে এল না মার্টিন মেরিনার, কোন খবরও পাঠাল না।

রাতের বেলা আর কিছুই করার নেই। পরদিন ভোর হতেই রওনা দিল এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার 'সলোমন'। ঝাঁকে ঝাঁকে আকাশে উঠে গেল কোস্ট গার্ডদের সার্চ প্লেন। ব্রিটেনের রয়্যাল এয়ার ফোর্সের লোকেরাও অনুসন্ধানে যোগ দিল। এ ছাড়া সাগরে ভাসমান অসংখ্য জাহাজও নিজেদের কাজ বাদ দিয়ে খুঁজে বেড়াতে লাগল নিরুদ্দিষ্ট বিমানগুলোকে। ওদিকে ফ্লোরিডার আশে পাশের বন-জঙ্গল খুঁজে দেখতে বেরিয়ে পড়ল ডজন খানেক সার্চ পার্টি।

হাজার হাজার বর্গ মাইলের মধ্যে সাগর আর মাটির প্রত্যেকটি ইঞ্চি খুঁটিয়ে দেখা হল, কিন্তু কোন চিহ্নই পাওয়া গেল না বিমানগুলোর। সম্ভাব্য সকল দিক থেকে ঘটনাটি বিচার করেও কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারল না ন্যাভাল বোর্ড অফ এনকয়েরি। সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে না পেরে বিরক্ত হয়ে কেউ কেউ মন্তব্য করল—বোধ হয় মঙ্গল গ্রহে চলে গেছে বিমানগুলো। কেউ কেউ আবার বলল, ওই অঞ্চলের আকাশের কোথাও ফাঁক আছে একটা। যার ভেতর একবার ঢুকে পড়লে আর বেরিয়ে আসতে পারে না কেউ।

সার্চ পার্টিরা ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসার পর পরই লডারডেল এয়ারবেস থেকে চলে গিয়েছিল অ্যালেন কসনার। আসলে বন্ধুদেরকে হারিয়ে লডারডেলের পরিবেশ দুঃসহ হয়ে উঠেছিল ওর কাছে। এ ঘটনার চব্বিশ বছর পর ফ্লাইট নাম্বার নাইনটিন নিয়ে একটা ডকুমেন্টারি ফিল্ম তৈরি করার সময় বাধ্য হয়ে একবার ফোর্ট লডারডেলে আসতে হয়েছিল কসনারকে। লডারডেলে পা দিয়েই চব্বিশ বছর পরও যেন তার কানে বেজে উঠল গ্যালিভান আর গ্রুবেলের বিদায় সম্ভাষণ 'সো লং'। কসনারের সংস্পর্শে এসেছে এমন কেউ কেউ বলে বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের নাম শুনলেই নাকি কেঁদে ফেলে সে, আর অভিশাপ দেয়।

উনিশশো আটচল্লিশ সালের উনত্রিশে জানুয়ারি। ব্রিটিশ সাউথ আমেরিকান এয়ারওয়েজ কোম্পানির ট্যুডর ফোর গ্রুপের চার ইঞ্জিন বসানো বিলাসবহুল এয়ার লাইনার 'স্টার টাইগার' বিকেল বেলা বাইশ জন যাত্রী আর দু'জন ক্রু সহ লন্ডন এয়ারপোর্ট থেকে রওনা দিল বারমুডার দিকে। পথে পড়বে লিসবন, সান্টা মারিয়া, অ্যাজোরস এবং হ্যামিলটন। লিসবন ছাড়ার পরই হাওয়ার গতি বেড়ে যাওয়ায় স্টার টাইগারের গতি কমে গেল। কিন্তু তাতে ভয়ের কিছু নেই। প্রায়ই ঘটে এমন।

স্টার টাইগার অ্যাজোরস বিমান বন্দর ছাড়ল রাত সাড়ে দশটায়। অ্যাজোরস ছাড়িয়েই বারমুডা টাওয়ারকে খবর পাঠাল বিমানের পাইলট, ঘণ্টা দেড়েক পরই হ্যামিলটনে ল্যান্ড করতে যাচ্ছে সে। ভোর একটায় আবার খবর পাঠাল পাইলট, বারমুডার চারশো চল্লিশ মাইল উত্তর-পুবে আছে এখন তার বিমান। বাতাসের গতি একটু বেশিই, তবে তাতে কোন অসুবিধে হবে না। বিমানের কলকজার কোন গণ্ডগোল নেই, আকাশও পরিষ্কার। বারমুডা টাওয়ারে প্রেরিত পাইলট

ডেভিড কোলবির্ এই-ই শেষ সংবাদ।

এরপর বহুক্ষণ স্টার টাইগারের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হল বারমুডা টাওয়ার, বাধ্য হয়ে হ্যামিলটন কন্ট্রোল টাওয়ারের সাথে যোগাযোগ করল সে। হ্যামিলটন টাওয়ারও স্টার টাইগারের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। বিপদ সংকেত ঘোষণা করল বারমুডা টাওয়ার, হুঁশিয়ার হয়ে গেল সাগরে ভাসমান জাহাজ আর উপকূলের কোস্ট গার্ড।

ভোর হতেই শুরু হল খোঁজা। দু'লক্ষ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে চষে ফেলা হল, কিন্তু পাওয়া গেল না স্টার টাইগারকে। পাঁচ দিন পর, তেসরা ফেব্রুয়ারি, ফ্লোরিডা থেকে শুরু করে নোভাস্কোসিয়ার উপকূল পর্যন্ত রেডিওতে সারারাত ধরে একটা ডিসট্যান্ট সিগন্যাল শোনা গেল স্টা-র টা-ই-গা-র স্টা-র টা-ই গা-র।

অস্বাভাবিক রেডিও সিগন্যাল শুনে বিস্মিত হয়ে গেল অপারেটররা। ইন্টারন্যাশনাল মোর্স কোডে পাঠানো হয়নি সিগন্যাল, তার সাথে এস ও এস-ও নেই। ইংরেজি A অক্ষরের জন্যে একটি, B-এর জন্য দুটি, C-এর জন্যে তিনটি, D-এর জন্যে চারটি ডট, এভাবে হিসেব করে পাঠানো হয়েছে সিগন্যাল। নিঃসন্দেহে অ্যামেচারের কাজ।

পানিতে পড়ার সাথে সাথে ডুবে যাবে না স্টার টাইগার, কিন্তু পাঁচদিন ধরে ভেসেও থাকতে পারবে না কিছুতেই। না হয় ধরা গেল স্টার টাইগার থেকে রবারের নৌকা নিয়ে সাগরে ভেসে পড়েছে কেউ, কিন্তু সেক্ষেত্রে বিমানের রেডিওটি নৌকোয় তোলা যাবে না। কারণ রেডিও এত ভারি যে রবারের নৌকো তার ভার সইতে পারবে না কিছুতেই। তাহলে?

পাঁচ

কুসচে কি বলেন?

রহস্যময় ভাবে একের পর এক ওই অভিশপ্ত ত্রিভুজে হারিয়ে যাচ্ছে জাহাজ, বিমান, মানুষ। উনিশশো চল্লিশ সালের আগে পর্যন্ত ব্যাপারটার খুব একটা গুরুত্ব দেয়া হয়নি। সাগরে জাহাজ ডোবেই, আকাশেও বিমান দুর্ঘটনা ঘটে। তার ভেতর অস্বাভাবিকতা কোথায়?

কিন্তু তারপরই আস্তে আস্তে শঙ্কিত হয়ে উঠতে লাগল মানুষ। হারাচ্ছে হারাক, কিন্তু তার কোন চিহ্ন পাওয়া যাবে না কেন? তাছাড়া যা কিছু অলৌকিক ব্যাপার ঘটছে তা ওই ছোট্ট এলাকাটুকুর মধ্যে কেন? নাহ্, তলিয়ে দেখতে হচ্ছে ব্যাপারটা।

বারমুডা ট্রায়াঙ্গলকে নিয়ে অনেকেই অনেক কথা বলল, তার ভেতর লৌকিক, অলৌকিক, বিজ্ঞান ভিত্তিক, কল্পিত অনেক মন্তব্যই আছে। তবে লরেন্স ডেভিড কুসচে নামে এক আমেরিকান ভদ্রলোকের দেয়া তথ্যগুলোই সবচে নির্ভরযোগ্য।

মি. কুসচে অ্যারিজোয়োনা স্টেট ইউনিভার্সিটির হেডেন লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান। এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই বি. এ. এবং এম. এ. পাস করেন তিনি। মাস্টার অফ লাইব্রেরি সায়েন্স ডিগ্রি অর্জন করেন ডেনভার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর লেখা বই 'The Bermuda Triangle Mystry–Selved,' তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, বারমুডা ট্রায়াঙ্গলে আসলে রহস্য বলে কিছু নেই। সঠিক, সুচিন্তিত তদন্তের অভাবেই আপাতদৃষ্টিতে

এখানকার দুর্ঘটনাগুলোকে রহস্য বলে মনে হয়।

লয়েডস রেজিস্টারের (জাহাজের খবরাখবর রাখাই এ প্রতিষ্ঠানের কাজ) দফতরে লেখালেখি করে, পুরানো খবরের কাগজের ফাইল ঘেঁটে বিভিন্ন জাহাজ এবং বিমান কোম্পানিতে খোঁজ নিয়ে, আমেরিকান কোস্ট গার্ড এবং নৌবিভাগের সাথে যোগাযোগ করে অনেকগুলো রহস্যের কিনারা করার চেষ্টা করেছেন কুসচে। বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের রহস্য সম্পর্কে বিশ্বাস করেন না কুসচে, তবে রহস্য নেই এ কথাও বলতে চান না। তাঁর আলোচ্য বিষয়গুলোর মধ্যে একটি হল 'রোজলি' জাহাজের রহস্য।

বাহামা দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত ন্যাসে বন্দরের কাছাকাছি সাগরে ১৮৪০ সালের আগস্ট মাসের কোন একদিন একটা জাহাজকে ভাসতে দেখা গেল, জাহাজটার নাম 'রোজলি'। জীবন্ত প্রাণী বলতে খাঁচায় বন্দী একটি ক্ষুধার্ত ক্যানারি পাখি একটা বিড়াল আর গোটা কয়েক মুরগী ছাড়া জাহাজে আর কেউ ছিল না। জাহাজ বোঝাই দামী দ্রব্যসামগ্রী যেমন ছিল তেমনি পড়ে আছে, শুধু তার যাত্রী বা নাবিক কেউ নেই।

ব্যাপারটাকে তাঁর 'লো' বইতে স্থান দিয়েছিলেন চার্লস ফোর্ট। বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৩১ সালে। পুরানো খবরের কাগজের ফাইল ঘেঁটে ঘেঁটে অদ্ভুত সব ঘটনা বের করাই ছিল ফোর্টের নেশা। এমনি ঘাঁটতে ঘাঁটতেই একদিন টাইমসের পাতায় লেখা রোজলির ঘটনার কথা জানতে পারেন তিনি। ১৮৪০ সালের ৬ নভেম্বরে টাইমসের ৬ নম্বর পাতায় ছাপা হয়েছিল খবরটি। শিরোনামঃ 'পরিত্যক্ত জাহাজ'। সংবাদদাতা লিখেছেনঃ 'দিন চারেক আগে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে। বড় আকাশের একটা ফ্রেঞ্চ জাহাজ হামবুর্গ থেকে হাভানা যাওয়ার পথে আমাদের একটা জাহাজের নজরে পড়ে। সাগরের এক জায়গায় চুপচাপ ভাসছিল জাহাজখানি। কাছে গিয়ে দেখা গেল জাহাজটি পরিত্যক্ত। জাহাজের বেশির ভাগ পালই টাঙানো রয়েছে

এবং সম্পূর্ণ অক্ষত আছে জাহাজটা। জাহাজের সমস্ত দামী মালপত্রও আগের জায়গায়ই পড়ে আছে। মদ, ফল, সিলক ইত্যাদি দামী মালপত্রে ঠাসা জাহাজের গুদাম। যথাস্থানেই রয়েছে জাহাজের ক্যাপ্টেনের কাগজপত্রগুলো। অফিসার ও যাত্রীদের কেবিনগুলো দামী আসবাবপত্রে সাজানো এবং ওগুলোর অবস্থা দেখে বোঝা যায় অতি অল্প সময়ের নোটিশে যাত্রীরা জাহাজ ছেড়ে চলে গেছে। মহিলাদের কিছু প্রসাধনী এবং কাপড়চোপড় পড়ে থাকতে দেখা গেছে একটা কেবিনে। দেখেই বোঝা যায় তাড়াহুড়ো করে কেবিন ছেড়ে বেরিয়ে গেছে ওরা। সমস্ত জাহাজটা তন্ন তন্ন করে খুঁজেও একটা জীবিত বা মৃত মানুষের সন্ধান পাওয়া যায়নি। জীবিত প্রাণী বলতে ছিল একটা বিড়াল, একটা ক্যানারি আর কয়েকটা মুরগী। প্রায় নূতন ওই জাহাজটার নাম রোজলি। নাবিক বা জাহাজের যাত্রীদের কি হল জানা যায়নি এখনও।'

ফোর্টের লো বইতে টাইমসের ওই সংবাদটিও স্থান পেয়েছে। ওটা পড়ার পরই আগ্রহ বেড়ে গেল কুসচের। বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ খবর নিতে শুরু করলেন তিনি। কিন্তু কেউই 'রোজলি' নামের কোন জাহাজের খোঁজ দিতে পারল না। লয়েডসের অ্যাসিস্ট্যান্ট শিপিং এডিটর মি. জে এফ লেন চিঠি লিখে কুসচেকে জানালেন, ১৮৪০ সালে বাহামার অন্তর্গত কোন স্থানে 'রোজলি' নামে কোন জাহাজের ঘটনা আমাদের রেকর্ডে নেই। তবে রেকর্ডের পুরানো কপি থেকে রসিনি নামে একটা জাহাজের কিছু ইন্টারেস্টিং তথ্য পেয়েছি। তথ্যগুলো আপনার কাজে লাগতে পারে ভেবে জানাচ্ছি।

'লয়েডস লিস্ট, ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৪০ঃ হাভানা ১৮ আগস্ট। এ মাসের ৩ তারিখে 'রসিনি' নামে একটা জাহাজ হামব্রো থেকে এই বন্দরে আসার সময় মুয়ারেস এ (বাহামা চ্যানেল) আটকে যায়। নাবিক ও যাত্রীদের স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

'লয়েডস লিস্ট, ১৭ অক্টোবর, ১৮৪০ঃ হাভানা ৫ সেপ্টেম্বর। গত মাসের ৩ তারিখে মুয়ারেস এ আটকে যাওয়া, হামব্রো থেকে আগত রসিনি জাহাজটিকে গত মাসেরই ১৭ তারিখে বন্দরে আনা হয়েছে। পরিত্যক্ত অবস্থায়ই আছে জাহাজটি।'

তখনও (১৮৪০ সালে) টাইপরাইটার চালু হয়নি, কাজেই সমস্ত সংবাদ এবং চিঠিপত্র হাতে লিখে পাঠানো হত। হয়ত সে কারণেই 'রসিনি'কে ভিন্নভাষী লোকেরা রোজলি পড়ে এবং সে নামটাই চালু হয়ে যায়। রোজলি এবং রসিনির যাত্রাপথ (হামবুর্গ থেকে হাভানা) মিলে যাচ্ছে, রওনা দেবার তারিখ মিলে যাচ্ছে, দুর্ঘটনার স্থানও (ন্যাসো) মিলে যাচ্ছে।

আরও নিশ্চিত হওয়ার জন্যে ন্যাসোর শিক্ষা ও সংস্কৃতি দফতরের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন কুসচে। তারাও জানাল রসিনির উচ্চারণ ভুলক্রমে রোজলি হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে।

এখন কুসচের কথা হচ্ছে সত্যিই যদি 'রোজলি' 'রসিনি' হয় তাহলে তার যাত্রী এবং নাবিকেরা জাহাজ থেকে উধাও হয়ে যায়নি; তাদের অন্য জাহাজে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। অতএব রহস্য আর রহস্য থাকছে না।

'রোজলি' বা 'রসিনি'র মতই 'মেরি সিলেস্টের' নাবিক এবং যাত্রীদেরকে জাহাজে পাওয়া যায়নি। ডাই গ্রেসিয়ার ক্যাপ্টেন মুর হাউসের নির্দেশে ডাই গ্রেসিয়ার নাবিকেরা মেরি সিলেস্টকে জিব্রালটারের বন্দরে নিয়ে আসার পর পরই নানা রকমের মন্তব্য শুরু হল। কেউ কেউ বলল রহস্য টহস্য কিছু না, আসলে ক্যাপ্টেন মুর হাউসই ঘটিয়েছে ঘটনাটা। নিউইয়র্ক বন্দরে মাল বোঝাই করার সময়ই নিজের লোককে মেরি সিলেস্টে তুলে দেয় মুর হাউস। গভীর সমুদ্রে পৌছে তারাই মেরি সিলেস্টের নাবিকদের এবং ক্যাপ্টেনকে তার স্ত্রী-কন্যা সহ হত্যা করে

সাগরে ফেলে দেয়। কাজ শেষ হলে মেরি সিলেস্টকে কোথায় এনে রাখবে হত্যাকারীরা; তা তাদেরকে আগে থেকেই বলে দিয়েছিল মুর হাউস। নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে হত্যাকারীদের নিজের জাহাজে তুলে নেবে সে। অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করে হত্যাকারীরা।

এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার, জাহাজের রেজিস্টার, কিছু প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সেক্সটান্ট, ক্রনোমিটার ইত্যাদি যা জাহাজে থাকা উচিত ছিল তা কিন্তু পাওয়া যায়নি মেরি সিলেস্টে! এমন কি বোঝাই মালের বিল অফ লোডিংগুলোও পাওয়া যায়নি। সন্দেহকারী লোকেরা মনে করে মদের পিপে ছাড়াও এমন কিছু মূল্যবান জিনিস জাহাজে ছিল যেগুলো সরিয়েছে মুর হাউস।

কিন্তু মূল্যবান জিনিস কি ছিল? নিউইয়র্ক বন্দরে খোঁজ নিলেই তা জানা যাবে। কিন্তু খোঁজ নিয়েও তা জানা যায়নি। এর উত্তরে সন্দেহকারীরা বলে মেরি সিলেস্টে চোরাই মাল ছিল এবং তা জানার কথা নয় বন্দর কর্তৃপক্ষের।

১৮৭৩ সালের ২৪ মার্চ নিউইয়র্ক টাইমসের অফিসে একটা চিঠি লিখেছিলেন মার্কিন সরকারের ট্রেজারি বিভাগের সেক্রেটারি উইলিয়াম রিচার্ড। তাঁর মতে মদের পিপে থেকে চুরি করে মদ খেয়ে মাতাল হয়ে মেরি সিলেস্টের ক্যাপ্টেন এবং তাঁর স্ত্রী কন্যাকে খুন করে সাগরে ভাসিয়ে দিয়েছে জাহাজের নাবিকেরা, তারপরে যেভাবেই হোক সরে পড়েছে।

কিন্তু তা হলে মেরি সিলেস্টের অদ্ভুত একজন নাবিককেও কোন না কোন বন্দরে বা অন্য কোথাও দেখা যেত। তা তো দেখা যায়নি। জাহাজ থেকে নামানর আগেই মদের পিপেগুলোকে ভালমত পরীক্ষা করে দেখা হয়েছিল, সম্পূর্ণ অক্ষত ছিল ওগুলো।

মেরি সিলেস্টকে ভাল করে দেখার পরে 'প্লিমাথ' জাহাজের ক্যাপ্টেন বলেছেন, হয়ত কোন কারণে ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল মেরি

সিলেস্টের লোকেরা, হয়ত ভেবেছিল জাহাজখানি এখুনি ডুবে যাবে। অতএব জাহাজের লাইফবোর্ট নিয়ে সাগরে ভেসে পড়েছিল তারা। কিন্তু পরে সমস্ত যাত্রীসহ ডুবে গিয়েছিল সেই লাইফবোট। ক্যাপ্টেনের কথাকে সমর্থন করে বললেন মেরি সিলেস্টের মালিক উইনচেস্টার। মাঝে মাঝে রাসায়নিক কারণে অ্যালকোহলের পিপে থেকে বাষ্প নির্গত হয়। হয়ত এরকম বাষ্প নির্গত হতে দেখেই নাবিকেরা মনে করে পিপের মধ্যে বিস্ফোরক পদার্থ আছে এবং তা ফেটে গিয়ে জাহাজ ডুবে যাবে মনে করে বোটে চেপে সাগরে ভেসে পড়ে তারা। কথাটা বিশ্বাসযোগ্য।

কেউ বলল কারখানাতে পিষিয়ে নেবার সময় মাঝে মাঝে আরগট চূর্ণ মিশে যায় গম বা যবের সাথে। সেই আরগট চূর্ণ মেশানো আটা বা ময়দা খেলে সাময়িকভাবে মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটে থাকে মানুষের, চোখের সামনে বিভীষিকার ছবি দেখে। হয়ত মেরি সিলেস্টের ভাঁড়ারে রাখা ময়দায় কোনভাবে আরগট চূর্ণ মিশে গিয়েছিল, এবং তা পেটে পড়ার পর পাগল হয়ে গিয়ে সাগরে লাফিয়ে পড়েছিল জাহাজের লোকেরা। এ কথাটাও বিশ্বাসযোগ্য। কিন্তু কথাটা যখন প্রচারিত হল তখন আর মেরি সিলেস্টের ময়দা পরীক্ষা করার সময় ছিল না। কারণ তার আগেই জাহাজ থেকে নামানর পর বিভিন্ন জায়গায় চলে গেছে সে ময়দা।

এ ছাড়াও আরও অদ্ভুত সব কথা বলে বেড়িয়েছে লোকে। কেউ বলেছে কোন ডুবো জাহাজ থেকে জাহাজ লক্ষ্য করে কামান দাগা হয়েছিল। সে কামানের গোলায় শেল-এর পরিবর্তে ছিল বিষাক্ত গ্যাস। ওই গ্যাস মেরি সিলেস্টকে আচ্ছন্ন করে ফেলায় প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে জাহাজের লোকেরা। সে অঞ্চলের বিশাল সব অক্টোপাস আর সামুদ্রিক প্রাণীরা সাথে সাথেই সাগরের তলায় টেনে নিয়েছে লোকগুলোকে। কেউ বলে কোন গ্রহ থেকে মানুষের চেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী নেমে এসে পরীক্ষা করে দেখার জন্যে ধরে নিয়ে গেছে

মেরি সিলেস্টের লোকদের।

এ সমস্ত কথাই পুরানো পত্র পত্রিকা ঘেঁটে আর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে খোঁজ নিয়ে জেনেছেন কুসচে, কিন্তু এতে সমাধান হল না মেরি সিলেস্ট রহস্যের।

সে-রহস্যময় ঘটনার পরও বেশ কয়েক বছর সাগর পাড়ি দিয়েছিল মেরি সিলেস্ট। তারপর ১৯৮৫ সালে বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের কাছেই কিউবার পাথুরে উপকূলে ধাক্কা লেগে গুঁড়িয়ে যায় জাহাজটা।

প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ দিকে ডুবে যায় ইউ এস এস সাইক্লপস। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বারবেডস বন্দরে আকরিক ম্যাঙ্গানিজ বোঝাই করে আমেরিকার পূর্ব উপকূলের নরফোক বন্দরে পৌঁছবার পথে হারিয়ে যায় কয়লাবাহী এই জাহাজটি। বহু অনুসন্ধানের পরও সাইক্লপসের কোন খোঁজ না পেয়ে স্বীকার করল ইউ এস নেভি, এর আগে এমন রহস্যময় ভাবে আর কোন আমেরিকান জাহাজ ডোবেনি। এমন কি প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসনও জাহাজখানার দুর্ভাগ্যে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন।

সন্দেহ করা হয়েছে আভ্যন্তরীণ কোন বিস্ফোরণের ফলে বা ঝড়ের কবলে পড়ে নিখোঁজ হয়েছে সাইক্লপস। অনেক বিবেচনা করে ইউ এস ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্স নিম্নোক্ত কয়েকটি কারণ দাঁড় করিয়েছিলঃ

১। বিদ্রোহী হয়ে জাহাজ দখল করে নিয়ে অনির্দিষ্ট পথে যাত্রা করে সাইক্লপসের নাবিকেরা।

২। সে সময়ে ওই জাহাজের যাত্রী ছিলেন রিও ডি জেনারিয়োর মার্কিন কনসাল জেনারেল। মার্কিন হলেও জার্মানদের সমর্থক ছিলেন তিনি। তিনিই কোন এক সুযোগে জাহাজখানিকে জার্মানদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

৩। সাইক্লপসের ক্যাপ্টেন ওরলির জন্মস্থান জার্মানিতে। মনে মনে যে জার্মানির সমর্থক ছিলেন না তিনি একথা হলপ করে বলা যায় না।

তিনিও জার্মানদের হাতে জাহাজখানা তুলে দিতে পারেন।

৪। জার্মান সাবমেরিনের টর্পেডোর আঘাতে ডুবে গেছে সাইক্লপস।

৫। ম্যাঙ্গানিজ বোঝাই ছিল সাইক্লপসে। ম্যাঙ্গানিজ ডাইঅক্সাইড দাহ্য পদার্থ। তাতে কোন অসাবধান মুহূর্তে আগুন ধরে গিয়ে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের সৃষ্টি হতে পারে।

৬। সাংঘাতিক কোন যান্ত্রিক গোলমাল হয়েছিল সাইক্লপসের। তাদের সব কটা কারণই সম্ভাবনাপূর্ণ, কিন্তু এগুলোর স্বপক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

গভীর একাগ্রতা নিয়ে সাইক্লপসের রহস্যময় অন্তর্ধানের কারণ অনুসন্ধান করে যেতে থাকলেন কুসচে। পুরানো নথিপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে জনৈক লেঃ কমান্ডার ম্যালন এস টিসডেলের লিখিত একটা বিবৃতি পেয়ে গেলেন তিনি। ইউ এস ন্যাভাল ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত ১৯২০ সালের জানুয়ারি সংখ্যার প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে ওই বিবৃতি। টিসডেলের লেখা থেকে জানা যায় নিখোঁজ হয়ে যাবার আগে একবার সাইক্লপসের যাত্রী হয়েছিলেন তিনি। সে সময়ে টিসডেল লক্ষ করেছিলেন, জাহাজের নিচে রাখা পানির ট্যাংকগুলোর ঢাকনা সব সময়েই খোলা থাকে, ওগুলো দেখে তাঁর মনে হয়েছিল, শূন্য ট্যাংকের তলা কোনরকমে ফুটো হয়ে যদি তাতে সাগরের পানি ঢুকে যায় তাহলে জাহাজের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে তৎক্ষণাৎ ডুবে যাবার আশঙ্কা আছে। তাঁর আশঙ্কার কথা ক্যাপ্টেনকে জানাতেই হেসে উঠে জানিয়েছিলেন তিনি, নেভি ইয়ার্ডের নির্দেশানুসারেই পানির ট্যাংকের ঢাকনা খুলে রাখা হয়েছে।

শেষ যাত্রায় বারবেডস থেকে ম্যাঙ্গানিজ বোঝাই করে যখন নরফোকের দিকে যাচ্ছিল সাইক্লপস তখন কোন কারণে স্থানচ্যুত হয়ে জাহাজের খোলের শেষ প্রান্তে চলে যায় ম্যাঙ্গানিজ। অশান্ত সাগরে

এরকম হওয়াটা বিচিত্র কিছু নয়। ম্যাঙ্গানিজ জাহাজের শেষপ্রান্তে চলে যেতেই কাত হয়ে যায় জাহাজ এবং ঢাকনা খোলা পানির ট্যাংকে সাগরের পানি ঢুকে পড়ে। ফলে হয়ত ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গিয়ে ডুবে যায় জাহাজ।

টিসডেলের এ যুক্তি মোটামুটি বিশ্বাসযোগ্য, কিন্তু কুসচের তা মনঃপুত হল না। পুরানো সংবাদপত্রের ফাইল ঘেঁটেই চললেন তিনি, এবং দারুণ একটা খবর পেয়ে গেলেন একদিন।

১৯৬৮ সালে রহস্যজনক ভাবে ডুবে যায় অ্যাটমিক শক্তিতে পরিচালিত ইউ এস নেভির সাবমেরিন 'স্করপিয়ন'। সেটার অনুসন্ধানে নরফোক বন্দরের সত্তর মাইল পুবে একজন ডুবুরি নামানো হয়, তার নাম ডিন হস। সাগরের একশো আশি ফুট গভীরে একটা অদ্ভুত কাঠামোর জাহাজ দেখতে পায় হস। পুরানো কাঠামোর জাহাজটা ওখানে এল কোথা থেকে?

পানি থেকে উঠে এসে নেভিকে জানাল হস। তখন হারিয়ে যাওয়া কিছু বড় জাহাজের ছবি দেখানো হল তাকে। সাইক্লপসের ছবি দেখে তার মনে হল এটাই দেখেছে সে। যেখানে জাহাজটিকে দেখেছে সে সে-পথ দিয়েই সাইক্লপসের নরফোক যাবার কথা। নৌবিভাগকে ব্যাপারটা ভালমত অনুসন্ধান করে দেখতে বলল হস। ভারজিনিয়ার কংগ্রেস প্রতিনিধি উইলিয়াম হোয়াইট হার্স্টও হসের পক্ষে অনুরোধ করলেন নৌবিভাগকে। রিপোর্টটা বেশ মনে ধরল কুসচের। বিষয়টা নিয়ে ভাবতে শুরু করলেন তিনি।

জাহাজখানা যদি সাইক্লপস হয় তাহলে বন্দরের এত কাছে এসে ডুবল ওটা অথচ একটা খবরও পাঠাতে পারল না কেন? রওনা হবার পর যখন জ্বালানী কয়লার পরিমাণ বেশি ছিল, অর্থাৎ জাহাজের বোঝা আরও বেশি ছিল তখন ডুবল না কেন জাহাজটা? ভেবে ভেবে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন কুসচে, নিশ্চয়ই ঝড়ের কবলে পড়ে ডুবে

গেছে সাইক্লপস। ব্যাপারটা বর্ণনা করলেন তিনি এভাবে—

'বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে বন্দর ছাড়ার পর সাইক্লপসের একটি ইঞ্জিন বিকল হয়ে যায়। এতে গতি কমে যায় তার। নর্থ ইকোয়েটোরিয়াল স্রোত অনুসরণ করে গালফ স্ট্রীমে এসে পড়ার পর স্রোতের অনুকূলে থেকে গতি বেড়ে যায় সাইক্লপসের। দিনে অন্ততপক্ষে একশো বিশ মাইল সামুদ্রিক পথ অতিক্রম করতে পারছিল তখন জাহাজটা। এ সময়ে নরফোক থেকে পাঁচশো মাইল দূরে ছিল সাইক্লপস।

এভাবে হিসেব করলে দেখা যায় ডোবার আগে নরফোকের সত্তর মাইল দূরে পৌঁছতে পেরেছিল সাইক্লপস। জাহাজটা ডুবে যাওয়ার জন্যে একমাত্র প্রচণ্ড ঝড়কে দায়ী করেন কুসচে। এখন ঝড় খুঁজে বের করতে হবে। অর্থাৎ সাইক্লপস ডোবার দিনে ওই এলাকায় ঝড় হয়েছিল কিনা জানতে হবে।

উত্তুরে হাওয়া আর বিপরিতমুখী গালফ স্ট্রীমের সংঘাতে প্রচণ্ড ঝড়ের সৃষ্টি হয়। একথা ভৌগলিক মাত্রেরই জানা আছে। হয়ত এরকম কোন ঝড়ে পড়েই ডুবে গেছে সাইক্লপস। ব্যাপারটা জানার জন্যে নর্থ ক্যারোলিনার অ্যাশভিল শহরের ক্লাইমেটিক সেন্টারে টেলিফোন করলেন কুসচে। যত পুরানো কালের কথাই হোক না কেন, তার উত্তর দেবার যথাসাধ্য চেষ্টা করে এই সেন্টার। রেকর্ড ঘেঁটে কুসচের প্রশ্নের উত্তরে জানাল ওরা, ১৯১৮ সালের মার্চের শুরু থেকেই প্রবল বাতাস বইতে থাকে নরফোক বন্দর ও তার আশেপাশের অঞ্চলে। মাসের আট তারিখে বাতাসের বেগ কমে গিয়ে ৯ তারিখে আবার বাড়তে শুরু করে। সেই দিনই বিকেলে পুব উপকূলের জন্যে ঝড়ের সংকেত জানানো হয়।

সেদিন সন্ধ্যার পর পরই দক্ষিণ পশ্চিম থেকে প্রবল বাতাস বইতে শুরু করে। পরদিন দশ তারিখে আরও বেড়ে গিয়ে দুপুরের দিকে

আটান্ন মাইল পর্যন্ত উঠে আসে বাতাসের বেগ। দুপুরের পর দিক পরিবর্তন করে বাতাস, ঘুরে যায় উত্তর পশ্চিম দিকে। তখন আরও বেড়ে যায় বাতাসের গতি। বিকেল পাঁচটার পর থেকে কমতে কমতে চল্লিশ মাইলে এসে দাঁড়ায় বাতাসের গতি এবং মাঝ রাতে থেমে যায় ঝড়।

ঘন্টায় চুরাশি মাইল বেগে নিউইয়র্কের উপকূলে আঘাত হানে ওই ঝড়। নরফোকের তিনশো পঁচাত্তর মাইল উত্তর-পুবে ওই ঝড়ের কবলে পড়ে যায় 'অ্যামলকো' নামে একটা জাহাজ। তবে অনেক ক্ষতি স্বীকার করার পর বহু কষ্টে রক্ষা পায় জাহাজটা। পরে ভারজিনিয়ার পাইলট প্রতিনিধিকে জানায় অ্যামলকো জাহাজের ক্যাপ্টেন, তার বিশ্বাস, ওই প্রচণ্ড ঝড়ের কবলে পড়েই ডুবে গেছে সাইক্লপস।

১৩ মার্চ নরফোক বন্দরে সাইক্লপসের পৌছানর কথা ছিল। জাহাজ নিখোঁজ হবার পর তাকে খুঁজতে বেরোল ইউ এস নেভি। ধরেই নিয়েছিল ওরা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ অঞ্চলে নিখোঁজ হয়েছে সাইক্লপস, সুতরাং সে অঞ্চল এবং তার আশে পাশের খাঁড়িগুলো তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল। তারপর ওই অঞ্চলে জাহাজের কোন খোঁজ না পেয়ে একে এক সাংঘাতিক রহস্য বলে প্রচার করে দিল।

কিন্তু ওয়েস্ট ইন্ডিজ অঞ্চলে জাহাজের খোঁজ পাওয়া যাবে কি করে? আসলে তো সেখানে ডোবেইনি জাহাজ।

বসন্তকালীন ঝড় এবং বছরে যখন তখন হঠাৎ করে বয়ে যাওয়া প্রবল হাওয়ার সাথে খুবই পরিচিত আমেরিকার পূর্ব উপকূলের অধিবাসীরা। বছরে কোন একদিনের ঝড়ের কথা তাদের কারও খেয়াল থাকার কথা নয়।

তবু 'ভারজিনিয়া পাইলট'-এ ঝড়ের আশঙ্কা জানিয়ে ছোট্ট একটা খবর ছাপা হয়েছিল দশই মার্চ। পূর্ব সংকেত মত ঠিকই এসেছিল ঝড়, কিন্তু ঝড়ের পর কি ঘটেছিল তার কোন বিবরণ দেয়া হয়নি পরদিন বা

তার পরদিনের পত্রিকায়। এর পাঁচ সপ্তাহ পর সাইক্লপসের নিখোঁজ সংবাদ ছাপা হলে ঝড়ের সাথে তার সম্পর্কের কথা কেউ ভেবেও দেখেনি।

প্রথম মহাযুদ্ধ চলছে তখন। চারদিকে বহু জাহাজ ডুবছে। সুতরাং বিশেষ করে শুধু সাইক্লপসের কথা কে ভাবতে যাবে? এ ভাবেই সাইক্লপসের ডোবার আসল রহস্য চাপা পড়ে গিয়েছে।

জাহাজটা ডুবে যাওয়ায় কারও কোন মাথা ব্যথা ছিল না, কারণ জাহাজে এমন কোন ব্যক্তি বা বস্তু ছিল না যার জন্যে কারও আগ্রহ জন্মাতে পারে। খবর নিয়ে সাইক্লপসের যাত্রীদেরও একটা তালিকা প্রস্তুত করেছেন কুসচে। তিনজন খুনের আসামী ছিল সাইক্লপসে। ষড়যন্ত্র করে একজন শিপ মেটকে খুন করেছিল ওরা। বিচারে পঞ্চাশ থেকে নব্বই বছর পর্যন্ত সাজা হয় তাদের। জাহাজের সেলে পুরে স্থানান্তরিত করা হচ্ছিল আসামীদেরকে।

কুসচের মত হস-এর দেখা জাহাজটা সমুদ্রগর্ভ থেকে তুলে আনলেই সমস্ত রহস্যের সমাধান হয়ে যাবে। তার দৃঢ় বিশ্বাস জাহাজটা সাইক্লপসই।

পাঁচটা অ্যাভেঞ্জার আর একটা মার্কিন মেরিনার বিমানের কথায় আসছি আবার। অ্যাভেঞ্জার বিমানগুলোর কথাই ধরা যাক। যদি বিমানগুলোর জ্বালানি ফুরিয়ে যেত এবং বাধ্য হয়ে বৈমানিকরা সাগরের বুকে নেমে আসত তাহলে তাদের মারা যাওয়ার কথা নয়। কারণ বিমানে রাবারের বোট ছিল। ওই বোট নামিয়ে সাগরে ভেসে পড়তে পারত তারা। জ্বালানি ফুরানর ব্যাপারটা কিন্তু এখানে ধর্তব্যের ভেতর আসে না। কারণ তাহলে বিপদ সংকেত ঘোষণা করার সময় তা বৈমানিকেরা জানাত।

আর উদ্ধারকারী মেরিনার তো জ্বালানি ফুরাবার প্রশ্নই আসে না।

কারণ চব্বিশ ঘন্টা ওড়ার মত জ্বালানি নিয়ে আকাশে উঠেছিল মেরিনার, অথচ চব্বিশ ঘন্টার বহু আগেই গায়েব হয়ে যায় ওটা।

কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে প্রচণ্ড হাওয়ার ধাক্কায় গতিপথ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল পাঁচখানা অ্যাভেঞ্জার বিমান। তা যদি হত তাহলে দক্ষিণে অনেকদূর চলে যেত বিমানগুলো। ওদিকটায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত অনেকগুলো ছোট ছোট দ্বীপ আছে। আর আছে গ্রেট বাহামা ব্যাংক নামে বিশাল এক অগভীর জলাভূমি। ওই সব দ্বীপের কোনটায় বা জলাভূমিতে বিমানগুলো গিয়ে পড়লে তাদের কোন না কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যেতই।

একটার সাথে আরেকটা বিমানের ধাক্কা লাগার সম্ভাবনাটা একেবারেই বাদ দেয়া যায়। কারণ তাহলে বিমানগুলোর ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পাওয়া যেত। বিশাল সব জলস্তম্ভ অনেক সময় বিমানের নাগাল পাওয়ার মত উঁচু হয়। কিন্তু সেদিন সে-রকম কোন জলস্তম্ভের খবর পাওয়া যায়নি, তাছাড়া ওই সব জলস্তম্ভ সহজেই এড়িয়ে যেতে পারে বিমান। আর সাগরে অতবড় জলস্তম্ভ উঠলে সাগরে ভাসমান কোন না কোন জাহাজ থেকে তা দেখা যেতই।

অ্যাভেঞ্জার বিমানগুলোর শেষ সংকেত যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে গিয়ে মেরিনারও হারিয়ে গেল কেন? সাগরে ভাসমান একটা জাহাজের ক্যাপ্টেন পরে জানিয়েছিলেন, সেদিন সন্ধ্যা সাতটা পঞ্চাশ মিনিটে ওদিককার আকাশে একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটতে দেখেছিলেন তিনি এবং পরে ওই এলাকার সাগরের পানিতে ছড়ানো তেলও চোখে পড়ে তাঁর। কিন্তু হিসেব করে দেখা গেল মেরিনার নিখোঁজ হবার আড়াই থেকে তিন ঘন্টা পরে আকাশে বিস্ফোরণ দেখেছিলেন জাহাজের ক্যাপ্টেন।

আসলে উপরোক্ত অনুমানের কোনটাই বিশ্বাসযোগ্য নয়। কারণ এসব অনুমানের ওপর নির্ভর করলে অনেকগুলো প্রশ্নেরই কোন উত্তর

পাওয়া যাবে না। যেমন পাঁচটা বিমানেরই কম্পাস একসাথে বিকল হল কি করে? বেতার যন্ত্রগুলো শক্তি হারাল কি করে? অ্যাভেঞ্জারগুলো যেখান থেকে নিখোঁজ হয়েছিল মেরিনারটাও কি আসলে সেখান থেকেই নিখোঁজ হয়েছিল? সাগরকে চেনা যাচ্ছিল না কেন? সূর্য দেখা যাচ্ছিল না কেন?

এসব প্রশ্নের উত্তর পাবার আশায় তদন্ত শুরু করল আমেরিকান ন্যাভাল বোর্ড অফ এনকয়েরি। কয়েকমাস একটানা তদন্তের পর চারশো পৃষ্ঠা জুড়ে তাদের রিপোর্ট বেরোল। সেসব রিপোর্ট সংগ্রহ করলেন কুসচে। রিপোর্টের সমস্ত কথা নিজের মত করে সাজিয়ে নিয়ে বিমানগুলো হারানর কারণ বের করার চেষ্টা করলেন তিনি।

টেলর প্রেরিত রেডিও মেসেজ যখন ক্ষীণ হয়ে আসছে তখন কন্ট্রোলটাওয়ার থেকে তাঁকে ইমারজেন্সি চ্যানেলে মেসেজ পাঠাতে অনুরোধ করা হলে রাজি হননি টেলর। অন্য চ্যানেলে মেসেজ পাঠাতে আপত্তি ছিল তাঁর। তিনি হয়ত ভেবেছিলেন অন্য চ্যানেলে মেসেজ পাঠালে সঙ্গী প্লেনের লোকেরা সে মেসেজের কারণ বুঝতে না পেরে আতঙ্কিত হয়ে পড়বে। তাতে করে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং বিপদের আশঙ্কাও বেড়ে যাবে।

দক্ষ এবং অভিজ্ঞ পাইলট হলেও ফ্লোরিডার ওই অঞ্চলে টেলর নতুন। পথ ভুল করে বাহামার কাছাকাছি চলে গিয়ে বোধ হয় ভেবেছিলেন তিনি, ফ্লোরিডার একেবারে দক্ষিণে সমুদ্রের কাছে চলে এসেছেন। আটলান্টিক না গালফ অফ মেকসিকোর ওপর আছেন এটাও বুঝতে পারছিলেন না টেলর। এবং এই বুঝতে না পারার দরুনই আসলে দিক ভুল করে ক্রমশ উত্তরে সরে যাচ্ছিলেন তাঁরা। জ্বালানি না ফুরানো পর্যন্ত আকাশে উড়ে বেড়ায় প্লেনগুলো, তারপর বাহামার উত্তরে আটলান্টিকের কোথাও পড়ে গিয়ে ডুবে যায়।

সেদিন একটা ক্ষীণ সাংকেতিক শব্দ (এফ টি) দু'বার শুনতে পায়

প্যাট্রিক এয়ার বেসের কন্ট্রোল টাওয়ারের রেডিওম্যান। টেলরের প্লেনের নম্বরও ছিল এফটি ২৮। কিন্তু যে সময়ে সাংকেতিক শব্দটা দু'বার শোনা গিয়েছিল তার অনেক আগেই পাঁচটা আভেঞ্জার প্লেনের পেট্রল ফুরিয়ে যাবার কথা।

মার্টিন মেরিনারটার নিখোঁজ হয়ে যাওয়াটা সত্যিই বিস্ময়কর। যেন বিমানটার জন্যে তৈরি হয়ে বসে ছিল কেউ আকাশের ওইখানটায়। মেরিনারটা ওখানে পৌঁছানো মাত্র গিলে নিয়েছে টপ করে। মেরিনার থেকে শেষ মেসেজ পাঠানর প্রায় তিন ঘণ্টা পর আকাশে বিস্ফোরণ ঘটতে দেখেন একটা জাহাজের ক্যাপ্টেন। সুতরাং মেরিনারের সাথে বিস্ফোরণের কোন যোগাযোগ থাকার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

আসলে বিকেলে নয়, সন্ধ্যা সাতটা সাতাশ মিনিটে আকাশে উঠেছিল মেরিনার এবং তেইশ মিনিট পর সাতটা পঞ্চাশ মিনিটে বিস্ফোরিত হয় ওটা, ওটা কুসচের মন্তব্য। আকাশের অবস্থা খারাপ ছিল তখন। অতএব ঝড়ের দাপটে পড়ে কোনরকমে আগুন ধরে গিয়ে ধ্বংস হয়ে যায় বিমানটা।

'ফ্লাইং গ্যাস ট্যাংক' নামে কেউ কেউ অভিহিত করেছে মেরিনারকে। এ নামকরণের কারণ জানতে চাইলে উত্তর দিয়েছে ওরা, মানুষের শরীরের ক্ষতি হয় না এমন কোন দাহ্য গ্যাস ছিল বিমানের ভেতরের বাতাসে। অন্যমনস্ক ভাবে হয়ত বিমানের ভেতরেই সিগারেট ধরিয়ে ফেলেছিল কেউ, নয়ত কোন প্রকারের ইলেকট্রিক স্পার্কিং ঘটেছিল মেরিনারের ভেতর, যার ফলে দাহ্য গ্যাসে আগুন ধরে গিয়ে সাথে সাথেই বিস্ফোরিত হয়ে যায় বিমানটি।

কিন্তু কথা হল একেবারে সময় বেছে বেছে ওই সময়েই বিমানের ভেতর সিগারেট ধরাতে যাবে কেন লোকে, বা ইলেকট্রিক স্পার্কিং ঘটতে যাবে কেন? বিমানের ভেতর ওই ধরনের দাহ্য গ্যাসই বা

আসবে কোত্থেকে? অনেকগুলো কেন এসে যাচ্ছে না ব্যাপারটায়? অতএব এই বিদঘুটে সন্দেহটা একেবারেই বাদ দেয়া যায়।

কেউ কেউ আবার প্রশ্ন করল ঝড়ের কবলেই যদি পড়ে থাকে মার্টিন মেরিনার তাহলে সে এস. ও. এস. পাঠাল না কেন? উত্তর দেয়া হয় আকাশের শীতল স্তরে পৌঁছবার ফলে বিমানের রেডিও অ্যান্টেনায় বরফ জমে গিয়ে রেডিওর কাজে বাধার সৃষ্টি করেছিল।

চোদ্দ দিন ধরে তদন্ত চালিয়ে মোট ছাপ্পান্নটি বক্তব্য সংগ্রহ করেছিল বোর্ড অফ এনকয়েরি। প্রত্যেকটি ঘটনাকে আবার বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের সাক্ষ্য সহ ক্রমিক নম্বর দিয়ে সাজানো হয়েছিল। সেই তালিকার ৩৭ নং বক্তব্য অনুসারে সন্ধ্যা সাতটা চার মিনিটে ফ্লোরিডা উপদ্বীপের পুবের সমুদ্রে নামতে বাধ্য হয় উনিশ নম্বর ফ্লাইটের পাঁচটা বিমান। অথচ ৩৮ নং বক্তব্যে বলা হয়েছে তখন ভয়ঙ্কর বিক্ষুব্ধ ছিল সাগর এবং বিমান অবতরণের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিল।

অনুসন্ধানে আরও একটা কথা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। সেদিন সকাল থেকেই নাকি উনিশ নম্বর ফ্লাইটের দলনেতা লেফটেন্যান্ট টেলরের শরীর ভাল ছিল না। কেউ কেউ বলে তিনি নাকি সেদিন অতিরিক্ত মদ খেয়ে ফেলেছিলেন। আকাশে ওঠার আগে নাকি সেদিনের ফ্লাইট থেকে তাঁকে বাদ দেয়ার জন্যে কর্তৃপক্ষের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। ফোর্ট লডারডেল ন্যাভাল এয়ার স্টেশনের অ্যাভিয়েশন ট্রেনিং অফিসার লেফটেন্যান্ট আর্থার এ কার্টিসকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি এইরকম বিবৃতি দিয়েছেনঃ

প্রশ্নঃ উনিশ নম্বর ফ্লাইটের পাইলটদের ব্যবহারে আপনি সেদিন অমনোযোগিতা বা এ ধরনের অন্য কিছু খেয়াল করেছেন কি?

উত্তরঃ তেমন কিছু না, তবে সেদিন ছুটি চেয়েছিলেন টেলর, কিন্তু কেন ছুটি দরকার, কোন কারণ উল্লেখ করেননি।

প্রশ্নঃ ঠিক ক'টায় আপনার কাছে ছুটি চেয়েছিলেন টেলর?

উত্তরঃ যদ্দূর মনে পড়ছে বেলা একটা বেজে পনেরো।

প্রশ্নঃ টেলরের অনুরোধের জবাবে কি বলেছিলেন আপনি?

উত্তরঃ বলেছিলাম, সে-ফ্লাইটের জন্যে অন্তত ছুটি দেয়া যাবে না তাকে।

প্রশ্নঃ সে সময় থেকে বিমানে ওঠা পর্যন্ত টেলরের ব্যবহারে কোন অস্বাভাবিকতা প্রকাশ পেয়েছিল কি? খেয়াল করেছিলেন আপনি?'

উত্তরঃ না, কোনরকম অস্বাভাবিকতা প্রকাশ পায়নি।

প্রশ্নঃ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক মনে হয়েছিল তাকে?

উত্তরঃ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

কিন্তু কুসচে বলেন, ভুল করেছিলেন কার্টিস, টেলরকে আরও কিছু প্রশ্ন করা উচিত ছিল তাঁর। যেমন, কেন তিনি উড়তে চাইছেন না? শরীর খারাপ? মন? না অন্য কোনরকম অসুবিধে?

বোর্ড অফ এনকয়েরির মতে, টেলরের ব্যবহারে কোন রকম অস্বাভাবিকতা লক্ষ করেননি কার্টিস, কাজেই ও ধরনের প্রশ্ন করার কথা মনেই আসেনি তাঁর।

কেন হারিয়ে গেল বিমানগুলো এ ব্যাপারে বোর্ড অফ এনকয়েরির মত চাওয়া হলে তারা সঠিক কোন উত্তর দিতে পারেনি, তবে এটুকু বলেছে, আবহাওয়া হঠাৎ অস্বাভাবিক পরিবর্তনে ভড়কে গিয়েছিলেন টেলর, তাই হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন তিনি।

আসলে বোর্ড অফ এনকয়েরির এটা একটা দায়সারা গোছের জবাব। কারণ টেলর হাল ছেড়ে না দিয়ে করবেনই বা কি? কম্পাস দিক নির্ণয় করছে না, রেডিও মেসেজ পাঠাচ্ছে না, তার ওপর ভীষণ খারাপ আবহাওয়া। দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে দিনের আলো, সবচে বড় কথা ওই অঞ্চলে টেলর নতুন। সঙ্গের অন্য কোন বিমানের পাইলট যদি টেলরের ভুল টের পেয়েও থাকে তাহলেও বাধা দিতে পারছিল না, কারণ মিলিটারি আইনে দলপতির নির্দেশই শেষ কথা। তার ওপর

কোন মন্তব্য করা চলবে না।

যখন প্রথম বিপদ সংকেত পাঠান টেলর তখন বাহামার উত্তরে নির্ধারিত পথেই উড়ছিলেন তাঁরা অথচ মনে করেছিলেন হারিয়ে গেছেন।

ফ্লাইট নাইনটিনের নিরুদ্দেশের ব্যাপারে এডওয়ার্ড কস্টেন একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ন্যাভাল ইনফরমেশন অফিসের সাথে এককালে দহরম মহরম ছিল কস্টেনের। তাঁর মতে ব্যাপারটায় অলৌকিকতার কিচ্ছু নেই, আসলে ওটা একটা দুর্ঘটনা মাত্র। কস্টেন বলেছেন একটা ব্যাপার কেউই লক্ষ করেনি। অথচ সেটাই লক্ষ্যণীয় ছিল।

প্রথমে একশো ষাট মাইল পুবে গিয়ে উত্তরে ঘুরে চল্লিশ মাইল গিয়ে এয়ারবেসে ফিরে আসার কথা ছিল প্লেনগুলোর। কিন্তু উত্তরে চল্লিশ মাইলেরও অনেক বেশি দূরে চলে গিয়েছিল ওগুলো। কেন? গিয়েছিল ফ্লাইট টাইম বাড়াবার জন্যে। প্রতি মাসেই কোন ন্যাভাল পাইলট আকাশে অন্তত ছ'ঘণ্টা বেশি থাকতে পারলে একটা ফ্লাইট বোনাস পায়। নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে বেশিক্ষণ থাকার জন্যে কৈফিয়ত চাওয়া হলে অ্যাভেঞ্জারের পাইলটরা জবাব দিয়ে দিত আবহাওয়া হঠাৎ খারাপ হয়ে যাওয়ার দরুন দেরি হয়ে গেছে। এ উত্তরে কারও কিছু বলার থাকত না। কারণ নিচে থেকে আকাশের কোথায় কখন কি ঘটছে তা বিস্তারিত ভাবে জানা সম্ভব নয়। আসলে ওই ফ্লাইট বোনাসের লোভেই সেদিন প্রাণ দিয়েছিল চোদ্দজন আকাশচারী।

সকাল থেকেই সেদিন গালফ অফ মেক্সিকোর ওপরে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ জমতে শুরু করেছিল। তারপর জমে যাওয়া মেঘ চাপ বেঁধে এক সময় পুব দিকে সরে যেতে থাকে। মিয়ামি ওয়েদার ব্যুরোর খাতায় লেখা আছে, পরে আটলান্টিকের বেশ কিছু অংশে ছড়িয়ে পড়ে সেই মেঘ। প্রবল ঝড়ো হাওয়া বইতে শুরু করে, সেই সাথে ঘন ঘন বিদ্যুতের চমক।

নির্ধারিত পথ থেকে দূরে সরে গিয়ে সেই ঘন মেঘের ভেতরে ঢুকে পড়ে বিমানগুলো। বৈমানিকেরা ভেবেছিল পশ্চিমে যাচ্ছে, কিন্তু আসলে যাচ্ছিল উত্তরে। এভাবে নিজেরাই হিসেবে ভুল করে কম্পাসের দোষ দেয়, বলে কম্পাস বিগড়ে গেছে। জমাট মেঘের ভেতর ঢুকে পড়ে সাগর বা মাটি কিছুই দেখা সম্ভব ছিল না বৈমানিকদের পক্ষে। এই সময়েই কোন কারণে তাদের রেডিও বিগড়ে গিয়ে মাটির সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বায়ুস্তরে কোন প্রাকৃতিক কারণে রেডিও বিগড়ালে আশেপাশের সবকটাই এক সাথে বিগড়াবে, এ ক্ষেত্রে হয়েছিল তাই। ওদিকে দ্রুত জ্বালানি ফুরিয়ে আসছে। শেষ পর্যন্ত বোধহয় নিজেদের অবস্থান বুঝতে পেরেছিল ওরা, কিন্তু তখন আর ফোর্ট লডারডেলে ফিরে যাবার মত জ্বালানি অবশিষ্ট ছিল না। ওদের সবচে কাছে ছিল ব্যানানা রিভার এয়ার বেস, কাজেই সেখানেই নামা স্থির করেছিল বৈমানিকেরা।

ব্যানানা রিভার আসলে নদী নয়, বিশাল এক লেগুন। এর আশেপাশে ছড়িয়ে আছে কয়েকটা বড় বড় জলাভূমি। মেঘ বা ঘন কুয়াশার জন্যে তখন নিচের কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না বৈমানিকেরা, তাই ব্যানানা রিভার এয়ারবেস মনে করে ওই সব জলাভূমিরই কোনটাতে হয়ত নেমে পড়ে লীডার প্লেন, তার পিছু পিছু বাকিগুলো।

অত্যন্ত গভীর ওই জলাভূমিগুলোর স্থানে স্থানে চোরাকাদা আছে। আর আছে জলজ উদ্ভিদ, কুমির ও ভয়াবহ বিষাক্ত সাপ। ওসব জলাভূমিতে একবার পড়ে গেলে আর রক্ষা পাওয়ার কোন উপায়ই নেই।

জলাভূমিতেই পড়েছিল প্লেনগুলো তা অনুমান করার কারণ আছে। প্লেনগুলো হারিয়েছিল ৫ ডিসেম্বর। আর ৮ ডিসেম্বর রাত দুটোয় লডারডেলের উত্তরে চলেছিল ইস্টার্ন এয়ারলাইন্সের একটি যাত্রীবাহী প্লেন। সেদিন ফ্লোরিডার মেলবোর্ন শহর থেকে দশ মাইল পশ্চিমের

একটা জলাভূমির মাঝখানে আলো এবং আলোর সংকেত দেখতে পায় ওই প্লেনের পাইলট জে ডি মরিসন। আলোর কাছে মানুষও নাকি দেখতে পেয়েছিল সে।

ব্যাপারটা ব্যানানা রিভার ন্যাভাল এয়ার স্টেশনে জানিয়ে দেয় মরিসন। সাথে সাথেই কারণ অনুসন্ধানের জন্যে একটা প্লেন পাঠানো হয় এয়ার বেস থেকে। এয়ার বেসের পাইলট ফিরে গিয়ে রিপোর্ট করে ঠিকই দেখেছে মরিসন তবে এত রাতে করার কিছু নেই।

ভোর হতেই আবার বিমান পাঠাল এয়ার বেস। কিন্তু ঘন কুয়াশার জন্যে কিছুই দেখা গেল না। জলাভূমিতে চলাচলের উপযোগী এক ধরনের যান পাঠানো হল। কিন্তু নির্দিষ্ট জায়গায় পৌছে কিছুই দেখতে পেল না যানের লোকেরা।

এর বহুদিন পর, ১৯৬২ সালের জানুয়ারি মাসে দ্য সার্চার নামে একটা আমেরিকান পত্রিকার জনৈক প্রবন্ধ লেখক ওই পত্রিকাতেই একটি লেখা পাঠান। তাতে লেখক উল্লেখ করেন, নেদারল্যান্ডের একটি প্রতিষ্ঠান নাকি ব্যানানা রিভারে ড্রেজিং করতে গিয়ে কিছু মানুষের হাড় খুঁজে পেয়েছে।

অনেকেই অনুমান করেছে ওই হাড় হারিয়ে যাওয়া অ্যাভেঞ্জার বিমানের যাত্রীদের, কিন্তু পরীক্ষা করে দেখার মত যথেষ্ট হাড় না পাওয়ায় সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

শীতকালে উত্তর গোলার্ধে প্রবল হতে শুরু করে পশ্চিমা বাতাস। এ কথাটা উল্লেখ করে ইউ এস নেভির ক্যাপ্টেন হামফ্রে মন্তব্য করেন, প্রবল পশ্চিমা বাতাস পশ্চিম সমুদ্রের দিকে বহুদূর পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে গিয়েছিল অ্যাভেঞ্জার বিমানগুলোকে। ওই জায়গা থেকে নিরাপদ জায়গায় ফিরে আসার মত যথেষ্ট জ্বালানি না থাকায় সাগরে পড়ে ডুবে গিয়েছে বিমানগুলো।

তিনি আরও বলেন, তখন পর্যন্ত বর্তমানের মত এত উন্নতি হয়নি

রেডিওর। তাই বহু দূর থেকে অ্যাভেঞ্জার প্লেনগুলোর পাঠানো রেডিও মেসেজ ধরা পড়েনি টাওয়ারের বা উপকূলের অন্য কোন রেডিওতে।

আর একটা সম্ভাবনার কথাও বলেন কেউ। ঝড়ের দাপটে সাগরের দিকে না গিয়ে আসলে ফ্লোরিডার ওপরেই চলে এসেছিল বিমানগুলো। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, বিমানগুলোকে দেখতে পেল না কেন কেউ? সাথে সাথে উত্তর দেয় অনুমানকারীরা, দেখতে অনেকেই পেয়েছে বিমানগুলোকে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে সে সময় আকাশে উড়ন্ত অনেক বিমানের ভেতর অ্যাভেঞ্জারগুলোকে বিপদগ্রস্ত বলে বুঝতে পারেনি তারা।

এমনিতরো হাজারও লোকের হাজারও রকমের সম্ভব, অসম্ভব সমস্ত অনুমানকে গভীরভাবে ভেবেছেন কুসচে। খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন আসল রহস্য। প্রচুর লেখালেখি করেছেন এখানে ওখানে। শেষ পর্যন্ত টেলরের মানসিক পরিস্থিতি আর কস্টেনের যুক্তিটাই মনে ধরল তাঁর। কিন্তু আর একটু গভীরভাবে খুঁজতে গিয়ে ও দুটোতেও যথেষ্ট ভুল ভ্রান্তি লক্ষ করলেন তিনি। অতয়েব দায়সারা গোছের কোন মন্তব্য করার চাইতে অ্যাভেঞ্জার প্লেনগুলোর রহস্যজনক নিরুদ্দেশের ব্যাপারে নীরব থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করলেন ডেভিড কুসচে।

DC-3 বিমানের কথায় ফিরে আসা যাক। কোথায় নিরুদ্দেশ হল বিমানখানি সে-রহস্য উদঘাটনে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন কুসচে। সিভিল এরোনটিকস বোর্ডের অ্যাকসিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট খুঁজে বের করলেন তিনি।

১৯৪৮ সালের ২৭ ডিসেম্বর রাত দশটা তিন মিনিটে পুয়েরটোরিকোর স্যান জুয়ানের আইলা গ্র্যান্ড এয়ারপোর্ট থেকে মিয়ামির উদ্দেশে রওনা দেয় ওই DC-3 বিমানখানি। টেকঅফ করার এগারো মিনিট পর এয়ারপোর্ট কন্ট্রোল টাওয়ারে মেসেজ পাঠায়

বিমান। কন্ট্রোল টাওয়ার সে মেসেজ ধরতে পারেনি। কিন্তু স্যান জুয়ানের C A O কমিউনিকেশন ঠিকই ধরেছিল মেসেজ। মেসেজের মূল কথা মিয়ামির দিকে যাচ্ছে DC-3।

ওই একবারই DC-3-এর মেসেজে ধরতে পেরেছিল C A O, কিন্তু তারপর বহু চেষ্টা করেও আর বিমানের সাথে যোগাযোগ করতে পারেনি। ওদিকে রাত এগারোটা তেইশ মিনিটে DC-3 বিমানখানির কাছ থেকে একটা মেসেজ পায় মিয়ামির ওভারসিজ ফরেন এয়ার রুটের ট্রাফিক কন্ট্রোল সেন্টার। মেসেজে বলা হয়েছে সাড়ে আট হাজার ফুট ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে DC-3, সাউথ কাইকসে পৌছবে রাত ১২টা ৩৩ মিনিটে এবং ভোর ৪টা ৫ মিনিট নাগাদ এসে পৌছবে মিয়ামিতে।

একই বিমান থেকে ভোর ৪টা ১৩ মিনিটে অন্য আরেকটি মেসেজ ধরেছিল নিউ অরলিয়নস ওভারসিজ ফরেন এয়ার রুট ট্রাফিক কন্ট্রোল সেন্টার, মিয়ামি থেকে তখন পঞ্চাশ মাইল দূরে ছিল বিমানখানা। সেটাই ওই DC-3 বিমানের পাঠানো শেষ রেডিও মেসেজ। এরপর থেকে এবং আগেও বিমানখানির সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয় স্যান জুয়ান এবং মিয়ামি টাওয়ার।

পরদিন আটটা তিরিশ মিনিটে DC-3 Flight No NC 16002-এর অনুপস্থিতির খবর জানানো হয় সিভিল এরোনটিকস বোর্ডকে। বিমানখানা সত্যিই হারিয়ে গেছে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে ইউ এস কোস্ট গার্ডকে খবর দিল এরোনটিকস বোর্ড। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল অনুসন্ধান।

অনুসন্ধান করে জানা গেল, ২৭ ডিসেম্বর সন্ধ্যা সাতটা চল্লিশ মিনিটে স্যান জুয়ানের এয়ারপোর্টে ল্যাণ্ড করেছিল DC-3 বিমানখানি। সে সময়ই গণ্ডগোল দেখা দিয়েছিল ওটার ল্যাণ্ডিং গিয়ারে। শেষ পর্যন্ত কোনরকমে এয়ারপোর্টে বিমান ল্যান্ড করানর পর

সেটাকে মেরামত করানর জন্যে টেকনিশিয়ান ডাকা হল। তারা দেখল পানির লেবেল নেমে গেছে, কাজ করছে না ব্যাটারি। ব্যাটারি রি-চার্জ করে নিতে কয়েক ঘণ্টা সময় লেগে যাবে। কিন্তু সময় নষ্ট করতে রাজি হলেন না বিমানের ক্যাপ্টেন, ব্যাটারিতে শুধু পানি ভরে তা বিমানে তুলে দেবার নির্দেশ দিলেন টেকনিশিয়ানকে। ক্যাপ্টেনের কথানুযায়ী কাজ করে দিল টেকনিশিয়ান। যথাস্থানে ব্যাটারি লাগাবার পরও কিন্তু ল্যান্ডিং গিয়ার সংক্রান্ত আলো জ্বলেনি।

সেদিন রাত আটটা ত্রিশে স্যান জুয়ান থেকে মিয়ামি যাবার ফ্লাইট প্ল্যান চাইল বিমানের ক্রুরা। ওদেরকে ফ্লাইট প্ল্যান বোঝাতে বোঝাতে ক্যাপ্টেন জানালেন বিমানে আর কোন গণ্ডগোল নেই। কিন্তু ঘণ্টাখানেক পরই গণ্ডগোল শুরু করল ব্যাটারি। অতএব বিমান ছাড়ার সময় আরও ঘণ্টাখানেক পিছিয়ে গেল এবং বাতিল হয়ে গেল পূর্ববর্তী ফ্লাইট প্ল্যান।

বিশেষভাবে খোঁজ নিয়ে কুসচে জেনেছেন রাত সোয়া নটার দিকে স্যান জুয়ান থেকে শেষ পর্যন্ত ছেড়েছিল বিমান। বিমান ছাড়ার সময় সম্পর্কে কিন্তু যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ টাওয়ারের রিপোর্ট অনুযায়ী বিমানখানার ছাড়ার সময় দশটা ত্রিশ মিনিট। সময়ের এতটা ব্যবধান ঘটল কি করে?

ছাড়বার আগে পুয়েরটোরিকান ট্র্যান্সপোর্টেশন অথরিটিকে বিমানের ক্রুরা জানিয়েছিল, ঠিকমতই কাজ করছে বিমানের রিসিভার কিন্তু ব্যাটারি দুর্বলতার জন্যে ট্র্যান্সমিটার কাজ করছে না। বিমানের ক্রু এবং কন্ট্রোল টাওয়ারের সঙ্গে পরামর্শ করে তখন বিমান ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন চীফ অফ এভিয়েশন। কিন্তু শর্ত ছিল যতক্ষণ পর্যন্ত না ঠিকমত কাজ করছে ব্যাটারি, স্যান জুয়ানের কাছাকাছিই উড়বে বিমান।

আর একটা মারাত্মক ভুল আছে রিপোর্টে। রিপোর্টের প্রথমে লেখা

আছে ১০টা ত্রিশে ছেড়েছে বিমান, একটু পরেই লেখা আছে ১১টা ত্রিশ। এভাবে সময়ের হেরফের হল কেন? নাকি লিখতে ভুল করেছিল রিপোর্ট লেখক?'

স্যান জুয়ান এয়ারপোর্ট থেকে আকাশে ওঠার এগারো মিনিট পর C A O কমিউনিকেশনকে DC-3 বিমান থেকে জানানো হল, স্যান জুয়ানের সাথে যোগাযোগ করতে পারছে না তারা, সুতরাং আবার ফ্লাইট প্ল্যান বদলাতে হচ্ছে তাদের। ওটাই C A O-এর সাথে DC-3-এর শেষ যোগাযোগ। ওদিকে স্যানজুয়ান টাওয়ার জানতে পারছে না কোন্ দিকে যাচ্ছে DC-3। তবে আশার কথা, স্যান জুয়ান টু মিয়ামি এয়ার রুট ভালমতই চেনা ক্যাপ্টেন লিনকুইস্টের। যদিও কো-পাইলট থেকে ক্যাপ্টেন পদে এই তার প্রথম যাত্রা।

এখন কথা হল কি করে নিখোঁজ হল বিমানখানি? স্যান জুয়ান থেকে ছাড়ার সময় শুধু ব্যাটারির দোষ ছাড়া আর কোন দোষ ছিল না বিমানে এবং অন্য যেসব যন্ত্রে গোলমাল ঘটছিল তা ব্যাটারির দোষেই ঘটছিল। হয়ত স্যান জুয়ান থেকে ছাড়ার পর ব্যাটারির দোষও কিছুটা সেরে যায়, কারণ বিভিন্ন জায়গার সাথে মোট তিনবার রেডিও যোগাযোগ করতে পেরেছিল DC-3.

হয়ত আর একটা মারাত্মক ব্যাপার ঘটেছিল, স্যান জুয়ান ছাড়ার পর সম্পূর্ণ বিকল হয়ে যায় বিমানের অটোমেটিক কম্পাস। এ অবস্থায় সহজেই দিক ভুল হবার সম্ভাবনা আছে। শেষ রেডিও মেসেজ পাঠাবার পর থেকে হিসেব করলে দেখা যায় আর মাত্র আশি মিনিট চলার মত জ্বালানি অবশিষ্ট থাকে DC-3 বিমানে। অকেজো বেতার এবং কম্পাস নিয়ে মাত্র আশি মিনিটে ঠিক জায়গায় পৌঁছাতে না পারলে দোষ দেয়া যায় না বিমানের ক্যাপ্টেনকে।

মিয়ামির আবহাওয়া অফিসে খবর নিয়ে জানা গেছে DC-3-এর তখনকার ওড়ার পথে বাতাসের গতিপথ মাঝ রাতের পর হঠাৎ উত্তর

পশ্চিম থেকে উত্তর পুবে ঘুরে যায়, এতে সহজেই সঠিক পথ থেকে সরে যেতে পারে বিমান।

আসলে দুর্ঘটনার সম্ভাব্য কোন কারণই খুঁজে বের করতে পারেনি বোর্ড অফ এনকয়েরি। শুধু অনুমানের ওপর নির্ভর করেই যা খুশি বলে যাচ্ছিল তারা। কিন্তু সহজে হাল ছেড়ে দেবার পাত্র নয় কুসচে। একেবারে বিমানের জন্ম রহস্য খুঁজতে শুরু করলেন তিনি।

১৯৩৬ সালের ১২ জুন কারখানা থেকে বেরিয়েছিল ওই DC-3 বিমানখানি। সেদিন থেকে হারানর দিন পর্যন্ত বারো বছরে মোট ২৮,২৫৭ ঘণ্টা উড়েছে বিমানখানি, ওই জাতীয় বিমানের জন্যে খুব বেশি কিছু নয়।

ক্যাপ্টেন লিনকুইস্টও অনভিজ্ঞ পাইলট নন! রীতিমত পাস করা সার্টিফেকেটধারী পাইলট তিনি। আটাশ বৎসর বয়স্ক ওই পাইলট অসংখ্যবার যাত্রাও করেছেন স্যান জুয়ান টু মিয়ামি এয়ার রুটে। নিখোঁজ হয়ে যাবার দিন পর্যন্ত মোট তিন হাজার দুশো পঁয়ষট্টি ঘণ্টা ওড়ার অভিজ্ঞতা ছিল তাঁর।

আসলে কি ঘটেছিল DC-3 Flight NO NC 16002-এর? এটা খুঁজতে গিয়ে বহু ভুল তথ্যের সম্মুখীন হয়েছেন কুসচে। এসব ভুল তথ্যের জন্যেই আসলে বিমানখানির অন্তর্ধান রহস্য আরও জমাট বেঁধে উঠেছে।

এনকয়েরি কমিশনের রিপোর্ট থেকে জানা যায় ব্যাটারি খারাপ থাকায় গোড়ার দিকে কাজ করছিল না ট্রান্সমিশন সিস্টেম, কিন্তু এই সমস্যা পরেও তো ছিল? অথচ এরই মাঝে তিন তিনবার মেসেজ পাঠাতেও সক্ষম হয়েছিল বিমানের রেডিও অপারেটর। বোধহয় শেষবারের মেসেজ পাঠাবার পর ব্যাটারির অভাবে সম্পূর্ণরূপে বাতিল হয়ে যায় রেডিও। ব্যাটারি খারাপ হয়ে গিয়ে অকেজো হয়ে যায় বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা, নিভে যায় বিমানের সমস্ত বাতি। বন্ধ হয়ে যায়

ব্যাটারির ওপর নির্ভরশিল কলকজা। একে অন্ধকার, তার ওপর প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি কাজ না করায় বাতাসের দিক পরিবর্তনের কথা টের পায়নি পাইলট। ক্রমশ যাত্রাপথ থেকে বহুদূরে গালফ অফ মেক্সিকোর কাছে সরে যায় বিমান।

মিয়ামির আলো দেখতে পেয়েছে পাইলট, এমন কথা এনকয়েরি কমিশন বা কোন বিশিষ্ট পত্রিকার কোথাও খুঁজে পাননি কুসচে। তাঁর মতে ওটা কোন কাহিনীকারের কল্পিত উক্তি, আসলে রহস্য জমাবার জন্যেই ওই উক্তি করেছিল কাহিনীকার। মনে মনে কল্পনা করে নিয়েছিল কাহিনীকার, মিয়ামির পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণে উড়ছে লিনকুইস্টের প্লেন। কিন্তু পঞ্চাশ মাইলের কথা বললেও ঠিক কোন্ দিকে উড়ছিল তা জানাননি লিনকুইস্ট।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কথার উল্লেখ করেছেন কুসচে। DC-3-এর সাথে একবারও যোগাযোগই হয়নি মিয়ামি কন্ট্রোল টাওয়ারের। রাত এগারোটা তেইশ মিনেটে মিয়ামির সাথে DC-3-র রেডিও যোগাযোগের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু আসলে DC-3-র রেডিও তখন যোগাযোগ ঘটেছিল নিউ অরলিয়ন্‌স টাওয়ারের সাথে, মিয়ামি নয়। ডিস্ট্রিক্ট কোস্ট গার্ড হেড কোয়ার্টারকে নাকি পরে খবরটা জানিয়েছিল নিউ অরলিনস টাওয়ার।

কুসচের শেষ কথা, পুরোপুরি অকেজো হয়ে গিয়েছিল DC-3 Flight NO. NC 16002-এর ব্যাটারির ফলে নষ্ট হয়ে যায় বিমানের রেডিও আর অন্যান্য প্রয়োজনীয় কলকজা। বাইরের পৃথিবীর সাথে যোগাযোগের ব্যবস্থা নেই, কম্পাস নেই, কম্পাস বিকল, বাতাসের হঠাৎ গতি পরিবর্তন, এতগুলো দুর্যোগ একটা বিমান ধ্বংসের পক্ষে যথেষ্ট। যতক্ষণ জ্বালানি ছিল ততক্ষণ বিপথে ঘুরে বেড়িয়ে এক সময় সাগরে পড়ে যায় DC-3, আর পড়ে গিয়ে একেবারে গালফ স্ট্রীমের ওপর। সারাক্ষণ উত্তরে বয়ে যাচ্ছে গালফ স্ট্রীমের দুরন্ত স্রোত।

সেই স্রোতের কবলে পড়েঃ উত্তরে সরে যেতে যেতে দ্রুত তলিয়ে যায় বিমানখানি। হয়ত কোন কারণে শক্তভাবে আটকে গিয়েছিল প্লেনের দরজা এবং বেরোতে না পেরে প্লেনের সাথেই নিজেদের ভাগ্য বেঁধে নিয়েছিল ওটার সব কজন যাত্রী। পরদিন বেলা হলে সার্চ পার্টি বেরিয়ে প্লেনটার চিহ্নমাত্রও খুঁজে পায়নি। গালফ স্ট্রীমের মত মারাত্মক জায়গায় তলিয়ে যাওয়া প্লেনের চিহ্ন না পাওয়ার চাইতে পাওয়াটাই বেশি বিস্ময়কর।

স্যান জুয়ানের রিপোর্টে সময়ের হেরফের হওয়ার কারণ সম্পর্কে কুসচের মত, রিপোর্ট লেখকের অমনোযোগিতার ফল।

DC-3 বিমান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলেই মুচকি হেসে জবাব দেন কুসচে, ওটা একটা দুর্ঘটনা মাত্র, রহস্যের নাম গন্ধ নেই তাতে।

ছয়

স্বপ্ন, না সত্যি?

বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের ভেতরে বিপদে পড়ে জাহাজ বা বিমানসুদ্ধ গায়েব হয়ে গেছে লোকে, কিন্তু গায়েব হবার আগেই বেরিয়েও আসতে পেরেছে কেউ কেউ। হয়ত তাদের পুরোপুরি হাতের কাছে পায়নি বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের ফাঁদ অথবা ইচ্ছে করেই মুক্তি দিয়েছে। তেমন কয়েকটি ঘটনাও রয়েছে।

১৯৪৪ সালের শেষ দিকে যুদ্ধের প্রয়োজনে ইটালি পাঠানো হচ্ছিল সাতটা বোমারু বিমান। তাদের একটাতে ছিল ডিক স্টার্ন নামে এক

অভিজ্ঞ পাইলট। বারমুডা থেকে শ'তিনেক মাইল যাবার পরই বাম্প করতে শুরু করল বিমান। বহু চেষ্টা করেও বিমানের ঝাঁকুনি বন্ধ করতে পারল না স্টার্ন, কেন এমন হচ্ছে তাও বুঝতে পারল না। বেশ কিছুক্ষণ একভাবে ঝাঁকুনি খেতে খেতে হঠাৎ নিচে পড়তে শুরু করল বিমান। ওজন শূন্য অবস্থার সৃষ্টি হতেই ছিটকে গিয়ে বিমানের ছাদে ঠুকে গেল ক্রুদের মাথা। সমুদ্র ছুঁই ছুঁই করে আবার আপনা থেকেই আকাশে উঠতে লাগল বিমান। প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেল স্টার্ন। আর সামনে এগোতে সাহস পেল না সে। কোনরকমে বিমানের মুখ ঘুরিয়ে ফিরে এল এয়ারপোর্টে—যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিল সেখানে।

স্টার্নের বিমানের অবস্থায়ই পড়েছিল তার একখানা সঙ্গী প্লেন। সেটাও ফিরে এল স্টার্নের পিছু পিছু। বোধ হয় ফিরে আসায়ই বেঁচে গিয়েছিল ওরা। কারণ তাদের সঙ্গী বাকি পাঁচটা বিমান আর ফিরে আসেনি কোনদিন। কোন খোঁজও পাওয়া যায়নি তাদের।

এই ঘটনার কয়েক বছর পরের কথা। যুদ্ধ তখন শেষ। একটা ব্রিস্টল ব্রিটানিয়া বিমানে করে বারমুডা থেকে ন্যাসো যাচ্ছিল সেই ডিক এবং তার স্ত্রী। তাদের সাথে আরও কয়েকজন আরোহী ছিল সে বিমানে। এবারও বারমুডা থেকে শ'তিনেক মাইল যাবার পর (গতবার বিমান যেখানে ঝাঁকুনি খেতে শুরু করেছিল) ঝাঁকুনি খেতে শুরু করল এই বিমানটাও। বার কয়েক ঝাঁকুনি খেয়েই সহসা নিচে পড়তে শুরু করল বিমান। আরোহীরা তখন খাচ্ছিল, তাদের হাতের ডিশ থেকে শূন্যে লাফিয়ে উঠল সমস্ত খাদ্যদ্রব্য। আরপর যেমনি হঠাৎ করে পড়তে শুরু করেছিল বিমান, তেমনি হঠাৎ করেই আবার ওপরে উঠতে শুরু করল। কয়েক সেকেন্ড পরই আবার পড়তে শুরু করল বিমান, তারপর আবার উঠে গেল। প্রায় মিনিট পনেরো পর্যন্ত এরকম বার বার ওঠানামা করে স্থির হল বিমান এবং নিরাপদে এয়ারপোর্টে ফিরে এল।

এককালের ন্যাভাল পাইলট জিমরিচার্ডশন তখন চকএয়ার ফেরি

সার্ভিসের প্রেসিডেন্ট। মিয়ামির ওপালকা এয়ারপোর্ট থেকে বাহামার বিমিনি এবং আরও কয়েকটা জায়গায় নিয়মিত চলাচল করে ওই এয়ার সার্ভিসের বিমান। বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের বিদঘুটে কাণ্ডকারখানার কথা জানা আছে রিচার্ডসনের, কিন্তু ব্যাপারটা নিয়ে কারও সাথে কখনও আলাপ করে না সে। বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের ভেতর দিয়ে আসার সময় বেশ কয়েকবারই অদ্ভুত সব ব্যাপার লক্ষ্য করেছে রিচার্ডসন।

একবার ছেলেকে নিয়ে ভোর রাতে ফ্লোরিডা থেকে টুর্কস আইল্যান্ডে যাচ্ছিল রিচার্ডসন। হঠাৎ তার চোখের সামনে দিক পরিবর্তন করে বাম থেকে ডানে ঘুরতে শুরু করল কম্পাসের কাঁটা। আশ্চর্য তো! ব্যাপারটা ছেলের গোচরে আনল রিচার্ডসন। কিন্তু একটুও অবাক হল না ছেলে। নির্বিকারভাবে জবাব দিল সে, 'আমরা এখন অ্যানড্রেসের ওপর দিয়ে উড়ছি। মোজের রিফের সামনের ওই গভীর সমুদ্রের ওপর দিয়ে যতবারই উড়ে গেছি ততবারই ওরকম অদ্ভুত আচরণ করেছে কম্পাস।'

ছেলের কথা শুনে চুপ করে গেল রিচার্ডসন। মোজেরে রিফ এবং তার আশেপাশে অদ্ভুত সব কাণ্ড ঘটতে দেখেছে সে নিজেও। রাতের বেলা আগুন জ্বলতে দেখেছে সে রিফের মাথায়, অথচ তার ত্রিসীমানায় জনবসতি নেই। দূর থেকে বিমিনি দ্বীপের জেলেরা ওই আলো দেখে ক্রুশ চিহ্ন আঁকে বুকে। জিজ্ঞেস করলে বলে, 'ভূতের আলো'। সে-পথে যাতায়াতকারী অন্যান্য বিমানের পাইলট এবং জাহাজের নাবিকেরাও সে-আলো দেখেছে।

১৯৬২ সাল। বিমান নিয়ে বিমিনির দিকে উড়ে চলেছে দশ বছরের অভিজ্ঞ বিমান ও হেলিকপ্টারের পেশাদার পাইলট ত্রিশ বৎসর বয়স্ক চাক ওয়েকলি। পানামা ও দক্ষিণ আমেরিকার অরণ্যের ওপর দিয়ে এবং সারাক্ষণ মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয় এমন আরও বিপদ সংকুল জায়গার ওপর দিয়ে বহুবার উড়ে গিয়েছে চাক, তবে এ এলাকায়

নতুন সে। প্রখর দৃষ্টি, উপস্থিত বুদ্ধি এবং অসাধারণ সাহসের জন্যেই নামকরা পাইলট হতে পেরেছে। বিমান চালনায় নানা কৃতিত্ব দেখিয়ে সরকারের কাছ থেকে পুরস্কারও পেয়েছে চাক। হঠাৎ ভয় পেয়ে গিয়ে আবোল তাবোল কিছু দেখে ফেলার লোক সে নয়। অথচ সেদিন বিমিনির দিকে উড়ে যাবার সময় তাই দেখল সে।

একটা চার্টার বিমানে করে কিছু যাত্রী নিয়ে ন্যাসো এয়ারপোর্টে নামিয়ে দিয়ে ফিরে আসছিল চাক। সমুদ্র সমতলে আট হাজার ফুট ওপর দিয়ে স্বচ্ছন্দ গতিতে উড়ে চলেছে তার প্লেন। অ্যানড্রস দ্বীপ ছাড়িয়ে পঞ্চাশ মাইল পার হয়ে আসতেই একটা অকল্পনীয় ব্যাপার চোখে পড়ল তার—উইংসের ওপরে মৃদু আলোর প্রলেপ। ককপিটের আলোর প্লেক্সিগ্লাসে আবৃত জানালা পেরিয়ে অনেক সময় ওই ধাঁধার সৃষ্টি করে, তাই প্রথমে গুরুত্ব দিল না চাক। কিন্তু হঠাৎ মনে পড়ল তার উইংস তো সাদা রঙের অথচ আলোর রঙ ফিকে নীলচে-সবুজ কেন? আস্তে আস্তে তীব্র হতে থাকল আলোর জ্যোতি। মিনিট পাঁচেক পর তা এত বেড়ে গেল যে চোখ ধাঁধিয়ে গেল চাকের, ইন্সট্রুমেন্টস প্যানেলের লেখাগুলো পর্যন্ত পড়তে পারল না সে। হাত দিয়ে চোখের সামনে থেকে সে আলো আড়াল করে ইন্সট্রুমেন্টস প্যানেলের দিকে তাকাল চাক। সেখানেও গণ্ডগোল। যেদিকে খুশি ইচ্ছেমত ঘুরছে কম্পাসের কাঁটা। অ্যানড্রস দ্বীপের ওপর দিয়ে উড়ে আসার সময় ফুয়েল গেজ চেক করেছিল সে, তখন গেজের কাঁটা HALF নির্দেশ করছিল, এখন উঠে গেছে FULL-এর ঘরে।

ইলেকট্রিক অটো পাইলটের সাহায্যে চলা প্লেনটা হঠাৎ পাইলটের নির্দেশ না মেনে ডান দিকে বেঁকে যেতেই অটো পাইলট বন্ধ করে নিজের হাতে কন্ট্রোল তুলে নিল চাক। ঠিক বুঝতে পারল না সে, এমন পাগলের মত আচরণ করছে কেন সমস্ত ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্টগুলো। আলোয় আলোয় ঝিকমিক করছে প্লেনের সমস্ত গা,

অথচ আলোর উৎস কোথাও দেখা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে প্লেনের গাটাই কোন অদ্ভুত আলোর তৈরি।

জানালা দিয়ে আবার উইংসের দিকে তাকাল চাক, তাকিয়েই চমকে উঠল। তার মনে হল ক্রমশ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছে পাখাগুলোর আকৃতি। গলে যাচ্ছে নাকি ওগুলো? কম্পাস বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিগুলো কাজ করছে না। আকাশের দিকে তাকাল চাক। তারা দেখে দিক নির্দেশ করার কথাও ভাবল। কিন্তু চোখের ওপর উজ্জ্বল আলোর ঝলকানিতে তারাও দেখতে পেল না সে। একটু চিন্তিত হল চাক, তবে ভয় পেল না।

নিজের হাতে কন্ট্রোল নিয়েও প্লেনকে কন্ট্রোল করতে পারছে না চাক। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি কাজ না করলে, এমন কি আকাশের তারাও দেখা না গেলে কি করে দিক নির্দেশ করবে সে? অগত্যা প্লেনের খেয়াল খুশির ওপরেই ছেড়ে দিল সে নিজেকে, যেদিকে ইচ্ছে চলুক প্লেন, এই তার ভাব। ক্রমশ আলোর তীব্রতা বেড়েই চলেছে। চোখ খুলে রাখা যাচ্ছে না সে তীব্র আলোয়। আরও প্রায় মিনিট পাঁচেক ওই অবস্থায় চলার পর কমতে থাকল আলোর জ্যোতি, সেই সাথে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে শুরু করল প্লেনের ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্টস। কমতে কমতে একসময় একেবারে মিলিয়ে গেল সে আলো। রহস্যময় আলো মিলিয়ে যেতেই কন্ট্রোল প্যানেলের যন্ত্রপাতিগুলোর দিকে তাকাল চাক। আশ্চর্য! আগের মতই কাজ করছে যন্ত্রপাতিগুলো, একটাও নষ্ট হয়নি। কম্পাস দেখে বুঝল চাক, নির্দিষ্ট পথ থেকে মাত্র মাইল পঞ্চাশেক সরে গেছে প্লেন। অটো পাইলট চালু করে দিল চাক, আগের মতই কাজ করছে। এরপর নিরাপদেই সেদিন বিমিনি এয়ারপোর্টে ফিরে এসেছিল চাক ওয়েকলি।

এয়ারপোর্টে পৌঁছে তার সঙ্গী পাইলটদেরকে ব্যাপারটা বলল চাক। ভেবেছিল তাকে পাগল ঠাওড়াবে পাইলটরা। কিন্তু তাকেই বরং

আশ্চর্য করে দিয়ে মৃদু হেসে বিজ্ঞের মত মাথা নাড়াতে লাগল ওরা। একজন তো বলেই ফেলল, 'সবে তো এসেছ এখানে, কয়েকদিন থাকো। বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের আরও কত কাণ্ডই নিজের চোখে দেখতে পাবে।'

১৯৬৩ সালে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের একটা বিবৃতি প্রকাশ পেয়েছিল সোসাইটি ফর দ্য ইনভেস্টিগেশন অফ দ্য আন এক্সপ্লেনড এর মুখপাত্র 'পারস্যুট' পত্রিকায়। বিবৃতিটা পেশ করেছিল রবার্ট ডুরান্ড নামে একজন অভিজ্ঞ পাইলট। ওই বছরেরই ১১ এপ্রিল একটা বোয়িং ৭০৭ বিমান নিয়ে স্যান জুয়ান থেকে নিউইয়র্ক যাচ্ছিল ডুরান্ড। বেলা দেড়টার দিকে পুয়েরটোরিকো ট্রেঞ্চের ওপর দিয়ে যাচ্ছে প্লেনটা। এই এলাকার সাগরে পাঁচ থেকে সাড়ে পাঁচ মাইল গভীর একটা গিরিখাত আছে।

একত্রিশ হাজার ফুট উঁচু দিয়ে তখন উড়ে চলেছে প্লেন। হঠাৎ লক্ষ্য করল ডুরান্ড, মাইল পাঁচেক দূরে সাগরের বুক থেকে একটা বিশাল ফুলকপির মত বস্তু উঠে আসছে। জলস্তম্ভ বা সাগরে এটম বোমা ফাটার ছবি দেখেছে ডুরান্ড, বস্তুটা অনেকটা সেই রকমই মনে হল তার। দেড় মাইল মত হবে ফুলকপির মত বস্তুটার বেড়, আর উচ্চতা আধ মাইল। বিমানের ক্যাপ্টেন আর ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ারও দেখল বস্তুটা।

ডিউটি শেষ হবার পর কোস্টগার্ডদের অফিস, এফ বি আই এবং যে যে জায়গায় ভূমিকম্প নিরূপণের সিসমোগ্রাফ যন্ত্র আছে সবখানে খোঁজ-খবর করল ডুরান্ড। কিন্তু যেখানে ফুলকপির মত বস্তুটা দেখা গিয়েছিল সেখানে বা তার আশেপাশের কোথাও জলস্তম্ভ বা টাইডাল ওয়েভ ঘটেছিল এমন খবর দিতে পারল না কেউ।

তাহলে? সেদিন সাগরের ওই এলাকায় কি কোন পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছিল? খোঁজ নিয়ে জানল ডুরান্ড সেদিন সাগরের

ওই এলাকায় ও ধরনের কোন বিস্ফোরণ ঘটানো হয়নি। তবে একটা খবর পাওয়া গেল, ওই দিনই ফুলকপির মত বস্তুটা দেখার জায়গা থেকে কয়েক হাজার মাইল দূরে 'থ্রেশার' নামে একটা সাবমেরিন হারিয়ে গিয়েছে। তার কোন খোঁজই পরে আর পাওয়া যায়নি। তবে কি ওই সাবমেরিন হারানর সাথে বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের ভেতর দেখা অদ্ভুত বস্তুটার কোন যোগাযোগ আছে? কোন বিদেশী গ্রহের যান ছিল কি ওই ফুলকপির মত বিশাল বস্তুটা? কে জানে, ওই দানবীয়যানে করে থ্রেশারকে ধরে নিয়ে গেল কিনা আমাদের চেয়ে বহুগুণে বুদ্ধিমান অন্য কোন গ্রহের অধিবাসীরা?

কিছুদিন আগে একটা অদ্ভুত কাহিনী বলেছেন ফোর্ট লডারডেলের মনোবিজ্ঞানী ড. এস এফ জ্যাবলনকি। ১৯৭২ সালের ১৫ নভেম্বর গ্রেট একজুমার জর্জ টাউনে বিমান বন্দর থেকে ফোর্ট লডারডেলের উদ্দেশে রওনা দিল একটা দুই ইঞ্জিন বিশিষ্ট শক্তিশালী বিচক্র্যাফট বিমান। সূর্য তখন ডোবার পথে। পশ্চিমাকাশে রঙের মেলা। ঝকঝকে পরিষ্কার আকাশ, সমুদ্র শান্ত। চারপাশে শান্ত সমাহিত একটা ভাব।

মিনিট দশেক পর একজুমার উত্তর পশ্চিমের টাং অফ দ্য ওশন নামের একটা জায়গায় এসে গেল প্লেন এবং শুরু হল বিদঘুটে কাণ্ডকারখানা। মুহূর্তে বিকল হয়ে গেল সমস্ত বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি। এ অবস্থায় প্রথমেই সিদ্ধান্ত নিল পাইলট, কাছাকাছি কোন পোর্টে নামিয়ে ফেলতে হবে প্লেন এবং যত দ্রুত সম্ভব। ওখান থেকে সবচে কাছের বিমান বন্দর ষাট মাইল উত্তরের নিউ প্রভিডেন্স এয়ারপোর্ট। কম্পাস কাজ না করলেও পথ চিনে সেখানে পৌঁছতে কোন অসুবিধে হবে না, কারণ তখনও সূর্য দেখা যাচ্ছে।

হঠাৎই কথাটা মনে হল পাইলটের। রেডিও তো বিকল, কন্ট্রোল টাওয়ারে খবর দেবে কি করে? বিদ্যুতের অভাবে সিগন্যাল লাইটও জ্বলবে না। অগত্যা অ্যানড্রস এয়ারস্ট্রিপে নামাই স্থির করল পাইলট।

অল্প সময় পরেই অ্যানড্রুস এয়ারস্ট্রীপের কাছে পৌঁছে গেল বিমান। নামার উপক্রম করল পাইলট, তারপরই সবচে ভয়ঙ্কর কথাটা মনে পড়ল ওর। বিদ্যুতের অভাবে কাজ করছে না হাইড্রলিক সিস্টেম, বিমানের চাকা নামাবে কি করে? আবার উঠে পড়ার জন্যে বিমানের নাক সোজা করতে গিয়েই টের পেল পাইলট, কেউ যেন ধরে রেখেছে প্লেনটাকে। ধরে রেখেছে না বলে ভাসিয়ে রেখেছে বলাই উচিত। প্লেনের নাক আর সোজা করল না পাইলট। আশ্চর্য! বিমানের ইঞ্জিন কাজ করছে ঠিকই কিন্তু যতটা দ্রুত নামা উচিত ততটা নামছে না প্লেন। গতি বাড়াল পাইলট। কিন্তু কাজ হল না। যেন জমাট বাঁধা বায়ুস্তর বিমানখানাকে শক্ত করে চেপে ধরে ধীরে ধীরে নামিয়ে দিচ্ছে এয়ারস্ট্রীপের ওপর। আলতো করে প্রথমে প্রপেলার এবং পরে বিমানের পেট মাটি স্পর্শ করল, যেন কোন খেলনা প্লেনকে মাটিতে নামিয়ে রাখল কেউ। স্তম্ভিত হয়ে গেল প্লেনের সবকজন লোক। এতবড় আশ্চর্য ঘটনা ঘুমের ঘোরেও কল্পনা করবে না কেউ। প্লেন মাটিতে নামতেই বাইরে বেরিয়ে এল পাইলট ও যাত্রীরা। পরীক্ষা করে দেখা গেল শুধু প্রপেলারটা জখম হয়েছে, এছাড়া প্লেনের আর কোন ক্ষতি হয়নি। আর কিছুক্ষণ পরই পাইলট এবং যাত্রীদের চূড়ান্ত চমক লাগিয়ে কাজ করতে শুরু করল প্লেনের বৈদ্যুতিক কলকব্জা, চালু হয়ে গেল হাইড্রলিক সিস্টেম। ইমারজেন্সির জন্যে প্লেনে রাখা স্পেয়ার প্রপেলার লাগিয়ে নিল প্লেনের টেকনিশিয়ান। দেরি হলেও ঠিকমতই লডারডেলে পৌঁছতে পেরেছিল পরদিন প্লেনখানা। এই কাহিনী যিনি বলেছেন সেই মনোবিজ্ঞানী ড. এস এফ জ্যাবলিনকিও ওই প্লেনের যাত্রী ছিলেন।

এই যে এতসব আশ্চর্য কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে, এর ব্যাখ্যা কি? অনেক পাইলটই বলে, ওড়ার সময় সারাক্ষণই হুঁশিয়ার থাকলে বহু দুর্ঘটনা এড়ানো যায়। কিন্তু কম্পাস বা অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্র হঠাৎ বিকল

হয়ে গেলে কি করার আছে পাইলটের? অনেক সময় তো পাইলটের অজান্তেই ঘটে যেতে শুরু করে অনেক কিছু, যখন তা টের পাওয়া যায় তখন আর কিছুই করার থাকে না।

একবার পাইলটের অজান্তে এমনি একটা ঘটনা ঘটেছিল, তবে তাতে কোন বিপদ ঘটেনি। বরং তাকে বেশ মজার বলা যেতে পারে। মিয়ামি এয়ারপোর্টের কন্ট্রোল টাওয়ারে বসে সেদিন রাডার স্ক্রীনে একটা প্লেনের দিকে নজর রাখছিল রাডার অপারেটার। হঠাৎ তার চোখের সামনে থেকে ভোজবাজির মত গায়েব হয়ে গেল প্লেনটা। ঠিক দশ মিনিট পরই আবার ওটাকে দেখা গেল রাডারস্ক্রীনে।

নিরাপদেই এয়ারপোর্টে নামল প্লেনটা। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের দশ মিনিট পরে। কন্ট্রোল টাওয়ার পাইলটকে জিজ্ঞেস করল, 'দশ মিনিট লেট করেছ তুমি। আর এয়ারপোর্টে পৌঁছার একটু আগে দশ মিনিটের জন্যে গায়েব হয়ে গিয়েছিল তোমার প্লেন। তুমি টের পেয়েছ কিছু?'

পাইলট তো অবাক। বলে কি টাওয়ার অপারেটর! তার হিসেব মত ঠিক সময়েই তো ল্যান্ড করেছে সে। অপারেটরের সাথে তর্ক শুরু করে দিল পাইলট। শেষ পর্যন্ত পাইলটকে তার ঘড়ি দেখতে বলল টাওয়ার অপারেটার। ঘড়ি দেখেও কিছু বুঝল না পাইলট। তারপর টাওয়ারের ঘড়ির সাথে সময় মিলাতেই দেখল তার ঘড়ি দশ মিনিট স্লো। তাড়াতাড়ি ওই প্লেনেই আসা তার সহকর্মীদের ঘড়ি দেখল পাইলট। ওদের সব কজনের ঘড়িও দশ মিনিট স্লো। তাজ্জব ব্যাপার। বোঝা গেল প্লেনের সব কজনের সময়কে দশ মিনিটের জন্যে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল কোন শক্তি। কি ধরনের শক্তি? বিমানটাই বা ওই সময়ের জন্যে কোথায় অদৃশ্য হয়েছিল? তবে কি আকাশের কোথাও এমন কোন অদৃশ্য সুড়ঙ্গ আছে যার ভেতর ঢুকলে অদৃশ্য হয়ে যায় প্লেন, দাঁড়িয়ে যায় সময়? ওই সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে আসলেই আবার ঠিক হয়ে যায় সব?

বাহামা দ্বীপপুঞ্জের আশেপাশের সমুদ্র বেশ গভীর। বিপজ্জনক কিছু গিরিখাত এবং সুড়ঙ্গ আছে এই এলাকার সাগর তলে। এখানেই অদ্ভুত একটা অভিজ্ঞতা হয়েছিল নাবিক জো টেলির। পঁয়ষট্টি ফুট লম্বা 'ওয়াইল্ড গুজ' নামে একটা শার্ক ফিশিং বোট ছিল তার। সেদিন একশো চার ফুট লম্বা 'কাইকস ট্রেডার' নামে একটা বোটের সাথে টেলির ফিশিং বোটটা বেঁধে বারমুডা ট্রায়াঙ্গল এলাকার ভেতর দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল দক্ষিণ দিকে।

মাঝ রাত। ডেকের নিচে নিজের কেবিনে শুয়ে ঘুমাচ্ছিল জো, হঠাৎ গায়ে পানির ঝাপটা লাগতেই ধড়মড় করে উঠে বসল সে। বিপদের গন্ধ পেয়ে গেছে জো। দ্রুত হুক থেকে লাইফ জ্যাকেটটা খুলে নিয়ে পরে ফেলল সে, তারপর নজর দিল কেবিনের দিকে। হু হু করে সাগরের পানি ঢুকছে কেবিনে। মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল জো, পোর্ট হোল দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেই সাগরে ঝাঁপ দিল সে। আবছা অন্ধকারে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না কিছু, তবু সামনে সাঁতরে চলল জো। একটু পর হাতে দড়ি ঠেকতেই দড়িটাকে শক্ত করে ধরল সে। সামনের দিকে ভেসে যাচ্ছে দড়িটা, অর্থাৎ টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওটাকে। কাইকস ট্রেডারের গায়ে দড়িটা বাঁধা, বুঝতে পারল জো। কিন্তু বোটটাকে দেখতে পেল না।

পেছনে ফিরে চাইল জো। ওয়াইল্ড গুজকেও দেখতে পেল না। তবে কি ডুবে গেছে ওয়াইল্ড গুজ? দড়ির টানে সামনে এগিয়ে চলল জো, লাইফ জ্যাকেট পরা থাকায় ডুবে গেল না সাগরে। আধঘণ্টা চলার পর মেগাফোনে নিজের নাম শুনতে পেল জো, তার নাম ধরে ডাকছে কাইকসের ক্যাপ্টেন। সাড়া দিল জো। আস্তে আস্তে বোটে টেনে তোলা হল তাকে।

কাইকসের লোকদের কাছে শুনল জো, সে যখন ঘুমিয়ে ছিল তখন কাইকসের নাবিকেরা হঠাৎ টের পেল কে যেন পেছন থেকে ভীষণ

জোরে টানছে ওদের বোটখানাকে। পেছনে চেয়ে দেখল ওরা ডুবে যাচ্ছে ওয়াইল্ড গুজ। তখন কাইকসকে বাঁচাবার জন্যে দড়ি কেটে দেয়া হয়। তবে কোনরকমে জো বেরিয়ে আসতে পারে কিনা সেদিকে নজর রাখছিল কাইকসের ক্যাপ্টেন।

আকাশ পরিষ্কার। কোন রকমের প্রাকৃতিক দুর্যোগের চিহ্নও নেই। শুধু ইঞ্জিন বিকল হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন ত্রুটি ছিল না ওয়াইল্ড গুজের। বোটের প্রায়-নতুন খোলের কোথাও কোন রকমের ছিদ্রও ছিল না। এমতাবস্থায় হঠাৎ ডুবে গেল কেন ওয়াইল্ড গুজ?

রহস্যটা নিয়ে বেশি মাথা ঘামাল না জো বা কাইকসের নাবিকেরা। বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের হাত থেকে প্রাণে বাঁচতে পেরেছে, এজন্যেই হাজার ধন্যবাদ দিল নিজেদের ভাগ্যকে। এ অঞ্চলে প্রায়ই অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটে থাকে একথা আগে থেকেই জানে ওরা। জানে, কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ যেন সাগর ফুঁড়ে উঠে আসে গাঢ় কুয়াশা, দড়ি দিয়ে বাঁধা দুটো বোটের সামনেরটায় প্রচণ্ড টান পড়ে। বোটের লোকেরা ফিরে এসে আরও বলে কুয়াশা জমার পর পরই নাকি বোটের সমস্ত ইলেকট্রিক বন্দোবস্ত অকেজো হয়ে যায়, বিকল হয়ে যায় কম্পাস। পেছনের বোটটাকে খসিয়ে দিয়ে কুয়াশার আচ্ছাদন থেকে বেরিয়ে আসা মাত্র আবার ঠিক হয়ে যায় সব কিছু। তবে অধিকাংশ সময়ই পেছনের বোটের ক্যাপ্টেন বাঁচতে পারে না। অত্যন্ত কপাল জোরেই সেদিন বেঁচে গিয়েছিল জো টেলি।

এরকম আর একটা ঘটনা ঘটেছিল ১৯৬৬ সালে। সী ফ্যানটম এক্সপ্লোরেশন কোম্পানি নামে একটি স্যালভেজ কোম্পানির মালিক ক্যাপ্টেন ডন হেনরি। চমৎকার স্বাস্থ্য ক্যাপ্টেনের। একটু উত্তেজিত হলেই ! হাতের তালুতে ডান হাতের ঘুসি মেরে কথা বলতে অভ্যস্ত পঞ্চাশ বছর বয়সের এই মানুষটি। বয়সের তুলনায় একটু বেশিই চটপটে। অভিজ্ঞ নৌবিদ, দুঃসাহসী ডুবুরি ক্যাপ্টেন যেন সাগরেরই

সন্তান।

একশো ষাট ফুট লম্বা আর দু'হাজার হর্স পাওয়ার শক্তিসম্পন্ন ইঞ্জিনওয়ালা 'গুড নিউজ' নামের একটা টাগবোট আছে ক্যাপ্টেন হেনরির। যেদিনের কথা বলছি সেদিন মোট তেইশজন নাবিক ছিল গুড নিউজে। পুরেটোরিকো থেকে মিয়ামির ফোর্ট লডারডেলের দিকে যাচ্ছিল গুড নিউজ। টাগবোটটির পেছনে আড়াই হাজার টনের একটা বার্জ লম্বা দড়ি দিয়ে বাঁধা। টাগবোটের পেছনে প্রায় এক হাজার ফুট দূরে রয়েছে বার্জটা।

সুন্দর বিকেল। আবহাওয়া পরিষ্কার। নিজের কেবিনে শুয়ে ঘুমোচ্ছেন ক্যাপ্টেন হেনরি। হঠাৎ উত্তেজিত কণ্ঠের চেঁচামেচি শুনে ঘুম ভেঙে গেল তাঁর। কেবিন থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন তিনি। যেন ভয় পেয়ে ডেকের ওপর ছোটাছুটি করছে কয়েকজন নাবিক। ক্যাপ্টেনকে দেখেই ছুটে এল চীফ অফিসার, 'জলদি আসুন ক্যাপ্টেন, কম্পাসটার অবস্থা দেখে যান।'

চীফ অফিসারদের পিছু পিছু কন্ট্রোল টাওয়ারে গিয়ে ঢুকলেন ক্যাপ্টেন। কম্পাসের দিকে চেয়েই চমকে উঠলেন তিনি। বোঁ বোঁ করে চরকির মত একটানা ঘুরে চলেছে কাঁটা। কয়েক সেকেন্ড পরই ইঞ্জিনরুম থেকে খবর এল অচল হয়ে গেছে ইলেকট্রিক জেনারেটার। কোনমতেই চালানো যাচ্ছে না সেটাকে।

কন্ট্রোল টাওয়ারের জানালা দিয়ে একবার বাইরে তাকিয়েই ছুটে বেরিয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন। ধবধবে সাদা ধোঁয়ার জগতে যেন রয়েছেন তিনি। ওপরের দিকে তাকালেন—আকাশ চোখে পড়ল না, নিচে চাইলেন—সাগর দেখা যাচ্ছে না। পিছনে চাইলেন—বার্জটাও নেই। হঠাৎ তাঁর মনে হল বার্জের সাথে বাঁধা দড়িটা ধরে কে যেন পেছনে টানছে টাগবোটটাকে। বোটের গতি বাড়িয়ে দেবার আদেশ দিলেন তিনি। একসময় সেই দুধ-সাদা ধোঁয়ার রাজ্য থেকে বেরিয়ে এল গুড

নিউজ। ধোঁয়া না কুয়াশা ঠিক বলতে পারেন না তিনি। হাতের ঘড়ি দেখে বুঝলেন ওই রহস্যময় ধোঁয়া অথবা কুয়াশার রাজ্য থেকে বেরিয়ে আসতে গুড নিউজের মোট বারো মিনিট সময় লেগেছে। কেন যেন তাঁর মনে হল আসলে গুড নিউজ বেরিয়ে আসেনি কুয়াশার ভেতর থেকে, কুয়াশাই হঠাৎ মিলিয়ে গেছে ভোজবাজির মত।

এবারে কিন্তু আগের অন্য সব ঘটনার মত একজোড়া দড়ি বাঁধা বোট বা জাহাজের পেছনেরটা হারিয়ে যাবার সংবাদ বাতিল করে দিয়ে বেঁচে গেল বার্জটা। সাদা কুয়াশার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসার পর পরই পেছনের বার্জে গিয়ে উঠলেন ক্যাপ্টেন। আশ্চর্য! যেন ফুটন্ত বাষ্পের ভেতর থেকে বের করে আনা হয়েছে বার্জটাকে, সেই রকমই [illegible]য়ে আছে ওটার সারা গা। ভাগ্যিস কেউ ছিল না বার্জে, তাহলে সেদ্ধ হয়ে যেতে হত তাকে। রেডিও রুমে খবর নিয়ে জানলেন ক্যাপ্টেন, বারো মিনিটের জন্যে রেডিও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। আরও জানা গেল মাত্র চারদিন আগে কেনা পঞ্চাশটা ফ্ল্যাশলাইটের ব্যাটারি সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে গেছে, ফেলেই দিতে হয়েছে ওগুলোকে।

কেন এমন ঘটে? কোন্ রহস্যময় অদৃশ্য শক্তি এমন প্রচণ্ড জোরে টানতে থাকে বোটগুলোকে আর অকেজো করে দেয় বিদ্যুৎশক্তি? প্রশ্নগুলোর জবাব দিতে পারছে না কেউ।

এইরকম টানাটানির ভেতর দিয়েই আরও অদ্ভুত একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেন ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ার নরম্যান বীন। ক্লোজড সারকিট আন্ডারওয়াটার টেলিভিশন এবং একধরনের হাঙ্গর তাড়ানো যন্ত্রের আবিষ্কারক তিনি। আকাশে উড়তে দেখা Unidentified Flying Object (U F O) এবং বারমুডা ট্রায়াঙ্গল রহস্যেরও পর্যবেক্ষক ইঞ্জিনিয়ার নরম্যান বীন।

১৯৭২ সালের সেপ্টেম্বরের এক সুন্দর সন্ধ্যা। তিনজন যাত্রী সহ বিসকেন উপসাগর বেয়ে কোকোনাট গ্রোভ বন্দরে ফিরে যাচ্ছিল 'নাইটমেয়ার' নামের ডিজেল ইঞ্জিন চালিত একটা ফিশিং বোট। ফেদারবেড ব্যাংকস এলাকায় পৌছতেই দেখা গেল ক্রমশ কমে আসছে বোটের আলো। ঠিকমত দিক নির্দেশ করছে না কম্পাসের কাঁটা। তবে তার জন্যে ভয় নেই, কারণ দূরে বন্দরের আলো চোখে পড়ছে। এদিকে বোটের আলো কমতে কমতে হঠাৎ নিভে গেল, হঠাৎ করেই যেন ফুরিয়ে গেছে ব্যাটারি।

কম্পাস অচল, তাই বন্দরের আলো দেখে বোটের গতিপথ নির্ধারণ করল পাইলট। যতটা সম্ভব বোটের গতি বাড়িয়ে দিল সে। কিন্তু গতি বাড়ালে কি হবে, বোট যেন এগোতে চাইছে না। আর প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও বার বার উত্তরে ঘুরে যাচ্ছে বোটের নাক। মনে হচ্ছে পেছন থেকে কে যেন টেনে রেখেছে বোটটাকে।

কয়েক সেকেন্ড পরই বোট থেকে মাইল দুয়েক দূরে পশ্চিম আকাশে এক টুকরো জমাট বাঁধা কালো মেঘ দেখতে পেল বোটের লোকেরা। যেন আকাশ ফুঁড়ে উদয় হয়েছে ওই মেঘ। তারপরই চোখে পড়ল আরেকটা জিনিস। আকাশের উত্তর কোণ থেকে ওই মেঘের কাছে দ্রুত ছুটে এল একটা বিশাল উজ্জ্বল তারা। মেঘের কাছাকাছি পৌছে কয়েক মুহূর্ত একজায়গায় স্থির হয়ে থাকল তারাটা, তারপর বিদ্যুৎগতিতে ঢুকে গেল মেঘের ভেতর। সাথে সাথেই যেন কারও রহস্যের অঙ্গুলি হেলনে একসঙ্গে দপ করে জ্বলে উঠল নাইটমেয়ারের সবকটা বাতি, স্বাভাবিক অবস্থানে ফিরে এল কম্পাসের কাঁটা, পূর্ণবেগে লাফ দিয়ে সামনে ছুটল বোট। টেলিভিশনে লেকচার দিতে গিয়ে কাহিনীটার উল্লেখ করেছেন ইঞ্জিনিয়ার নরম্যান বীন।

ইঞ্জিনিয়ার নরম্যান বীন কাহিনীটার উল্লেখ করতেই ১৯৫৭ সালে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনার কথা বিশ্বাস করতে শুরু করল লোকে। এর

আগে কিন্তু কথাটাকে হেসে উড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। বড়দিনের ঠিক এক সপ্তাহ আগে ইউ এস নেভির একজন প্রাক্তন ক্যাপ্টেন পঁয়ত্রিশ ফুট লম্বা ডিজেল চালিত একটা ফিশিং বোট নিয়ে বাহামার ফ্রি পোর্টে যাচ্ছিলেন। ফিশিং বোটের চালক ক্যাপ্টেন নিজেই। চলতে চলতে এক জায়গায় এসে হঠাৎ বোটের আলো নিভে গেল। বিগড়ে গেল কম্পাসের কাঁটা। মনে হল পেছন থেকে টানছে কেউ বোটটাকে।

কয়েক সেকেন্ড পরই হঠাৎ করে আকাশের এক জায়গায় দেখা গেল একটুকরো কালো মেঘের সামিয়ানা। মেঘের সামিয়ানা দেখা যেতেই আকাশের উত্তর দিক থেকে উড়ে এল তিনটে উজ্জ্বল তারার মত বস্তু। একমুহূর্ত মেঘের সামিয়ানার কাছে থমকে দাঁড়াল তারার মত বস্তুগুলো, তারপর ঢুকে গেল ভেতরে। সাথে সাথেই স্বাভাবিক হয়ে গেল বোটের সমস্ত বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি আর কম্পাস।

ওই বছরেরই ডিসেম্বর মাসে নেভি ক্যাপ্টেনের ফিশিং বোট যে জায়গায় রহস্যময় তারকা দেখেছিল তার থেকে চল্লিশ মাইল দূরে মালবাহী একটা ফ্রেটার এগিয়ে যাচ্ছিল গালফ স্ট্রীম ধরে। হঠাৎ করেই শুরু হল অস্বাভাবিক বৈদ্যুতিক গোলযোগ। কম্পাস অকেজো হয়ে যাওয়ায় ভুল পথে গিয়ে চোরাবালিতে আটকে গেল ফ্রেটারটি। এবারেও কিন্তু আকাশের এক কোণে জমাট বাঁধা কালো মেঘ আর তারকা দেখা গিয়েছিল।

সবচে আশ্চর্য ব্যাপার হল প্রত্যেকবারই মেঘ বা ধোঁয়া জাতীয় জিনিসটার ভেতর তারকা বা তারকাগুলো ঢুকে যাওয়ার পর পরই দ্রুতবেগে ছুটতে ছুটতে মহাশূন্যে হারিয়ে যায় রহস্যময় ধোঁয়া বা কুয়াশার স্তর। কি ওগুলো? বোট, আলো, কম্পাস, এবং বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির ওপরে কি করে প্রভাব বিস্তার করে ওগুলো? কারণ খুঁজে বের করতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা, কিন্তু পারছেন কই?'

সাত

রহস্য ছড়িয়ে আছে সবখানে!

বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের রহস্য ভেদ করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন বিজ্ঞানীরা। নানারকম বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানও গঠিত হয়েছে এর জন্যে। এদের ভেতর অন্যতম খ্যাতনামা মার্কিন বিজ্ঞানী আইভান টি স্যান্ডারসনের প্রতিষ্ঠিত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান 'সোসাইটি ফর দ্য ইনভেস্টিগেশন অফ দ্য আন-এক্সপ্লেনড'-এর কথা আগেই বলা হয়েছে।

কেবল বারমুডা ট্রায়াঙ্গল নিয়েই পড়ে রইলেন না স্যান্ডারসন। পৃথিবীতে বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের মত আরও কোন এলাকা আছে কিনা খুঁজতে শুরু করলেন তিনি। কাজে লেগে গেল তাঁর সোসাইটির নামকরা সমুদ্রবিদ্যা বিশারদ, ভূগোল বিদ, ভূতাত্ত্বিক, গাণিতিক এবং এ সম্পর্কে অন্যান্য বিদ্যায় পারদর্শী সব বিজ্ঞানীর দল।

শেষ পর্যন্ত সত্যিই তেমন মোট দশটি এলাকা পেয়ে গেলেন স্যান্ডারসন। তার ভেতর সবচে কুখ্যাত জাপানের অদূরে ডেভিলস সী। এছাড়া আছে পশ্চিম ভুমধ্যসাগরে, হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের উত্তর পুবে উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে, আরজেনটিনা উপকূলের দক্ষিণ আটলান্টিকের দক্ষিণ পুবে, দক্ষিণ আফ্রিকা উপকূলের দক্ষিণ পুবে, ভারত মহাসাগরের পুবে দুটো অঞ্চলে, অস্ট্রেলিয়ার অদূরে টাসমান সমুদ্রে এবং আফগানিস্তানের পশ্চিম দিকের একটি অঞ্চলে। আফগানিস্তান ছাড়া

এদের বাকি সবকটিই সাগরের বুকে অবস্থিত।

সবকটা এলাকাই কিন্তু বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের মত ত্রিকোণ নয়, গোল, চৌকোণ কিংবা ডায়মন্ডের মত আকৃতির জায়গাও আছে। দশটি এলাকার অবস্থানই বেশ মজার। ইকুয়েটরের উত্তরে আছে পাঁচটি, দক্ষিণে পাঁচটি। প্রতিটি ক্ষেত্রের তফাথ ৭২° অর্থাৎ পরস্পরের কাছ থেকে সমান দূরে অবস্থিত ওগুলো। এই দশটি এলাকা বাদে আরও দুটো এলাকাকে রহস্যক্ষেত্র বলে অভিহিত করেছেন স্যান্ডারসন—উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু। এই সব এলাকার সাগর অশান্ত, প্রায়ই ঝড় বা অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে। এখানে বিমান বা জাহাজ হারিয়ে গেলে তার কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না। আর এসব অঞ্চলেই সবচে বেশি আনাগোনা করে ইউ. এফ. ও-এর দল। জাপানের দক্ষিণ পূর্ব দিক থেকে ম্যারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত প্রশান্ত মহাসাগরের এক বিস্তীর্ণ এলাকা বর্তমানে ডেভিলস সী নামে কুখ্যাতি অর্জন করেছে। বারমুডা ট্রায়াঙ্গল যেমন মূল ভূখণ্ডের দক্ষিণ পুবে, এই ডেভিলস সী-ও তেমনি জাপান ভূখণ্ডের দক্ষিণ পুবে অবস্থিত। বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের মত রহস্যজনক ভাবে ডেভিলস সী-তেও হারিয়ে গেছে বহু জাহাজ।

ঝড় জলকে উপেক্ষা করে ওই সাগরে মাছ ধরতে যায় জাপানী জেলেরা। বাপ দাদার আমল থেকেই শুনে আসছে তারা সাগরে মাছ ধরতে গেলে যেমন আনন্দ আর উত্তেজনা আছে তেমনি বিপদও আছে। ওখানকার সাগরের অতল তলে বাস করে বিশাল দৈত্য, ইচ্ছে হলেই হাত বাড়িয়ে সাগরের বুক থেকে মানুষ, জাহাজ সব কিছু টেনে নেয় সে। কেউ কেউ আবার বলে দৈত্য না, আসলে ওখানে বাস করে শয়তানের দল।

এসব কিংবদন্তীতে প্রথমে কান দেয়নি জাপান সরকার। ওই অঞ্চলের সাগরে মাঝে মাঝে প্রচণ্ড ঝড় হয়, উথাল-পাতাল নাচে বিশাল ঢেউ, জাপানীরা তাকে 'সুনামি' বলে। ওই সুনামির মুখে পড়লে

নৌকা সহ জেলেরা ডুবে তো যাবেই।

তারপরই ঘটল আসল অঘটন। ১৯৫০ থেকে ১৯৫৪ সালের মধ্যে ওই এলাকার সাগরে রহস্যজনক ভাবে হারিয়ে গেল বেশ ক'খানা বড় এবং সর্বাধুনিক জাহাজ, বেশির ভাগই মালবাহী। উন্নত মানের ইঞ্জিন যুক্ত জাহাজগুলোতে উন্নত মানের রেডিও ছিল, তা সত্ত্বেও কোন বিপদ সংকেত না জানিয়েই কি করে গায়েব হয়ে গেল জাহাগুলো?

আর চুপ করে বসে থাকা যায় না। রহস্য উদঘাটনের জন্যে 'কাইয়ো মারু' নামে একটা জাহাজ পাঠালেন জাপান সরকার। উন্নত মানের বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামসহ বহু অভিজ্ঞ বিজ্ঞানী ছিলেন জাহাজটায়। রহস্য উদঘাটন করতে গিয়ে নিজেই রহস্যের সাগরে নিখোঁজ হল 'কাইয়ো মারু'।

বহু গবেষণার পর রায় দিলেন জাপানী বিজ্ঞানীরা, ডেভিলস সী এর নিচে সত্যিই বাস করে দৈত্য দানবেরা এবং তারা জীবন্ত। এই দানবদেরকে বলা হয় আগ্নেয়গিরি। মাঝে মাঝেই সাগর তলের সেসব আগ্নেয়গিরিতে অগ্ন্যুৎপাত শুরু হয়। তাতে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হয় ওই জায়গার সাগরের বুকে। আর ওই আলোড়নে পড়ে নিমেষে তলিয়ে যায় নৌকা, বড় জাহাজ, মানুষ।

ডেভিলস সী-তে কেন জাহাজডুবি ঘটে এর কারণ বোঝা গেলেও কিছু প্রশ্ন থেকে যায়। দুর্ঘটনায় পড়ার পর অন্তত একবারও বিপদ সংকেত পাঠায়নি কেন জাহাজগুলো। আর দুর্ঘটনার পর ওই এলাকার সাগরের পানিতে মৃত দেহ, জাহাজের মালপত্রের কিছু না কিছু, কিংবা তেল ভাসতে দেখা যাবার কথা, অথচ দেখা যায়নি। তাও না হয় এটা ওটা বলে কোনমতে ধামাচাপ দেয়া গেল, কিন্তু বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের মত ডেভিলস সী-এর আকাশেও নানা রকম গোলমাল দেখা যায় তার কি ব্যাখ্যা দেবেন ভূতত্ত্ব বিশারদেরা?

বিখ্যাত লেখক আর্থার গডফ্রের মত লোক আর যাই বলুন

টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে অন্তত বাজে কথা বলবেন না। এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, ‘এই সব ট্রায়াঙ্গল, ডেভিলস সী, লিম্বো অফ দ্য লস্টগুলি আগে গাঁজাখুরি মনে হত আমার। কিন্তু অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে রহস্য সত্যিই একটা আছে ওসব এলাকায়, যার ঠিকমত ব্যাখ্যা দিতে পারছি না আমি।’ ডেভিলস সী-এর সবচে সাড়া জাগানো রহস্যের নায়ক একটি আমেরিকান সাবমেরিন `Scorpion-278'-এর কথা আগেই উল্লেখ করেছি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান নেভিকে রীতিমত ঘোল খাইয়ে ছেড়েছিল Scorpion-278—নিউ হ্যাম্পশয়ারের পোর্টসমাউথ নেভি ইয়ার্ডে ১৯৪২ সালে জন্মগ্রহণ করে ওই স্করপিয়ন। জন্মের পর পরই তাকে সাড়ম্বরে পানিতে ভাসাল নেভি ইয়ার্ডের মাস্টার মোল্ডারের কন্যা মিস মোল্ডার। পানিতে ভাসার তিন মাসের মধ্যেই কাজ পেয়ে গেল স্করপিয়ন। কয়েক মাস ট্রেনিং দেবার পর ১৯৪৩ সালের মার্চে তাকে নিয়ে আসা হল প্রশান্ত মহাসাগরে আমেরিকান নৌবাহিনীর বিশাল নৌঘাঁটি পার্ল হারবারে। এখান থেকেই শুরু হল স্করপিয়নের বিজয় অভিযান। বিদ্যুৎবেগে ছুটে গিয়ে শত্রু জাহাজকে আক্রমণ করে আবার সমান গতিতে ফিরে আসতে পারত স্করপিয়ন।

হয়ত ধীর গতিতে শত্রু রাষ্ট্রের দিকে এগিয়ে চলেছে বিশাল মালবাহী জাহাজ। চারপাশে তার পাহারা দিচ্ছে ব্যাটলশিপ, ডেস্ট্রয়ার। সেই ব্যূহ ভেদ করে ভেতরে ঢুকে যেত স্করপিয়ন, তারপর টরপেডো মেরে মালবাহী জাহাজটার বারোটা বাজিয়ে আবার ফিরে আসত সে।

স্করপিয়নকে ধ্বংস করার জন্যে উঠে পড়ে লাগল শত্রু পক্ষের সাবমেরিন, ডেস্ট্রয়ার ইত্যাদি। কিন্তু কোনমতেই কাবু করতে পারল না সাবমেরিনটাকে। ডেপথ চার্জের সীমার মধ্যে গেলেও পালিয়ে আসতে পারত স্করপিয়ন। তখন হয় সে অথই পানিতে ডুব দিত নতুবা দ্রুত গতিতে ডেপথ চার্জের সীমার বাইরে চলে যেত।

১৯৪৩ সালের ৮ মে প্রথম অভিযান শেষ করে নিরাপদে পার্ল হারবারে ফিরে এল স্করপিয়ন। কিছুটা বিশ্রাম দরকার তার। ছোটখাট জখমগুলোও সারিয়ে তোলা প্রয়োজন। তিন সপ্তাহের মধ্যেই আবার আগের মত সুস্থ হয়ে উঠল স্করপিয়ন। আবার বেরিয়ে পড়ল সে। পথে এক জায়গায় তেল ভরে নিয়ে সোজা পুবে এগিয়ে চলল স্করপিয়ন। লক্ষ্য ফরমোজা-সুশিমা-নাগাসাকির স্টীমার রুট।

জায়গা মত পৌঁছে শিকারের উদ্দেশ্যে ওঁৎ পেতে বসে রইল স্করপিয়ন। মাঝে মাঝে পেরিস্কোপ উঁচিয়ে দেখে শত্রু পক্ষের জাহাজ আসছে কিনা। ৩ জুলাই এল ওরা। পাঁচটা জাপানী মালবাহী জাহাজ। ওদের আগে পিছে এবং পাশে পাহারা দিতে দিতে এগোচ্ছে কয়েকটা ডেস্ট্রয়ার। আকাঙ্ক্ষিত শিকার দেখে খুশি হয়ে উঠল স্করপিয়ন। তৈরি হয়ে অপেক্ষা করতে থাকল সে। জাহাজগুলো রেঞ্জের ভিতরে আসতেই টর্পেডো ছুঁড়ল। নির্ভুল লক্ষ্য। পাঁচটা জাহাজের দুটো 'আজান মারু' আর 'কোকুরিউ মারু' টর্পেডোর আঘাতে ডুবে গেল। জাহাজ দুটো ধ্বংস করে দিয়েই একছুটে বিপদ সীমার বাইরে চলে গেল স্করপিয়ন। বিভিন্ন দিক থেকে খ্যাপা ষাঁড়ের মত ছুটে এল ডেস্ট্রয়ারগুলো। সাবমেরিনের পেরিস্কোপ চোখে পড়লেই ডেপথ চার্জ ফেলবে ওরা।

চারদিক থেকে আক্রান্ত হয়ে বিপদে পড়ল স্করপিয়ন। কিন্তু পেরিস্কোপ দেখাবার মত বোকামি করল না সে, সাগরের একেবারে তলায় পৌঁছে চুপচাপ মড়ার মত পড়ে রইল। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষার পরও স্করপিয়নের টিকির খোঁজ না পেয়ে আন্দাজেই ডেপথ চার্জ ছাড়তে শুরু করল ডেস্ট্রয়ারের দল। পানি তোলপাড় করে ফাটল ডেপথ চার্জগুলো, কিন্তু কোন ক্ষতি হল না স্করপিয়নের। তার কাছ থেকে বেশ কিছুটা দূরে পড়েছিল ডেপথ চার্জগুলো।

অন্য ফন্দি করল জাপানীরা। ওপর থেকে সাবমেরিন ধরা চেন নামাতে শুরু করল ওরা। এবার আর চুপচাপ পড়ে থাকা যাবে না। যে

কোন মুহূর্তে ওই সব চেন আটকে ফেলতে পারে স্করপিয়নকে। চলতে শুরু করল স্করপিয়ন। টের পেয়ে গেল জাপানীরা। আবার ডেপথ চার্জ ফেলতে লাগল ওরা।

এদিক ওদিক সরে গিয়ে জাপানী ডেপথ চার্জ এড়াতে লাগল স্করপিয়ন, কিন্তু জাপানীরা ছাড়ল না। আজ সাবমেরিনটাকে ধ্বংস করে ছাড়বে ওরা। বহু জ্বালিয়েছে ওদের হারামী সাবমেরিনটা, আর নয়। পাইকারী হারে ডেপথ চার্জ ফেলে চলল ওরা। খুঁজে বেড়াল চেন নামিয়ে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত জাপানীদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে পালিয়ে এল স্করপিয়ন। তেমন আঘাত পায়নি সে, তবে শব্দ প্রেরক যন্ত্রটা জখম হয়েছে। ওটাকে না সরিয়ে আর শত্রু জাহাজ আক্রমণ করা ঠিক হবে না। অতএব ১৫ জুলাই মিডওয়ে হারবারে এসে পৌঁছল স্করপিয়ন। সেখানে ছোটখাট মেরামত করিয়ে নিয়ে ফিরে এল পার্ল হারবারে। বড় ধরনের মেরামতগুলোও সেরে নেয়া দরকার, মিডওয়ে ঘাঁটিতে তা করা যাবে না।

অসাধারণ সাহসিকতার জন্যে দুটি ব্যাটল স্টার পুরস্কার দেয়া হল স্করপিয়নকে। ১৩ অক্টোবর মেরামত করিয়ে আবার রওনা হল সে, এবার তার লক্ষ্য ম্যারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জ। ইংরেজিতে একটা কথা আছে আনলাকি থারটিন, অথচ এই 'আনলাকি' তেরো তারিখেই রওনা দিল স্করফিয়ন। আর তাকে যেতে হবে দুটো কুখ্যাত এলাকার মধ্যে দিয়ে—বারমুডা ট্রায়াঙ্গল এবং ডেভিলস সী।

অক্টোবরের বাকি দিনগুলোয় তেমন সুবিধা করতে পারল না স্করপিয়ন, তবে নভেম্বরের গোড়ার দিকে একটা জাপানী জাহাজ চোখে পড়ল তার, দেখা মাত্রই জাহাজটাকে ধাওয়া করল স্করপিয়ন। কিন্তু দৌড়ের পাল্লায় তাকে সহজে পরাস্ত করতে পারল না সে। বহুক্ষণ থেকেই আকাশে ঝড়ের লক্ষণ ফুটে উঠতে শুরু করেছিল, এবার তা

আছড়ে পড়ল সাগরের বুকে। তুমুল বৃষ্টির তোড়ে ঝাপসা হয়ে গেল পেরিস্কোপের কাঁচ, তাছাড়া পর্যাপ্ত আলোও নেই। জাহাজটাকে হারিয়ে ফেলল স্করপিয়ন।

আরও তিন দিন কেটে যাবার পর ৮ নভেম্বর বেশ কয়েকটা জাহাজ দেখতে পেল স্করপিয়ন। ম্যারিয়ানা থেকে দ্য পাজারস দ্বীপ পর্যন্ত একটা জাহাজ রুট আছে, সেই রুটেই চলছে জাহাজগুলো। রেঞ্জের মধ্যে পেয়েই আক্রমণ করে বসল স্করপিয়ন। টপাটপ ডুবিয়ে দিল একটি মালবাহী ও একটি তেলবাহী জাপানী জাহাজ, পরক্ষণেই ছুটে পালাল সাইপান দ্বীপের দিকে।

জাপানী সৈন্য বোঝাই বিশাল এক জাহাজকে পাহারা দিয়ে নিয়ে চলেছিল দুটো ডেস্ট্রয়ার আর একটা করভেট। তাদের একেবারে কাছাকাছি গিয়ে পড়ল স্করপিয়ন। সৈন্য বোঝাই জাহাজটাকে দেখেই মনস্থির করে ফেলল স্করপিয়ন, ওটাকে ডোবাতে হবে। এই সময়ে হঠাৎ স্করপিয়নের রাডার খারাপ হয়ে যাওয়ায় ইচ্ছের বিরুদ্ধেও পার্ল হারবারে ফিরে আসতে হল তাকে। পুরোপুরি না হলেও এবারের যাত্রায় তাকে আংশিকভাবে আনলাকি করেছিল 'আনলাকি থারটিন'।

রাডার মেরামত এবং অন্যান্য ছোটখাট মেরামত করিয়ে নিয়ে ২৯ ডিসেম্বর তৃতীয় বারের মত বেরিয়ে পড়ল স্করপিয়ন। এবারকার কমান্ডার হলেন দক্ষ ও অভিজ্ঞ ক্যাপ্টেন এম. জি. শিমাড। যাত্রার পঞ্চম দিনে ডেভিলস সীতে প্রবেশ করল ডুবো জাহাজ, এবং প্রবেশ করার পর থেকেই ঘটতে শুরু করল অঘটন। নেভাল বেসে মেসেজ পাঠাল সে—একজন ক্রুর হাত ভেঙে গেছে, অবিলম্বে তাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা দরকার।

কিন্তু কি করে স্থানান্তরিত করা যায়? খোঁজ নিয়ে জানা গেল স্করপিয়নের সবচে কাছাকাছি আছে মিত্র জাহাজ 'হেরিং'। তাকে খবর পাঠাল ন্যাভাল বেস। কিন্তু ডেভিলস সী এবং তার চারপাশ তখন

ভীষণ অশান্ত। স্করপিয়নের ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারল না হেরিং। মধ্যরাতে ন্যাভাল বেসে একটা ছোট্ট মেসেজ পাঠাল স্করপিয়ন, 'আন্ডার কন্ট্রোল'।

সেই শেষ। কোনদিন আর কোন মেসেজ পাঠায়নি দুর্ধর্ষ স্করপিয়ন, ফিরেও আসেনি। তার কাছ থেকে কোন খোঁজ খবর না পেয়ে ক্রমেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল আমেরিকান নেভি। ২৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অপেক্ষা করেও স্করপিয়নের কোন খোঁজ না পেয়ে সরকারিভাবে ঘোষণা করল আমেরিকান নেভি 'স্করপিয়ন লস্ট ইন অ্যাকশন'। এ কথা শুনেও কিন্তু চুপচাপ থাকল জাপানী নেভি। অথচ স্করপিয়নকে ধ্বংস করতে পারলে ঢাকঢোল পিটিয়ে তা ঘোষণা করার কথা তাদের।

শেষ হল যুদ্ধ। খুঁটিয়ে দেখা হল জাপানী খাতাপত্র। স্করপিয়নকে ধ্বংস করা হয়েছে এ কথার সামান্যতম উল্লেখও নেই কোথাও। না, জাপানীরা ধ্বংস করেনি স্করপিয়নকে। দু'জন অফিসার আর চুয়ান্ন জন ক্রু নিয়ে রহস্যজনক ভাবে ডেভিলস সীতে হারিয়ে গেছে স্করপিয়ন।

বহু প্রাচীন গ্রন্থে লেখা আছে সেকালে দেবতারা নাকি সোনার রথে চড়ে স্বর্গ থেকে নেমে আসত মাটির পৃথিবীতে। হয়ত অন্য গ্রহের অধিকতর বুদ্ধিমান কোন জীব মহাশূন্য যানে করে নেমে আসত। আর তারাই হয়ত বারমুডা ট্রায়াঙ্গল, ডেভিলস সী এবং বাকি আটটি রহস্যময় অঞ্চলে কোন বৈজ্ঞানিক কারিগরি করে রেখে গেছে যার ক্রিয়া নষ্ট হয়নি আজও। আর গ্রহান্তরের বিজ্ঞানী কেন সেকালের পৃথিবীর বিজ্ঞানীরাই হয়ত অনেক অদ্ভুত কারিগরি করে রেখে গেছেন যার রহস্য আজকের আধুনিকতম বিজ্ঞানীরাও ভেদ করতে পারছেন না। কোনার্ক মন্দিরের ভেতরে একটি গোলাকার চুম্বক ছিল, কোন অবলম্বন ছাড়াই শূন্যে ঝুলে থাকত ওটা। আর মিশরের পিরামিড তো আজও এক প্রচণ্ড বিস্ময়। কি করে আস্ত পাথরগুলোকে অত ওপরে তুলে কোন প্লাস্টার ছাড়াই একটার সাথে আর একটাকে আটকে রাখা

হয়েছে বহু গবেষণা করেও আজকের বিজ্ঞানীরা তা বের করতে পারেনি এখনও।

আসলে আমাদের এই পৃথিবীরই বা কতটুকু জানি আমরা? সাগরের অতল গভীরে পাহাড়, গুহা, সুড়ঙ্গ, গিরিখাত এর ভেতর হয়ত কত অজানা জন্তু জানোয়ার বাস করে, যার নাম আজও আমরা জানি না। বিজ্ঞানীরা রায় দিয়েছিল আন্দাজ ছয় কোটি বছর আগে কোয়েলাকান্থ নামে বড় আকারের এক জাতের মাছ লুপ্ত হয়ে গেছে পৃথিবীর বুক থেকে। অথচ ১৯৩৮ সালে বিজ্ঞানীদের সেই রায় বাতিল করে দিয়ে ভারত মহাসাগরে ধরা পড়ল ওই মাছেরই একটি। মাছেদের পা থাকে এমন কথা শুনেছে কেউ কখনও? কিন্তু সত্যিই চারটে করে পা থাকে নীল রঙা কোয়েলাকান্থ মাছেদের।

'সী সার্পেন্ট' নামে বিশাল সাপ নাকি ঘুরে বেড়ায় সাগরের অতল তলায়। কেউ কেউ এদের দেখেছে বলেও দাবি করে থাকে, তারা সী সার্পেন্টের যে বর্ণনা দিয়েছে তার সাথে প্লায়োসিন যুগের ইকথিওসরাসের বহু মিল আছে। কারও কারও মতে সাগরের গভীরে যেখানে চির অন্ধকার বিরাজমান, সূর্যের আলো যেখানে কোনদিন পৌঁছতে পারে না, সেখানেই বাস করে 'সী সার্পেন্ট'। তাসমানিয়া আর ম্যাসাচুসেটসের উপকূল থেকে এদের দেখা গেছে বলে শোনা যায়।

সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে একবার একটা অদ্ভুত জীব শিশু ধরে ফেলে একটি ট্রলার। জীবটিকে কেউ সনাক্ত করতে পারেনি। জীবটির আকৃতি পরীক্ষা করে ডেনমার্কের সমুদ্র-বিজ্ঞানী অ্যান্টন ব্রুন মন্তব্য করেছেন বয়স কালে কমপক্ষে বাহাত্তর ফুট লম্বা হবে জীবটি।

সামুদ্রিক বাইন, অতিকায় চিংড়ি, টিউনার সাথে আজ ভালভাবেই পরিচিত পৃথিবীর মানুষ, বহুল পরিমাণে খাচ্ছেও এদেরকে। কিন্তু সাগরে এদের বিচরণ রহস্য আজও কি ভেদ করতে পেরেছে মানুষ?

সর্বকালের মানুষের জন্যে এক বিস্ময়কর রহস্য সাগর। এর নিচে

রহস্যময় সব অজানা প্রাণীর বাস। ধরতে গেলে ওদের সম্পর্কে কিছুই আমরা জানি না।

আরেকটা ব্যাপার—সাগরের নিচেও কিন্তু নদী আছে। আসলে সামুদ্রিক স্রোত এগুলো। গালফস্ট্রীম, কুরোসিয়ো এ ধরনের সামুদ্রিক স্রোত। এগুলো সাগরের উপরি ভাগে, কিন্তু কয়েকশো ফুট পানির তলাও বয়ে চলেছে এরকম স্রোত। মাঝে মাঝে তা ওপরেও উঠে আসে। প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরে প্রবাহিত ক্রমওয়েল কারেন্টই কয়েক বছর আগে ওপরে উঠে এসেছিল। অবশ্য পরে আবার যথাস্থানে ফিরে গিয়েছিল ওই স্রোত।

কতকগুলো নিয়ম পালন করে চলে ওই সামুদ্রিক স্রোত। ইকুয়েটর উত্তরের সামুদ্রিক স্রোতের ঘড়ির কাঁটা অনুসরণ করে অর্থাৎ বাঁ থেকে ডানে ঘুরতে ঘুরতে চলে। আর দক্ষিণের স্রোতগুলো ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে অর্থাৎ ডান থেকে বাঁয়ে ঘুরতে ঘুরতে চলে। সব স্রোতই যে এই নিয়ম পালন করে চলে তা নয়, যেমন, বেনগুয়েলা। কোন প্রকার ঘোরাঘুরির ধার ধারে না স্রোতটি, যেন কারও তোয়াক্কা নেই এমন ভাবে সোজা এগিয়ে চলেছে সামনে।

অফুরন্ত সম্পদের ডিপো হচ্ছে সাগর। কত অসীম খনিজ সম্পদ লুকিয়ে আছে সাগরের নিচে মাটির তলায় কে জানে? সেই প্রাচীন কাল থেকে সাগরে ডুবেছে অসংখ্য জাহাজ। সে সব জাহাজের ভেতর খুঁজলেও পাওয়া যাবে কোটি কোটি টাকা মূল্যের ধন রত্ন।

প্রাকৃতিক উত্থান পতনে সমুদ্রের তলায় চলে গেছে বহু প্রাচীন নগরী। সে সব নগরী খুঁজলে বেরিয়ে আসরে কত অজানা সভ্যতার ইতিহাস। কিছুদিন আগে পেরুর উপকূল থেকে একটু দূরে সাগরের এক মাইল গভীরে একটা প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষের খোঁজ পাওয়া গেছে। পানির তলায় ক্যামেরা নামিয়ে দিয়ে সে ধ্বংসাবশেষের কিছু ছবিও তোলাও সম্ভব হয়েছে।

এ ছাড়া আছে মধ্য আটলান্টিকে হারিয়ে যাওয়া সেই কিংবদন্তীর নগরী আটলান্টিস। যেখানে আটলান্টিস নিমজ্জিত আছে অনুমান করা হয়, প্রায়ই ভূমিকম্প হয় সেখানে। মাঝে মাঝে সাগরের তলায় শোনা যায় কামানের গর্জন। আজও কি সাগরের তলায় সাগর মানব হয়ে বাস করছে আটলান্টিসের অধিবাসীরা? শোনা যায় জ্ঞান-বিজ্ঞানে অত্যন্ত উন্নত ছিল সেকালের আটলান্টিসের অধিবাসীরা, হয়ত আজও বংশানুক্রমে বেঁচে আছে তারা। শিখে গেছে কি করে বাস করতে হয় সাগরের তলায়।

সাগরের কোন জায়গায় পানির রঙ নীল, কোথাও সবুজ, কোথাও কালো। কিন্তু সাদা রঙও মাঝে মাঝে দেখা যায়। মাঝে মাঝে দুধের মত সাদা হয়ে যায় গালফ স্ট্রীমের ঢেউ। না, ফেনা নয়, পানির রঙই সাদা। কেন এমন হয়? এক রকমের অতি ক্ষুদ্র সামুদ্রিক প্রাণী আছে যাদের গায়ের রঙ দুধ সাদা। এই প্রাণীর দল একটার সাথে আর একটা গায়ে গায়ে লেগে থেকে মাঝে মাঝে মাইলের পর মাইল সাগরকে দুধের সাগর বানিয়ে রাখে। গালফ স্ট্রীমের ওই সাদা পানি কিন্তু ওই পোকার সমষ্টিও নয়। তবে কি রেডিও অ্যাকটিভ পানির কণা? অ্যাটম বোমা বিস্ফোরণের ফলে অনেক সময় পানির এই অবস্থা হতে শোনা গেছে। কথাটা বিশ্বাসযোগ্যও বটে। কিন্তু অ্যাটম তো ফাটানো হচ্ছে গত কয়েক বছর ধরে। অথচ প্রায় পাঁচশো বছর আগেও কলম্বাস দেখেছিলেন এই সাদা পানি।

চোখের সামনেই এতসব রহস্য ছড়িয়ে আছে সেগুলোর সমাধান করা যাচ্ছে না। বারমুডা ট্রায়াঙ্গল রহস্যের সমাধান করবে কি, রহস্যের গোলক ধাঁধায় জট পাকিয়ে গিয়ে অনেকে বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের অস্তিত্বই স্বীকার করতে চান না। আবার কেউ কেউ স্বীকার করেন বটে কিন্তু বলেন ত্রিভুজের ভেতরই এ রহস্য সীমাবদ্ধ নেই, আসলে ওটা অর্ধবৃত্তাকার। আইভান স্যান্ডারসন বলেন উপবৃত্ত অর্থাৎ ইলিপস।

লজেন্সের আকারও হতে পারে। বারমুডা ট্রায়াঙ্গল নামটাও তাই তিনি পছন্দ করেন না। জন গডউইন এর নাম দিয়েছেন 'ভূডুসী'। এটা কিন্তু একদিক দিয়ে ঠিক। কারণ শুধু ওই ত্রিভূজের ভেতরই সব রহস্যময় ঘটনা ঘটছে না, ত্রিভূজের বাইরেও কিছু কিছু ঘটছে। ওই এলাকার জাহাজ আর বিমান নিখোঁজের জায়গাগুলোকে মানচিত্রে ফেললে দেখা যাবে পুবে সারগাসো সী, দক্ষিণে বাহামা, কিউবা, উত্তরে ভারজিনিয়া এবং পশ্চিমে আমেরিকার মূল ভূখণ্ড পর্যন্ত বিস্তারিত একটি প্রায় গোলাকার এলাকায় ঘটেছে দুর্ঘটনাগুলো।

বারমুডা এলাকায় একটা মজার কাণ্ড ঘটে, অনেকেই জানে সে কথা। সামুদ্রিক ইলেকট্রিক ঈলের নাম অনেকেই শুনেছেন। নিজেদের দেহের ভেতরই বিদ্যুৎ তৈরি করে এরা। সাগরের গভীর অন্ধকারে পথ দেখতে, শিকার ধরতে আর আত্মরক্ষা করতে এই আলো ব্যবহার করে ইলেকট্রিক ঈল। ইউরোপ আর আমেরিকা থেকে এই ঈলেরা দল বেঁধে ডিম পাড়তে যায় বারমুডা অঞ্চলে। সেই ডিম থেকে যাদের বাচ্চা হয়, বড় হয়ে বাচ্চারা দেশেও ফিরে আসে একদিন, কিন্তু যাদের বাচ্চা তারা ফেরে না। কোথায় যায় ওরা? জাহাজ বিমান আর মানুষের মত ইলেকট্রিক ঈলদেরও কি গিলে ফেলে বারমুডা ট্রায়াঙ্গল? সে রহস্য বিজ্ঞানীরা আজও সমাধান করতে পারেননি।

এই যে এতসব অদ্ভুত রহস্য ঘটছে বারমুডা ট্রায়াঙ্গল এলাকায়, তার কারণ কি কোন দিন জানা যাবে? এর রহস্য সমাধানের জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন পৃথিবীর সকল দেশের বিজ্ঞানীরা। আমরা আশা করব এ রহস্যের সমাধান একদিন হবেই।

আট

সময় বলতে আসলে কিছু নেই?

তৃতীয় নয়ন! তাও আবার মানুষের। এমন কথা শুনেছে কেউ কখনও? কিন্তু এড স্নেডেকার বলেন—আছে। ওরকম একটা তৃতীয় নয়ন আছে আমার। সে চোখ দিয়ে বারমুডা ট্রায়াঙ্গলে হারিয়ে যাওয়া লোকগুলো কোথায় আছে তা দেখতে পাই আমি। আর শুধু দেখাই নয়, ওদের সাথে কথাও হয় আমার।

আমেরিকান কানেকটিকাট স্টেটের একজন খ্যাতনামা অতীন্দ্রিয়বাদী এই এড স্নেডেকার। বারমুডা ট্রায়াঙ্গল সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'খামোকাই ভাবছ তোমরা। আসলে বারমুডা ট্রায়াঙ্গলে হারিয়ে যাওয়া লোকেরা একজনও মরেনি। সবাই বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে। বায়ুমণ্ডলে অনেক টানেল এবং ফানেল আছে। সাধারণ মানুষের চোখে সেগুলো অদৃশ্য হলেও ঠিকই দেখতে পাই আমি। হারিয়ে যাওয়া জাহাজ, বিমান সব আছে, ওগুলোর ভেতর। টর্নেডোর আকার কেমন জানো? দেখেছ? ওহ্ হো, ভুলেই গেছি, তোমরা তো আবার দেখতে পাও না ওগুলোকে। ভয়ঙ্কর টর্নেডোকে বিপুল বেগে ছুটে আসতে দেখলে দারুণ মজা পাই আমি। উত্তর থেকে প্রকাণ্ড এক ফানেল ছুটে এসে গ্রাস করে জাহাজ, বিমান, মানুষ। তাদের তুলে নিয়ে যায় দক্ষিণে, আরও দক্ষিণে সেই কুমেরুতে। বন্দী করে রাখে তাদেরকে কুমেরুর গোপন ফানেল জেলখানায়। আমাদের এই

পৃথিবীতে থাকলেও আমাদের সাথে কথা বলতে আর ফিরে আসবে না ওরা কোনদিন।'

বিশিষ্ট কোন মানুষের সাথে কথা বলেছেন কিনা জিজ্ঞেস করলে স্নেডেকার বলেন, 'বলিনি মানে? এই তো সেদিনও ব্রিটিশ রয়েল এয়ারফোর্সের একজন পাইলটের সাথে কথা হল আমার। ১৯৪৫ সালে বারমুডা ট্রায়াঙ্গল থেকে হারিয়ে গেছেন ভদ্রলোক। তখন তার বয়স ছিল পঞ্চাশ। কিন্তু কুমেরুতে নেই সে। আছে ভূ-অভ্যন্তরের একটা ফাঁকা জায়গায়। সবচে মজার ব্যাপার হল আমার মত তৃতীয় নয়নওয়ালা লোকও সেখানে আছেন। তাঁর নাম লোবসাং রামপা। বারমুডা ট্রায়াঙ্গল সম্পর্কে তাঁর সাথে কথা হয়েছে আমার।

'জানো, কি বলে রামপা? বলে, হারিয়ে যাওয়া জাহাজ, বিমান, মানুষ চলে গেছে এক অন্য পৃথিবীতে, বলতে পারো টুইন আর্থে। ওখানে আমাদের সৌরজগতের মত আর একটা সৌরজগত আছে। আমাদের পৃথিবীর কতগুলো বিশেষ অঞ্চল থেকে কোন বস্তু আকর্ষণ করে নিয়ে যাবার ক্ষমতা আছে সেই সৌরজগতের।'

ব্যাপারটার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা চাইলে স্নেডেকার বলেন, 'তা ঠিক বলতে পারব না, তবে ওটা নিয়ে জোর গবেষণা চলছে। শীঘ্রই তা জানাতে পারব তোমাদেরকে।'

কেউ কেউ বিশ্বাস করে স্নেডেকারের কথা, অভিভূতের মত মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বলে 'সত্যিকারের গুণী লোক।' কেউ হা হা করে হেসে উঠে বলে, 'ব্যাটা বদ্ধ পাগল।'

কিন্তু এসব কথা বা মন্তব্যে বারমুডা ট্রায়াঙ্গল রহস্যের কোন সমাধান হচ্ছে না। তবে একটা ব্যাপারে প্রায় সবাই একমত, ব্যাপারটা আর যাই হোক ঝড়, তুফান বা এই জাতীয় সাধারণ কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয়।

ইউ এস. নেভি কয়েকজন বিশেষজ্ঞ নিয়ে একটা কমিটি গঠন

করেছে। নাম দিয়েছে 'প্রজেক্ট ম্যাগনেট'। তড়িৎ চুম্বক, মহাকর্ষ বা নভোমন্ডলের কোন আলোড়ন এই রহস্যের স্রষ্টা কিনা পরীক্ষা করে দেখছে এই কমিটি।

পাঁচটা অ্যাভেঞ্জার বিমান নিখোঁজ হয়ে যাবার সময়ে সাগরের বুকে ভাসমান এক জাহাজের ক্যাপ্টেন দূর আকাশে বিস্ফোরিত অগ্নিপিণ্ড দেখেছিল। ওটা কি তড়িৎ চুম্বকের কারসাজি? এ বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্যে বিখ্যাত জিওফিজিসিস্ট ড. জন ক্যারিস্টুর ওপর ভার দিয়েছে ইউ. এস. নেভি। বহু পরীক্ষা নিরীক্ষার পর তথ্য দিয়েছেন ড. কারিস্টু, 'আমরা যে মহাকর্ষ শক্তির সঙ্গে পরিচিত সেই শক্তি ব্যতীত ভিন্ন প্রকৃতির ভিন্ন আর একটা মাধ্যাকর্ষ থাকতে পারে সাগরে। সাগরের ভেতরে বা ওপরে স্বতন্ত্র ভাবে কাজ করতে পারে ওই মহাকর্ষ শক্তি।'

এই ব্যাপারে অন্যান্য বিজ্ঞানীরাও তাঁর সাথে একমত। কম্পাস যারা ব্যবহার করতে জানে তাদের জানা আছে কম্পাসের কাঁটা আসলে পুরোপুরি উত্তর দিক নির্দেশ করে না। একটু পার্থক্য থাকে এবং তা জানাও আছে কম্পাস ব্যবহারকারীদের। দিক নির্ণয়ের সময় হিসেব করে সেই পার্থক্যটুকু বাদ দিয়ে আসল দিক বের করে নেয়া হয়। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের আসল উত্তর দিকই নির্দেশ করে কম্পাসের কাঁটা। ফ্লাইট নাম্বার নাইনটিন-এর পরিচালক চার্লস টেলরের কথা মনে আছে না? তিনি রেডিওযোগে কন্ট্রোল টাওয়ারকে বলেছিলেন, 'কোথায় আছি আমরা, জানি না। মনে হয় হারিয়ে গেছি। দিক নির্ণয় করতে পারছি না। সব যেন কেমন হয়ে গেছে, চেনা যাচ্ছে না। আকাশ সমুদ্র...'

এর মানে কি? কম্পাস সত্যিকার উত্তর নির্দেশ করাতেই দিক ঠিক করতে পারছিলেন না টেলর? নাকি পার্থক্য বাদ দিয়ে হিসেব করতে গিয়ে সব গুলিয়ে ফেলেছিলেন তিনি?

মাঝে মাঝে হঠাৎ করে গাঢ় কুয়াশা দেখা যায় বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের

ভেতর, আবার হঠাৎ করেই তা মিলিয়ে যায়। কেন? কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে তড়িৎ চুম্বকের কোন ক্রিয়ার ফলে ঘটে এরকম।

যতই বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের রহস্য জটিল হয়ে আসছে ততই উঠে পড়ে লাগছেন বিজ্ঞানীরা। কিছুদিন আগে একজন নৌবাহিনীর মুখপাত্র বলেছেন, 'অদ্ভুত এক রহস্য বিরাজ করছে ওই বারমুডা ট্রায়াঙ্গলে। আগে এ ব্যাপারে কেউ বিশ্বাস না করলেও এখন করে। কিছু একটা আছে ওই ত্রিভুজের ভেতর যার ব্যাখা পাওয়া যাচ্ছে না। ওই এলাকায় চোখের সামনে ঝাপসা হয়ে আসে জাহাজ বা নৌকার অবয়ব। কোন ইলেকট্রনিক জাল কি ঘিরে ফেলে ওগুলোকে? আজ না জানলেও ভবিষ্যতে আমরা ঠিকই জানব কি এর কারণ।'

১৯৫০ সালে ক্যানাডিয়ান সরকারের নির্দেশে চুম্বক এবং মহাকর্ষ নিয়ে গবেষণা করছিলেন উইলবার বি স্মিথ নামে একজন ইলেকট্রনিক বিজ্ঞানী। এই সময়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেন তিনি। রিডিউসড বাইন্ডিং নামে এক প্রকার বায়ুমণ্ডলের ক্ষেত্র আবিষ্কার করেন তিনি। এক একটি রিডিউসড বাইন্ডিং ক্ষেত্রের ব্যাস এক হাজার ফুট এবং উচ্চতা অসীম। সঞ্চরণশীল ওই ক্ষেত্রগুলো প্রায়ই জায়গা পরিবর্তন করে। স্মিথ লক্ষ্য করেছেন যেখানেই রহস্যজনক বিমান দুর্ঘটনা ঘটেছে সেখানেই দেখা গেছে রিডিউসড বাইন্ডিং। কিন্তু কোন ডিজাইনের বিমানের ওপরই কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না এ[illegible]করে বিমানের যাত্রী বা অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রীর ওপর। রিডিউসড বাইন্ডিং এর প্রভাবে বিকল হয়ে যায় কম্পাস, রেডিও। চাপ সৃষ্টি করে মানুষের মস্তিষ্কের স্নায়ুতে, ঝিম ঝিম করতে থাকে মাথা, লোপ পায় বুদ্ধি শক্তি। বিজ্ঞানী স্মিথের আবিষ্কারটি নিঃসন্দেহে মূল্যবান।

পৃথিবী বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন কিন্তু অন্য কথা বলেন। দৈর্ঘ, প্রস্থ আর বেধ এই তিনটে ডাইমেনশন আছে বলেই জানি আমরা। আইনস্টাইন বলেছেন চতুর্থ আর একটা ডাইমেনশন কিন্তু আছে. এব

নাম কাল, অর্থাৎ সময়। এখন আলোচনা করা যাক কোন বস্তু বা প্রাণী হারিয়ে যাবার ব্যাপারে কিভাবে কাজ করে সময়।

১৯৬১ সালের এক রৌদ্রকরোজ্জ্বল সকালে বিমান নিয়ে ওহিও স্টেটের আকাশে উড়ল একজন পাইলট। আকাশের এখানে সেখানে ভেসে বেড়াচ্ছে হালকা সাদা মেঘ। সেই মেঘের ওপাশ থেকেই হঠাৎ বেরিয়ে এল ওটা কি? প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ের পুরানো একটা বাইপ্লেন! কাঠ আর ক্যাম্বিশের তৈরি ওই প্রাচীন বিমানটাকে দেখে তো আধুনিক বিমানের পাইলট অবাক। কিন্তু অবাক হয়ে বেশিক্ষণ ভাবার সময় পেল না পাইলট, সোজা তার প্লেনের দিকে ছুটে আসছে বাইপ্লেন। ধাক্কা খাবার আগেই নিজের বিমানের নাক তুলে ফেলল আধুনিক পাইলট। সাঁ করে তার নিচ দিয়ে চলে গেল বাইপ্লেনটা। গালাগাল দেবার জন্যে পেছন ফিরে চেয়েই হতভম্ব হয়ে গেল পাইলট। নেই ওটা!

হঠাৎ ভয় পেল পাইলট। আকাশে নানারকম ভৌতিক কাণ্ড ঘটে, শুনেছে সে। সাহস হারিয়ে তৎক্ষণাৎ নিচে নামতে শুরু করল পাইলট। নিচে নেমে এসে সঙ্গীদের কথাটা জানাল সে। এ কান ও কান হতে হতে সিভিল এরোনটিক বোর্ডের কানে উঠল সে কথা। নির্বিকার ভাবে পাইলটের উদ্দেশ্য মন্তব্য করল তারা, 'আকাশে ওঠার আগে মালটা একটু বেশিই টেনে ফেলেছিল ছোকরা।'

ওই পর্যন্তই। সবাই ভুলে গেল কথাটা। কিন্তু ভুলতে পারল না একজন লোক, সেই পাইলট। তাকে কেউ বিশ্বাস করেনি দেখে জেদ চেপে গেল তার, প্রমাণ করে ছাড়বে কিছু ভুল দেখেনি সে। বিভিন্ন ফ্লাইং ক্লাবে খোঁজ নিতে শুরু করল পাইলট। প্রশ্ন একটাই—কারও কাছে পঞ্চাশ বছরের পুরানো মডেলের একটা বাইপ্লেন চালু অবস্থায় আছে কি?

সবাই উত্তর দিল—নেই। হতাশ হয়ে পড়েছে পাইলট, এমন সময়

একজন গ্রাম্য ডাকপিয়নের কাছে খোঁজ পেল সে ওদিককারই কোন একটা ফার্মে একটা বহু পুরানো বাইপ্লেন আছে, তবে চালু অবস্থায় নয়।

তবু দেখতে হচ্ছে। ডাকপিয়নের কাছ থেকে ঠিকানাটা জেনে নিয়ে একজন বন্ধুসহ ছুটল পাইলট। মিছে কথা বলেনি পিয়ন। তার কথামত ফার্মের এক জায়গায় বিশাল এক রেন ট্রির নিচে পড়ে রয়েছে পুরানো একটা বাইপ্লেন। চমকে উঠল পাইলট। তার মনে হল ওটাকেই আকাশে উড়তে দেখেছিল সে। কিন্তু তা কি করে হয়? দেখেই মনে হচ্ছে গত চল্লিশ পঞ্চাশ বছরে ছোঁয়ওনি কেউ ওটাকে। তাহলে?

কাছে গিয়ে বাইপ্লেনটাকে পরীক্ষা করে দেখতে লাগল পাইলট। পাইলটের সীটে পড়ে রয়েছে একটা সেকেলে হেলমেট আর একজোড়া গগলস। বাইপ্লেনে রেখে যাওয়া পাইলটের ব্যাগ হাতড়ে লগবুকটা বের করল পাইলট। লগবুক খুলেই চমকে উঠল সে। ওতে লেখা, 'আশ্চর্য! ঝকঝকে রূপালি একটা প্লেন দেখলাম আকাশে। কিন্তু এত উন্নত মানের প্লেন কে তৈরি করল? চেহারা দেখে মনে হচ্ছে অরও পঞ্চাশ বছর পর তৈরি হওয়া উচিত ছিল ওটার। আরও আশ্চর্য, বোধহয় আমাকে ধাক্কা দিতে ছুটে এসেছিল ওই অদ্ভুত প্লেনটা, কিন্তু শেষ মুহূর্তে মত পরিবর্তন করে ওপর দিয়ে উড়ে গেল।' লেখাটা পড়ে তারিখটা দেখল পাইলট, ১৯১১ সালের একটা তারিখ।

এ কি করে সম্ভব?

কিন্তু আইনস্টাইন বলেছেন আশ্চর্যের কিছু নেই। কালের গহ্বরে মানুষ যেমন এগিয়ে যেতে পারে, তেমনি পিছিয়েও যেতে পারে। আইনস্টাইন আরও বলেছেন—পৃথিবীতে এতদিন ধরে মানুষ যত কথা বলেছে একদিন আবার সব শুনিয়ে দেয়া যাবে।

সান্টা মারিয়ার ডেকে দাঁড়িয়ে সাগর বক্ষে অদ্ভুত আলো দেখেছিলেন কলম্বাস। কারও কারও মতে সে আলো স্টার টাইগার

প্লেনের একমাত্র জীবিত ব্যক্তির। বিমান থেকে রবারের ভেলা সহ কোনরকমে সাগরে নেমে পড়েছিল ওই লোক, তারপর কোন জাহাজের উদ্দেশ্যে সিগারেট লাইটার জ্বেলে সঙ্কেত দিতে শুরু করে সে। ওই সঙ্কেত দেয়া অবস্থায়ই কালের গর্ভে পতিত হয়ে কলম্বাসের যুগে পিছিয়ে যায় সে। ওই সিগারেট লাইটারের আলোই বোধহয় দেখেছিলেন কলম্বাস।

চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গিয়ে কিছুক্ষণ পর আবার প্রতিভাত হয় এমন ঘটনাও ঘটছে বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের ভেতর। এটা কি করে হচ্ছে? বিজ্ঞানীরা বলেন—ও কিছু না, শুধু চুম্বকের কারসাজী। আসলেও বোধহয় তাই। কারণ 'ফিলাডেলফিয়া এক্সপেরিমেন্ট'-এর কথা জানা থাকলেই ব্যাপারটা তেমন রহস্যজনক মনে হবে না।

জাহাজ বা কোন প্রকার যানের ওপর প্রবল চুম্বক ক্ষেত্রের কোন প্রভাব আছে কিনা জানার জন্যে ১৯৪৩ সালে ফিলাডেলফিয়ার ল্যাবরেটরিতে ও পরে সাগরে একটা পরীক্ষা চালানো হয়, এটাই ফিলাডেলফিয়া এক্সপেরিমেন্ট নামে পরিচিত।

ল্যাবরেটরি পরীক্ষা শেষ হলে ভারজিনিয়ার নরফোক বন্দর থেকে একটা ডেস্ট্রয়ার বেছে নেয়া হল। নাবিকদেরকে ডেস্ট্রয়ারে রেখেই চালানো হল প্রবল চুম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টির ম্যাগনেটিক জেনারেটর।

একটু পরই অদ্ভুত ব্যাপার ঘটতে শুরু করল। প্রথমে ডেস্ট্রয়ারকে ঘিরে দেখা গেল একটা অস্পষ্ট নীল আলো। বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের ভেতর বিপদে পড়ে বেঁচে আসা লোকদের মুখেও একরম নীল আলোর কথা শোনা গেছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই নাবিক সহ জাহাজটাকে একেবারে আবৃত করে ফেলল সেই অস্পষ্ট নীলচে আলো। তারপরই চোখের সামনে থেকে ভোজবাজির মত অদৃশ্য হয়ে গেল জাহাজ, মানুষ সহ। জাহাজের ক্যাপ্টেনের ওপর নির্দেশ ছিল অদৃশ্য হবার পরও যেন সে জাহাজ চালাতে থাকেন তিনি। তাই করেছিলেন ক্যাপ্টেন। একটু পরই

আবার অন্য যন্ত্রের সাহায্যে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হয়েছিল নাবিক সুদ্ধ জাহাজখানিকে।

পরীক্ষা শেষ হবার পর নাকি বেশ কয়েকজন নাবিককে হাসপাতালে পাঠাতে হয়েছিল এবং তাদের মধ্যে মারাও গেছে কেউ কেউ। অবশ্য ব্যাপারটা সরকারী ভাবে স্বীকার করা হয়নি। আরও একটা মজার ব্যাপার নাকি ঘটত পরীক্ষার পর। ওই ডেস্ট্রয়ারে থাকা নাবিকদের কেউ কেউ নাকি পরে হঠাৎ করেই অদৃশ্য হয়ে গিয়ে আবার ফিরে আসত। কিছুদিন পর কোন কারণ ছাড়াই কয়েকটা বিস্ফোরণও ঘটেছিল জাহাজখানিতে।

এখন কথা হচ্ছে, বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের ভেতরও কি কোন প্রকার প্রবল চুম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয়, নাকি অন্য কোন গ্রহ থেকে আসা আমাদের চেয়ে বুদ্ধিমান লোক সৃষ্টি করে ওই চুম্বক ক্ষেত্র? অসম্ভব কিছু নয়। কারণ যখনই বারমুডা ট্রায়াঙ্গল থেকে কোন বিমান বা জাহাজ রহস্যজনকভাবে অদৃশ্য হয়ে গেছে তখনই বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের আকাশে ইউ. এফ. ও-দের আনাগোনা বেড়ে গেছে।

আইনস্টাইনের থিওরি অফ রিলেটিভিটি ছাড়াও ইউনিফায়েড ফিল্ড থিওরি নামে একটা থিওরি আছে, যার ব্যাখ্যা করতে গেলে পৃথিবীর মহাকর্ষ শক্তি, তড়িৎ-চুম্বক, দেশ-কালের রহস্য এবং চুম্বকক্ষেত্রের ব্যাপারগুলো এসে পড়ে। তাদের প্রভাবে এক ডাইমেনশন থেকে অন্য ডাইমেনশনে চলে যেতে পারে মানুষ। বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের ভেতরে এই মহাকর্ষ শক্তি এবং তড়িৎ চুম্বক সক্রিয়। মাঝে মাঝে এঁদের প্রকোপ অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে যায়, আর তখনই দেখা যায় ইউ. এফ. ও-দের। কেন?

ড. ম্যানসন ভ্যালেনটাইন নামে একজন প্রাণীতত্ত্ববিদ, পুরাতত্ত্ববিদ এবং সমুদ্র বিজ্ঞানী, যিনি বহুদিন ধরে বারমুডা মিয়ামি বাহামা এবং আশেপাশের অন্যান্য দ্বীপ থেকে বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের ওপর কড়া নজর

রেখে আসছেন। টাইম-রহস্য নিয়েও গবেষণা করছেন তিনি, গবেষণা করছেন বাহামা অঞ্চলের সাগর গর্ভে নিমজ্জিত প্রাচীন শহরগুলো সম্পর্কে। তিনি বলেন বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের অদ্ভুত ঘটনাগুলোর মূলে রয়েছে ইউ. এফ. ও-রা, এবং চুম্বকের কারসাজি করেই তা ঘটাচ্ছে ইউ. এফ. ও-র দল। ইউ. এফ. ও যাদের দ্বারা পরিচালিত সেই অতি বুদ্ধিমান জীবেরা পৃথিবী থেকে নমুনা সংগ্রহ করছে। কিন্তু একটা কথা, তারা বিশেষ করে বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের ভেতরেই বার বার আসছে কেন?

বিশিষ্ট লেখক জন ওয়ালেস স্পেন্সারের মতে এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং-এর সমান গ্রহান্তরের বিশাল সব স্পেস শিপ নিয়মিত পৃথিবীতে এসে পরীক্ষা করে দেখার জন্যে নমুনা সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। বারমুডা ট্রায়াঙ্গল ওদের 'কালেকটিং বেসিন' বা 'সংগ্রহ পাত্র'।

ইউ. এফ. ও-দের নিয়ে এত যে আলোচনা সমালোচনা হচ্ছে, তার ভেতর সত্যতা কিছু আছে কি? মন্তব্য করার আগে ইউ. এফ. ও-দের সম্পর্কে আমাদের কিছু জেনে নেয়া উচিত।

নয়

এই আছে এই নেই! ওরা কারা?

১৯৬৫ সালের ৮ জুন একটা C-119. বক্সকার বিমান দশজন সৈনিক সহ রহস্যজনকভাবে বারমুডা ট্রায়াঙ্গলে এসে হারিয়ে যায়। পরে একলক্ষ বর্গ মাইল এলাকা পর্যন্ত তল্লাশি চালিয়েও প্লেনখানির কোন হদিস পাওয়া যায়নি। ১৯৭৩ সালের শেষের দিকে

ইন্টারন্যাশনাল ইউ. এফ. ও-ব্যুরোর প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে C-119 বিমানটির উল্লেখ করে বলা হয় নিশ্চয়ই কোন ফ্লাইং সসারের কবলে পড়েছিল C-119 এ কথা বলার কারণ আছে। C-119 যে সময়ে অদৃশ্য হয় সে সময় মহাশূন্য পরিক্রমা করছিল Gemini-4 নামের একটি মহাশূন্যযান, এবং বাহু বিশিষ্ট একটি উড়ন্ত বস্তু দেখেছিলেন Gemini-4-এর পরিচালক অ্যাস্ট্রোনট জেমস ম্যাকডেভিড। সহ-পরিচালক এড হোয়াইটও দেখেছিলেন বস্তুটিকে। অদ্ভুত বাহু বিশিষ্ট ওই রহস্যজনক বস্তুটি কিন্তু উড়ছিল ক্যারিবিয়ান সাগর অর্থাৎ বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের ওপর।

C-119 বক্সকার বিমানের রহস্য উদঘাটনের জন্যে মি. কুসচে ম্যাক ডেভিডকে একটা চিঠি লিখেছিলেন। সে চিঠির উত্তরে ম্যাকডেভিড লিখেছিলেন, 'In reply to your letter of January 22, I would like to say that during my flight of Gemini-4 I did indeed see what some people could call a UFO. I think it is important to realize that the letters UFO stand for Unidentified Flying Object.

The object which I saw remains unidentifed. This does not mean that is, therfore, a spacecraft from some remot planet in the universe. It also doesn't mean that it isn't such a spacecraft it only means that I saw something in flight which neither I nor anyone else was ever able to identify.

আন আইডেন্টিফায়েড ফ্লাইং অবজেক্ট কি? আকাশে উড়ন্ত যান্ত্রিক কোন বস্তু যাকে সনাক্ত করা যায়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রথম যখন এগুলোকে দেখা গিয়েছিল তখন নাম দেয়া হয়েছিল ফ্লাইং সসার।

পিরিচের মত দেখাত বলেই ওই নামে অভিহিত করা হয়েছিল ওগুলোকে। ১৯৪৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই প্রথম ফ্লাইং সসার দেখা গিয়েছিল বলে দাবি করা হয়।

এরপর হাজার হাজার এই উড়ন্ত বস্তু বিভিন্ন দেশের আকাশে বিভিন্ন সময় উড়তে দেখা গেছে। শুধু ১৯৬৬ সালেই নাকি দেখা গেছে দশ হাজার বার। যুক্তরাষ্ট্রের এবং অন্যান্য দেশের লক্ষ লক্ষ লোক দেখেছে এই বস্তুগুলিকে, তাদের ভেতর আছেন বহু খ্যাতনামা জ্যোতির্বিদ ও বিজ্ঞানী।

কখনও কখনও বিমানকে অনুসরণ করেছে ওরা, বাধার সৃষ্টি করেছে এমন কি ধ্বংসও করেছে। ক্যামেরায় ছবিও তোলা হয়েছে ওদের। কখনও একা, কখনও দলবদ্ধভাবে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়েছে ওরা ওয়াশিংটন আর রোমের আকাশে। কি ওগুলো? মার্কিন এয়ার ফোর্স কিন্তু সরকারী ভাবে এদেরকে স্বীকার করে না। বলে দৃষ্টি বিভ্রম। ফটো তোলা হল কিসের জিজ্ঞেস করা হলে এড়িয়ে যায় ওরা। অথচ ইউ. এফ. ও-এর সম্মুখীন হলে কি করতে হবে তা AFR 8017 নম্বর নির্দেশনামা বলে দিয়েছে এয়ারফোর্স। কোন ইউ. এফ. ও বৈমানিকদের নজরে এলে সেটার কোন আক্রমণাত্মক মতলব আছে কিনা লক্ষ্য করতে বলা হয়েছে বৈমানিকদের। এ ছাড়াও আরও কিছু আদেশ-উপদেশ দেয়া হয়েছে নির্দেশনামায়।

১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাস থেকে আমেরিকার লুইজিয়ানা, ওহায়ো, মিসিসিপি, মিনেসোটা, জর্জিয়া এবং ফ্লোরিডার আকাশে অসম্ভব রকম বেড়ে গেছে ইউ. এফ ও-দের আনাগোনা। বেড়ে গেছে লোকের আগ্রহ ও কৌতূহল। দেখা গেলেই এদের সংবাদ প্রচার করছে কলম্বিয়া ব্রডকাস্টিং সিস্টেম। তবে ইউ. এফ. ও-দের আনাগোনা সবচে বেড়ে গেছে বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের ভেতরে। এখানে শুধু আকাশেই নয় সাগরের বুকেও ভেসে বেড়াতে দেখা যাচ্ছে ওদের।

আমেরিকার ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন কমিটি অন এরিয়াল ফেনোমেনার সভ্য ও লিম্বো অফ দ্য লস্ট বইয়ের লেখক জন স্পেনসার বলেন, বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের ভেতরে রহস্যজনকভাবে জাহাজ, বিমান, মানুষ হারানর জন্যে ইউ এফ ও-রাই দায়ী। না হলে সমুদ্র উপকূল থেকে মাত্র পঞ্চাশ মাইল দূরে থেকে পাঁচশো পঁচাত্তর ফুট দীর্ঘ একটা জাহাজ বা ল্যান্ড করতে উদ্যত এক ঝাঁক বিমান হঠাৎ গায়েব হয়ে যেতে পারে না। সোজা কথায় তুলে নিয়ে অন্য কোন গ্রহে পাঠিয়ে দেয়া হয় ওগুলোকে।

উড়ন্ত ওই বস্তুগুলোর ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে আমাদের আকাশে নতুন নয় ওরা। মাত্র বছর তিরিশেক আগে আমাদের নজরে এলেও আসলে কয়েক হাজার বছর আগে থেকেই পৃথিবীতে যাওয়া আসা শুরু করেছে ওরা।

প্রধানত দু'ধরনের ইউ এফ ও-ই বেশি দেখা গেছে পৃথিবীতে। একটা হল আশি ফুটের মত পরিধির ফ্লাইং সসার। অন্যটা বিশাল এয়ারক্র্যাফট ক্যারিয়ার জাতের। এগুলোর আকৃতি অনেকটা সিগারের মত। ইচ্ছে করলে শ'খানেক ফ্লাইং সসার এক সাথে ঢুকিয়ে রাখা যায় এগুলোর পেটের ভেতর। পৃথিবীর সাগর থেকে জাহাজ বা আকাশ থেকে বিমান তুলে নিয়ে এদের পেটের ভেতর সহজেই লুকিয়ে ফেলা যাবে।

কিন্তু বিশেষ করে বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের ওপর ওদের নজর কেন? এর জবাবে স্পেনসার বলেন—এই এলাকায় জাহাজ, বিমান এবং ভ্রমণকারীর সংখ্যা পৃথিবীর অন্যান্য অংশের তুলনায় বেশি বলে এখান থেকে আকাঙ্ক্ষিত নমুনা সংগ্রহ করে সহজেই নিয়ে যেতে পারে ইউ এফ ও-রা। স্পেনসার আরও বলেন—ওই সব বিদেশী গ্রহের অধিবাসীরা কোন বিশেষ মাপের রেডিও ওয়েভ ইথারে ছড়িয়ে দিয়ে বিকল করে দেয় জাহাজ বা বিমানের সমস্ত বৈদ্যুতিক কলকব্জা।

নিজেদের নিয়েই তখন ব্যস্ত হয়ে পড়ে জাহাজ বা বিমানগুলো, সেই সুযোগে কাজ হাসিল করে ওরা।

পৃথিবী থেকে জাহাজ বা বিমান ধরে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে বিশেষজ্ঞরা বলেন—সৌরজগতের অন্যান্য অনেক গ্রহের সভ্যতা আমাদেরকে ছাড়িয়ে গেছে, বিজ্ঞানে আমাদের থেকে হয়ত হাজার হাজার বছর এগিয়ে রয়েছে ওরা। গ্রহান্তরের সভ্যতা ও বিজ্ঞানের মূল্যায়নের জন্যেই বিভিন্ন গ্রহে খোঁজ নিচ্ছে ওরা, আর এভাবে খোঁজ নিতে নিতেই এসে পড়েছে আমাদের পৃথিবীতে!

আবার কোন কোন বিশেষজ্ঞ বলেন—আসলে গ্রহান্তরের জীবেরা পৃথিবীর লোকেদের পারমাণবিক ক্ষমতা অর্জন করতে দেখে নিজেদের বিপন্ন বোধ করছে। সেই কারণেই পৃথিবী থেকে নমুনা সংগ্রহ করে নিয়ে তাদের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখছে সত্যিই নিজেদের বিপন্ন বোধ করার মত শক্তি ভিন্-গ্রহ পৃথিবী সংগ্রহ করেছে কিনা।

এ তো গেল বর্তমান জামানার কথা। প্রাচীন কালেও পৃথিবীতে আসত ইউ এফ ও-রা। তার বহু প্রমাণ পাওয়া গেছে। পৃথিবীর অনেক ধর্মের লোকেরা দেবতায় বিশ্বাসী। সেই সব ধর্মের লোকেরা বলে স্বর্গীয় রথে চড়ে স্বর্গ থেকে মাটির পৃথিবীতে নেমে আসত দেবতারা। সত্যিই কি দেবতা বলে কিছু ছিল? বোধহয়, প্রাচীন কালে পৃথিবীর লোকেরা যাদের দেবতা বলে বিশ্বাস করত তারা ছিল অন্য গ্রহের জীব। ফ্লাইং সসারে চেপে পৃথিবীতে নেমে আসত ওরা। আর ওই অদ্ভুত যান দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যেত পৃথিবীর লোক।

বহু প্রাচীন গ্রন্থ আর কাব্যে দেবতাদের উল্লেখ আছে। প্রাচীন ব্যাবিলনের মহাকাব্য 'গিলগামেশ' এর নায়ক এটনাকে পৃথিবী থেকে মহাশূন্যে তুলে নিয়ে আবার নামিয়ে দিয়ে গিয়েছে দেবতারা। এত উর্ধ্বে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এটনাকে যে মাটিকে তার রঙিন পায়েসের মত মনে হয়েছিল আর মহাসমুদ্রকে পাত্রে রাখা নীল পানির মত।

বাইবেলের অন্তর্ভূক্ত বুক অফ এজেকিয়েলে লেখা আছে, খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে একটা অগ্নিপিণ্ডকে পৃথিবীতে অবতরণ করতে দেখেছিল এজেকিয়েল, যার ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছিল চারটি অদ্ভুত জীব। জার্মান রকেট ইঞ্জিনিয়ার যোসেফ ব্লু মরিচের জার্মান ভাষায় লেখা বইয়ের ইংরেজি অনুবাদ, 'দ্য স্পেস শিপ অফ এজেকিয়েল' বাইবেলের অন্তর্ভূক্ত সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই লেখা হয়েছে। ব্লু মরিচ লিখেছেন, অগ্নিপিণ্ডটি আসলে একটি স্পেস শিপ এবং চারটি অদ্ভুত জীব হল স্পেস স্যুট পরা ভিনগ্রহের মানুষ।

খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় সোয়া তিনশো বছর আগে ভারতে আসার সময় জ্যাকসাবটেস নদীর ধারে দাঁড়িয়ে আকাশে চকচকে রূপালি ঢাল দেখতে পেয়েছিলেন আলেকজান্ডার ও তাঁর সৈন্য দল। আলেকজান্ডারের পাশে তাঁর গুরু অ্যারিস্টটলও ছিলেন।

খ্রীষ্টপূর্ব একশো শতাব্দীতে প্লিনি তাঁর ন্যাচারাল হিস্টরির তৃতীয় খণ্ডে লিখে গেছেন, লুসিয়াস ভ্যালেরিয়াস এবং গেইয়াস ভ্যালেরিয়াসের কনসালশিপের সময় একদিন সূর্যাস্তের একটু আগে একটা জ্বলন্ত ঢাল পুব থেকে পশ্চিমের আকাশে দ্রুত বেগে উড়ে যেতে দেখা গিয়েছিল।

প্রাচীন কালে আকাশে 'আকুয়াটিল' নামের জ্বলন্ত ভূত দেখতে পেত হাওয়াই দ্বীপবাসীরা। মিশরের অষ্টাদশ রাজবংশের ফারাও তৃতীয় টুথমোজও এক ঐতিহাসিক বিবরণী রেখে গেছেন। ভ্যাটিক্যানের মিশরীয় যাদুঘরে রাখা আছে টুথমোজের সেই বিবরণী। এ পর্যন্ত পাওয়া ইউ এফ ও সংক্রান্ত বিবরণীর মধ্যে এইটিই সবচে প্রাচীন। প্রাণভবনের লিপিকারের লেখা বিবরণীর বাংলা করলে বিষয়বস্তু দাঁড়ায়ঃ 'দ্বাবিংশতি বৎসরের শীতের তৃতীয় মাস, দিবসের ষষ্ঠ ঘণ্টা। হঠাৎ অগ্নিগোলকটাকে আকাশ থেকে ঘুরতে ঘুরতে নেমে আসতে দেখলাম। এক রড লম্বা এবং এক রড চওড়া দেহের অধিকারী বস্তুটা মাটিতে নেমে এসে নিজের পেটের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াল। ছুটে গিয়ে

সংবাদ দিলাম ফারাওকে। এই রহস্যময় অগ্নিগোলককে নিয়ে তখন গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলেন ফারাও। গত কদিন থেকেই আকাশে সূর্যের চেয়ে উজ্জ্বল এবং স্বর্গের সীমা অতিক্রমকারী ওই অদ্ভুত বস্তুগুলোর সংখ্যা বেড়ে চলেছে।

'মাটিতে নামা অদ্ভুত বস্তুটাকে দেখলেন ফারাও, তাঁর সৈন্যরাও দেখল। সন্ধ্যা ভোজনের পর মাটি থেকে ওপরে উঠে গেল অগ্নিগোলকটা, উড়তে উড়তে মিলিয়ে গেল দক্ষিণ আকাশে।

'ধূপ জ্বালবার আদেশ দিলেন ফারাও। এতে শান্তি বিঘ্নিত হবে না, আর ঘটনাটি স্মরণীয় করে রাখার জন্যে প্রাণভবনের বিবরণীতে তা লিখে রাখার আদেশ দিলেন আমাকে।'

এরপর কেটে যেতে থাকল দিন। ক্রমশ বিজ্ঞানের উন্নতি হতে থাকল। ওদিকে মাঝে মাঝেই পৃথিবীর আকাশে উড়ে আসে ওই রহস্যময় অজানা বস্তু, আবার চলে যায়। নিজেদের তৈরি যান বা জিনিসের সাথে তুলনা করে ওদের নামকরণ করতে থাকে মানুষ। কেউ বলে জ্বলন্ত জাহাজ। কেউ বলে জ্বলন্ত বেলুন। তবে আকাশে ওড়া ছাড়া বেলুনের সাথে তার কোন মিল নেই। কাপড়ের কলের মাকু আবিষ্কৃত হবার পর কেউ বলল ঘূর্ণায়মান জ্বলন্ত মাকু দেখা গেছে আকাশে।

পাল তোলা জাহাজের দিন শেষ হয়ে এল বাষ্পীয় ইঞ্জিনের যুগ। কালক্রমে তাও শেষ হয়ে এল বৈদ্যুতিক ইঞ্জিন। আর বর্তমানে এটমিক ইঞ্জিনের যুগ। এতদিনে রহস্যময় উড়ন্ত বস্তুদেরও পরিবর্তন হয়েছে, উন্নতি হয়েছে তাদেরও। প্রাচীন কাল থেকেই পৃথিবীর মানুষ সম্পর্কে খোঁজ খবর করছে ওরা। আজও করছে, তবে ভিন্ন পদ্ধতিতে। তখনকার বোদত বিশ্বাসী মানুষদের সহজেই অভিভূত করে ফেলতে পারত ওরা, তাই সামনাসামনিই ধরে নিয়ে যেতে পারত। কিন্তু আজকাল আর তা পারে না বলেই ধরে নিয়ে যায় কৌশলে। আরও

অনেক ঘটন-অঘটন ঘটাচ্ছে ওই উড়ন্ত বস্তুগুলো।

সাইবেরিয়ার বৈকাল হ্রদের কাছে ইনেসি নদী বরাবর উল্কাপাতের ফলে প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণ ঘটে ১৯০৮ সালের ৩০ জুন। এতে সাংঘাতিক দাবানলের সৃষ্টি হয়, পুড়ে যায় অরণ্যের অসংখ্যা গাছপালা, মারা যায় লক্ষ লক্ষ প্রাণী।

ইউ. এফ. ও পর্যবেক্ষক ফ্রাংক এডওয়ার্ডস বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের লেখক আলেকজান্ডার ক্যাটজিনেভের কথা উল্লেখ করে বলেছেন—সাইবেরিয়ার ওই বিস্ফোরণ মোটেই উল্কাপাতের ফলে ঘটেনি। আসলে অন্য গ্রহ থেকে আসা কোন পারমাণবিক স্পেস শিপ বিস্ফোরণের ফলেই ঘটেছিল ঘটনাটা। পারমাণবিক বোমা বা যন্ত্র বিস্ফোরণের ফলে যে ধ্বংসলীলা দেখা যায় তার সাথে সাইবেরিয়ার ওই ঘটনার আশ্চর্য মিল আছে, এমনকি রেডিও অ্যাকটিভ লক্ষণ পর্যন্ত।

ইউ. এফ. ও-র অভিজ্ঞ পর্যবেক্ষক, চাঁদ বিশেষজ্ঞ ও বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ এম. কে. জেসাপ 'দ্য কেস ফর দ্য ইউ এফ ওজ' নামে একখানি সাড়া জাগানো বই লিখে গেছেন। এতে বারমুডা ট্রায়াঙ্গল বা পৃথিবীর অন্যান্য এলাকায় যে রহস্যময় ঘটনা ঘটেছে, যেমন 'ফ্রেয়া', 'মেরি সিলেস্ট', 'এলেন অস্টিন' এদের সম্পর্কে যে যাই ব্যাখ্যা করে থাকুক না কেন, তিনি বলেন আসলে এ সব ঘটনার সাথে ইউ. এফ. ও-র কাণ্ডকারখানা ওতপ্রোত ভাবে জড়িত।

এখানে 'সী-বার্ড' নামে একটা জাহাজের উল্লেখ করা যাক। ১৮৫০ সালের কোন একদিন আমেরিকার উত্তরে রোড আইল্যান্ডের নিউপোর্ট বন্দরে চলেছিল জাহাজখানা। বন্দরে পৌছার মাত্র দু'মাইল দূরে একটা মাছ ধরা ট্রলারের সাথে শেষ দেখা হয় সী-বার্ডের, কোনদিন আর বন্দরে পৌছল না জাহাজটা। খুঁজতে খুঁজতে বন্দরের কাছেই একটা বালির চড়ার ওপর জাহাজ পড়ে থাকার ছাপ দেখা গেল। মাপ জোক করে দেখার পর অনুমান করা হল ছাপটা সী-বার্ডেরই। বালির চড়ায়

উঠল কি করে জাহাজটা? তারপর গেল কোথায়? নাবিকরাই বা কোথায় গেল?

এ প্রশ্নের জবাবে জেসাপ লিখেছেন বাইরে থেকে আসা কোন প্রচণ্ড শক্তি কোন রহস্যময় কারণে পানি থেকে তুলে এনে বালির চড়ায় রেখেছিল সী-বার্ডকে। পরে নাবিক সহ জাহাজখানাকে তুলে নিয়ে চলে গেছে।

আরও একটা কথা বলেছেন জেসাপ। মহাকাশচারী অজানা বস্তুরা আমাদের মহাকাশ অভিযান সম্বন্ধে আগ্রহী। ফ্লোরিডার কেপ কেনেডি, যেখান থেকে মহাশূন্যে রকেট ছাড়া হয় তার কাছাকাছি আকাশে প্রায়ই দেখা যায়, ইউ. এফ. ও-দের।

১৯৬৪ সালের ১০ জানুয়ারির একটি ঘটনা। পোলারিস মিসাইল ছোঁড়া হবে কেপ কেনেডি থেকে। ছোঁড়ার সময় ঘনিয়ে এসেছে এমন সময় রাডারের পর্দায় ভেসে উঠল একটা ইউ. এফ. ও। যেদিকে মিসাইলের পথ নির্দিষ্ট করা হয়েছে সেদিকেই এগিয়ে চলেছে অজানা যানটা। প্রায় চোদ্দ মিনিট পর্যন্ত রাডারের পর্দায় দেখা গেল যানটিকে।

১৯৫৯ সালের ২০ এপ্রিল মিয়ামিতে থাকাকালীন রহস্যজনক ভাবে মারা যান জেসাপ। ২০ এপ্রিল সকাল বেলা জেসাপের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ড. ম্যানসন ভ্যালেনটাইন ডিনারে আমন্ত্রণ করেন তাঁকে, কিন্তু নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারেননি জেসাপ। জেসাপের বাড়িতে খোঁজ নিয়ে জানা গেল সেইদিন বিকেলেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছেন তিনি।

কোথায় গেলেন জেসাপ? খুঁজতে শুরু করলেন ভ্যালেনটাইন। ২৯ এপ্রিল ডেড কাউন্টি পার্কে পাওয়া গেল জেসাপকে, তাঁর স্টেশন ওয়াগনের ভেতর। গাড়ির চারদিকের কাঁচ তুলে দিয়ে ভেতরে শুয়ে আছেন জেসাপ। একা এবং মৃত। তদন্ত করে দেখা গেল গাড়ির একজস্ট পাইপের সাথে আলাদা একটা পাইপ যুক্ত করে গাড়ির ভেতরে টেনে আনা হয়েছে ধোঁয়া। লাশ ময়না তদন্ত করে জানা গেল কার্বন

মনক্সাইডের প্রভাবে মারা গেছেন জেসাপ। কারও মতে স্রেফ আত্মহত্যা। কিন্তু কেউ কেউ বলে খুন করা হয়েছে জেসাপকে। হয়ত ইউ. এফ. ও-সম্পর্কে এমন কিছু জেনে ফেলেছিলেন জেসাপ যা কোন মহলের অসুবিধে সৃষ্টি করছিল।

মৃত্যুর আগে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে গেছেন জেসাপ—বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের মধ্যে ইউ. এফ. ও-সংক্রান্ত অনেক ঘটনা চেপে যাচ্ছেন সরকার, যার ফলে তাদের সম্পর্কে অনেক কথাই জানতে পারছে না জনসাধারণ। অনেকে সন্দেহ করেন চেপে দেয়া ঘটনাগুলো জেনে ফেলেছিলেন বলেই মরতে হয়েছে জেসাপকে।

আমাদের মহাকাশ অভিযানের ব্যাপারে ইউ. এফ. ও-রা আগ্রহী জেসাপের এ কথারও প্রমাণ পাওয়া গেছে। Gemini-4 এবং 7 তার সাক্ষ্য। এই দুটো মহাকাশ যানের পরিচালকেরাই দেখেছে, মহাশূন্য তাদের রকেটের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে চলেছে একটি ইউ. এফ. ও। পরে দিক পরিবর্তন করে সেটা চলে গেছে অন্যদিকে।

অ্যাপোলো-১২ যখন চাঁদে নামতে চলেছে তখনও তার আশেপাশে ছিল ইউ. এফ. ও-রা। মহাশূন্যে তখন এক লক্ষ বত্রিশ হাজার মাইল অতিক্রম করছে অ্যাপোলো-১২, এমন সময় মহাকাশচারীরা দেখল দুটো ইউ. এফ. ও-ও উড়ে চলেছে ওদের সাথে। অ্যাপোলো-১২-র সামনে থেকে একটা এবং পেছনে থেকে একটা ইউ. এফ. ও যেন পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে রকেটটাকে। সাথে সাথেই অ্যাপোলো-১২ থেকে পৃথিবীতে হিউস্টন কম্যান্ড সেন্টারে ইউ. এফ. ও-র খবর পাঠাল অ্যাস্ট্রোনট গর্ডন। কম্যান্ড সেন্টার এবং অ্যাপোলো-১২-র ওপর নজর রাখা ইউরোপের অন্যান্য মান মন্দিরগুলোর সব কটিই ইউ. এফ. ও. দুটোকে দেখতে পেয়েছিল।

পৃথিবীর সাগরেও দেখা গেছে ইউ. এফ. ও -দের। ১৯৭৩ সালের এপ্রিলে একটা অদ্ভুত সাবমেরিনকে বারমুডা অঞ্চলের সাগরে দুই

দুইবার দেখেছিলেন ক্যাপ্টেন ড্যান ডেলমনিকো। ওটার সাথে পৃথিবীর কোন সাবমেরিনেরই কোন মিল নেই। প্রখর দৃষ্টি-শক্তি, ঠাণ্ডা মস্তিষ্ক আর অভিজ্ঞ নাবিক হিসেবে নাবিক মহলে খ্যাতি আছে ক্যাপ্টেন ডেলমনিকোর। বাজে গালগল্প করার লোক নন তিনি।

দু'বারই বিকেল চারটের দিকে ওই অদ্ভুত সাবমেরিন দেখেছেন ডেলমনিকো। দু'বারই আকাশ পরিষ্কার আর সমুদ্র শান্ত ছিল। বিমিনির উত্তরে গ্রেট আইজ্যাক লাইট আর মিয়ামির মাঝে প্রবাহিত গালফ স্ট্রীমের পরিষ্কার পানির নিচে সাবমেরিনটাকে দেখেছিলেন ডেলমনিকো। দেড়শো থেকে দুশো ফুট লম্বা সিগারের মত দেখতে সাবমেরিনটার দুটো মাথাই ছিল গোলাকার। ঘণ্টায় ষাট সত্তর মাইল বেগে ডেলমনিকোর জাহাজের দিকে ছুটে আসে সাদাটে ধূসর সাবমেরিনটা। জাহাজের সাথে সাবমেরিনটার ধাক্কা লাগে লাগে এমন সময় পানিতে ডুব মারে সাবমেরিন, একটু পরই আবার জাহাজের অন্য পাশ দিয়ে একবার ভেসে উঠেই ডুবে যায়। অদ্ভুত সেই সাবমেরিনের নড়াচড়ার সময় বিশেষ কোন আলোড়ন সৃষ্টি হয়নি সাগরের পানিতে। এ কেমন জলযান? সাবমেরিনটাকে আসলে একটা প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়ির মত মনে হয়েছিল ডেলমনিকোর। সাবমেরিনটার কথা বিশ্বাস করার আরও একটা কারণ রয়েছে। এর আগেও সাগরের পানিতে এ ধরনের একটা জলযান দেখা গিয়েছিল।

সোসাইটি ফর দ্য ইনভেস্টিগেশন অফ দ্য আন এক্সপ্লেইনড নামে একটি প্রতিষ্ঠান চালু হয় ১৯৬৫ সালে। এর প্রতিষ্ঠাতা হলেন আইভ্যান স্যাণ্ডারসন নামের একজন খ্যাতনামা লেখক। বারমুডা ট্রায়াঙ্গল সম্পর্কেও যথেষ্ট কৌতূহল আছে তাঁর এবং এসম্পর্কে লিখেছেনও কিছু।

তাঁর লেখা একটা ঘটনার উল্লেখ করছি। ১৯৬৩ সালে বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের দক্ষিণ সীমারেখা ঘেঁষে, অর্থাৎ পুয়েরটোরিকোর দক্ষিণ পুবে

মহড়া চলছিল মার্কিন নৌবাহিনীর। মহড়ায় অংশ গ্রহণ করেছিল একটি ডেস্ট্রয়ার, একটি সাবমেরিন ও তেরোটি অন্যান্য জাহাজ। হঠাৎ সবকটা জাহাজ আর সাবমেরিনের লোকই দেখল তাদের কাছ থেকে অল্প দূরে পানির নিচে দ্রুত গতিতে চলাচল করছে একটি গাছের গুঁড়ি। ভালমত দেখে বোঝা গেল আসলে গাছের গুঁড়ি নয়, ওটা একটা অদ্ভুত সাবমেরিন। একটা প্রপেলারও আছে সাবমেরিনটার। চারদিন ধরে মহড়া চলছিল, আর চারদিনই দেখা গিয়েছিল অদ্ভুত সাবমেরিনটাকে। কখনও কখনও সাগরের সাতাশ হাজার ফুট গভীরে পর্যন্ত নেমে যায় সাবমেরিনটা। ওই অদ্ভুত জলযানটা কাদের, কোত্থেকে এল?

আরও মজার কথা বলেছেন আইভ্যান স্যান্ডারসন। আমেরিকার কন্টিনেন্টাল শেলফে গলদা চিংড়ি তোলার জন্যে পানিতে ডুব দেয় পেশাদার ডুবুরিরা। তারা বলে, সমুদ্র পরিষ্কার থাকলে নাকি ওই এলাকার পানির তলায় বিশাল সব স্বচ্ছ সবুজ কি যেন চোখে পড়ে। কি ওগুলো? পানির নিচেও কি মানব সভ্যতা আছে? ওগুলো তাদেরই বাড়িঘর? এমনও তো হতে পারে ওই সবুজের ভেতর থেকে কোন অজানা পদ্ধতিতে তড়িৎ চুম্বক উৎপাদিত হয়ে সমুদ্রের বুকে ভাসমান জাহাজ ইত্যাদির কম্পাস, রেডিও, ব্যাটারি এক কথায় সমস্ত বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি বিকল করে দেয়, চারপাশে সৃষ্টি করে কুয়াশার আবরণ। তারপর সুযোগ বুঝে জাহাজগুলোকে টেনে নেয় সাগরের তলায়। ওই অদ্ভুত সাবমেরিন তো ওদের তৈরিও হতে পারে। এসব কথা শুনতে অবিশ্বাস্য, কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলেন আশ্চর্যের কিছুই নেই। সেই ঘোড়ায় টানা রথের যুগের লোকেরা যদি আজকে রকেট দেখত তাহলে কি অবিশ্বাস করত না?

আকাশচারী ইউ. এফ. ও-দের আলোচনায় আবার ফিরে আসা যাক। ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি আমেরিকার আকাশে এক ঝাঁক ইউ. এফ. ও. দেখা যায়। তখনও ইউ. এফ. ও. সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানত

না লোকে। আকাশে কি উড়ছে দেখার জন্যে আদেশ দেয়া হল ইউ. এস. এয়ার বেসকে। আদেশ পাওয়া মাত্র কয়েকখানা *P-15 Mustang বিমানের নেতৃত্ব নিয়ে আকাশে উঠে গেলেন ক্যাপ্টেন টমাস ম্যানটেল। সবচে আগে আগে ছুটে চলল ম্যানটেলের বিমান। নিচ থেকে দূরবীন দিয়ে যারা লক্ষ্য রাখছিল তারা দেখল হঠাৎ টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ল বিমানটা। সরকারী ভাবে এই দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে বলা হয়, বেশি উঁচুতে উঠে পড়েছিল বলে পারিপার্শ্বিকতার চাপ সইতে না পেরে ভেঙে গেছে ম্যানটেলের বিমান।

জেসাপ কিন্তু ,এ ঘটনা সম্পর্কে অন্য কথা বলে গেছেন। আইনস্টাইনের থিওরিকে সমর্থন করে তিনিও বলেন চুম্বক ক্ষেত্রের এমন শক্তি আছে যার দ্বারা কোন বস্তুকে এক ডাইমেনশন থেকে অন্য ডাইমেনশনে স্থানান্তরিত করা যায়। ইউ. এফ. ও-রা অন্য গ্রহের যান না হয়ে আমাদের গ্রহের যানও হতে পারে। হয়ত আমাদের থেকে হাজার বছর পরের মানুষের চালিত যান ওগুলো। এক ডাইমেনশন থেকে অন্য ডাইমেনশনে চলে যাবার কায়দা জানা আছে ভবিষ্যতের মানুষের। তারা আমাদের ডাইমেনশনে প্রবেশ করে এখনকার কিছু নমুনা সংগ্রহ করে আবার ফিরে যায় নিজের ডাইমেনশনে।

তিনি বলেন, ওই সব ইউ. এফ. ও-থেকেই নির্গত ক্যাথোড রশ্মি জাতীয় কোন রশ্মি বিমান দুর্ঘটনার জন্যে দায়ী। হঠাৎ শূন্যতা সৃষ্টি করতে ওস্তাদ ওই রশ্মি, আর তাতে যে প্রতিক্রিয়া হবে তাতে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে পারে বিমান।

বোধহয় ইউ. এফ. ও-দের ঝাঁকের অত্যন্ত কাছাকাছি চলে গিয়েছিল ক্যানটেলের বিমান, এবং ইউ. এফ. ও-থেকে নির্গত রশ্মির প্রভাবে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যায়। আশ্চর্যের ব্যাপার, বিমানের ভাঙা টুকরোগুলির কোনটাই হাতের মুঠোর চেয়ে বড় নয় আর প্রত্যেকটা টুকরো ঝামা ইঁটের মত ফোঁপড়া হয়ে গিয়েছিল। এ

থেকে মনে হয় বোধহয় জেসাপের কথাই সত্যি।

১৯৭১ সালের অক্টোবরে বাহামার ওপর দিয়ে একটা DC-6 বিমান চালিয়ে যাচ্ছিলেন ক্যাপ্টেন বব ব্রাশ। হঠাৎ রাডারে দেখতে পেলেন, তাঁর নিচ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে একটা কনস্টেলেশন বিমান, ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে বিপদে পড়েছে বিমানটা। ববের চোখের সামনেই কোন রহস্যময় কারণে অকস্মাৎ বিস্ফোরিত হয়ে গেল বিমানটা। সারা আকাশ ভরে গেল নীল আলোয়। স্তম্ভিত হয়ে গেলেন বব।

সে সময়ে কনস্টেলেশন বিমানটার নিচের সাগরে ভাসছিল একটা জাহাজ। বিস্ফোরিত হবার পর বিমান থেকে একটা বই ছিটকে এসে জাহাজে পড়ে। ম্যানটেলের বিমানের টুকরোগুলোর মতই ফোঁপড়া হয়ে গিয়েছিল বইটা।

ইউ. এফ. ও-দের আনাগোনার ফলে আরও অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটছে। আমেরিকার কোন কোন অঞ্চলে বিনা কারণেই বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে কারেন্ট ফেল করে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা অন্ধকার থাকে। আকাশে তখন ইউ. এফ. ও-দের আনাগোনা দেখা যায়। নীলাভ সবুজ অথবা গাঢ় নীল আলোর একটা সরলরেখা টানতে টানতে উড়ে যায় ওরা। ব্ল্যাকআউটের রাতে অ্যাটমিক-রি অ্যাক্টর সেন্টারের মাথায়ও উড়ে বেড়ায় ইউ. এফ. ও-রা। এদের উপস্থিতির ফলে মাঝে মাঝে বিকল হয়ে যায় ব্যাটারি।

'গ্রেট ব্ল্যাকআউট।' ১৯৬৫ সালে আমেরিকার উত্তর পুবে এক বিরাট এলাকা জুড়ে কারেন্ট ফেল করেছিল, তাকেই গ্রেট ব্ল্যাকআউট নামে অভিহিত করা হয়েছে। বহু চেষ্টা করেও কারেন্ট ফেলের কারণ জানা জায়নি। এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে একজন বিশেষজ্ঞ বলেছেন, The black-out caused by the failure of the north-east power grid created one of the biggest 'mystries in the history of modern civilization.'

কে জানে ইউ. এফ. ও-রাই ওই রহস্যময় পাওয়ার ফেইলিওর ঘটায় কিনা? কোন সুদূর বা অদূর ভবিষ্যতে ইউ. এফ. ও-র স্রষ্টাদের সাথে আমাদের যোগাযোগ স্থাপিত হলে হয়ত জানা যাবে এর কারণ। হয়ত জানা যাবে অন্য কোন গ্রহ থেকে আসছে ওরা, নাকি অন্য ডাইমেনশন থেকে আসছে। অন্য ডাইমেনশন থেকে আসতেই বা দোষ কি? আমাদের ডাইমেনশনের লোকেরাও তো মাঝে মাঝে অল্প সময়ের জন্যে হলেও অন্য ডাইমেনশনে চলে যায় বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। এ সম্পর্কে একটা ঘটনার কথা বলছি। খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক অ্যাডমিরাল রিচার্ড বার্ড। বিমানে করে দক্ষিণ মেরুর গভীর চুম্বক ক্ষেত্রের ওপর দিয়ে অসংখ্যবার উড়েছেন তিনি, একা। ১৯২৯ সালে ওই চুম্বক ক্ষেত্র অতিক্রম করার পর পরই একটা অদ্ভুত ব্যাপার চোখে পড়ে তাঁর। হঠাৎ যেন তাঁর চোখের সামনে থেকে একটা অস্পষ্ট আলোর পর্দা সরে যায়। পর্দাটা সরে যেতেই অবাক হয়ে দেখলেন অ্যাডমিরাল, বরফযুক্ত সবুজ ভূমির ওপর দিয়ে উড়ছেন তিনি। শুধু তাই নয় পরিষ্কার পানির হ্রদও দেখা গেল। সেই হ্রদের তীরের সবুজ-ঘাস ভূমিতে চরে বেড়াচ্ছে আদিম বাইসন এবং অন্যান্য পশু। এক জায়গায় চামড়ার পোশাক পরা কয়েকজন আদিম মানুষও চোখে পড়ল তাঁর। কয়েক মিনিট পরই তাঁর চোখের সামনে থেকে ভোজবাজির মত সে দৃশ্য সরে গেল। আবার নিচে বরফ দেখতে পেলেন তিনি। সবুজ ভূমি দেখা মাত্রই রেডিওর মাধ্যমে তা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বাইরের পৃথিবীকে জানাতে শুরু করেছিলেন অ্যাডমিরাল বার্ড। কিন্তু তখন কেউ বিশ্বাস করেনি তাঁর কথা।

পরবর্তীকালে বারমুডা ট্রায়াঙ্গল নিয়ে যারা গবেষণা করেছে বা করছে তারা কিন্তু অ্যাডমিরাল বার্ডের কথা ঠিকই বিশ্বাস করে। তারা বলে আসলে সাময়িক ভাবে অন্য ডাইমেনশনে ঢুকে পড়েছিলেন অ্যাডমিরাল বার্ড। আর সেই অস্পষ্ট আলোর পর্দা ভূ-চুম্বক প্রভাবিত

ক্ষেত্রের প্রতিক্রিয়া।

মেরু অঞ্চল বা বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের ভেতরে অতল সাগরে অথবা অজানা কোন দ্বীপে হয়ত এমন কোন তড়িৎ চুম্বক ক্ষেত্র আছে যার প্রভাবে অন্য আর একটা ডাইমেনশনের সৃষ্টি হয়েছে। সেই ডাইমেনশনের লোকেরা হয়ত ইচ্ছেমত সেখান থেকে বেরোতে এবং ফিরে যেতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে একবার ঢুকে গেলে আর বেরোতে পারে না আমাদের ডাইমেনশনের লোকেরা, অথবা তাদের বেরোতে দেয়া হয় না। এসবই কিন্তু অলীক কল্পনা নয়, এর ভেতর সত্যতাও থাকতে পারে। হয়ত অদূর বা সুদূর ভবিষ্যতে আমরা জানতে পারব সেকথা।

দশ

হারিয়ে যাওয়া কয়েকটি জাহাজ, নৌকা, বিমান।

সপ্তদশ শতাব্দীর শুরু থেকেই মানুষ সচেতন হয়ে গেল, বুঝে নিল রহস্যজনক ভাবে জাহাজ, নৌকা হারিয়ে যায় বারমুডা ট্রায়াঙ্গল এলাকার ভেতর থেকে। সেই থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত জাহাজ, নৌকা, সাবমেরিন ও বিমান কত সালে কোত্থেকে হারিয়ে গেছে তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিচে তুলে দিচ্ছি।

জলযান

১৬০৯

ঝড়ে বিধ্বস্ত জাহাজ সী ভেঞ্চার—বারমুডা দ্বীপের কাছাকাছি।

১৬০৯

সী ভেঞ্চারের রেসকিউ বোট—বারমুডা দ্বীপের কাছাকাছি।

১৭৫০

নুয়েস্ত্রা সেনোরা ডি গুয়েডালুপের তিনটে সঙ্গী জাহাজ--নর্থ ক্যারোলিনার কাছাকাছি।

১৮০০

ইউ এস. এস. পিকারিং—নিউ ক্যাসল বন্দর থেকে গুয়াডালুপ বন্দরে যাবার পথে।

১৮১২

পেট্রিয়ট—গালফ স্ট্রীমে।

১৮১৪

ইউ. এস. এস. ওয়াসপ—ক্যারিবিয়ান সাগরে।

১৮২৪

ইউ. এস. ওয়াইল্ড ক্যাট—কিউবা থেকে থম্পসন আইল্যান্ড যাবার পথে।

১৮৪৩

ইউ. এস. এস. গ্রামপাস—ফ্লোরিডার কাছে, সেন্ট অগাস্টাইন ছাড়াবার পর।

১৮৮০

ব্রিটিশ ফিগ্রেট এইচ. এম. এস. আটলান্টা—বারমুডা থেকে ইংল্যান্ড যাবার পথে।

১৯০৯

বিখ্যাত নাবিক জোশুয়া স্লোকামের ইয়ট স্প্রে—ওয়েস্ট ইন্ডিজের ভেতর দিয়ে যাবার সময়।

১৯১০

আমেরিকান নেভির টাগ বোট ইউ. এস. এস-নীনা—আমেরিকান

নরফোক নেভি ইয়ার্ড থেকে হাভানা যাবার পথে।

১৯১৮

কয়লাবাহী জাহাজ ইউ. এস. এস. সাইক্লপস—বারবেডস থেকে বাল্টিমোর যাবার পথে।

১৯২১

ইটালিয়ান জাহাজ মনটে স্যান মিচেল, ব্রিটিশ জাহাজ এসপারেঞ্জ দ্য ল্যারিনাগা, ব্রিটিশ অয়েল ট্যাংকার অটাওয়া, ব্রাজিলিয়ান জাহাজ কাবেডেলো, স্প্যানিশ জাহাজ ইয়ট, রাশিয়ান জাহাজ অ্যালবিয়ান, মালবাহী জাহাজ হিউইট, তাছাড়া কিছু ছোট ছোট জাহাজ সার্টস্কগ, স্টাইনসুনড এবং ফ্লোরিনো—বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের ভেতরের বিভিন্ন এলাকা থেকে।

১৯২৫

মালবাহী জাপানী জাহাজ রাইফুকু মারু—বাহামা দ্বীপপুঞ্জের কাছাকাছি।

১৯২৫

বিশাল মালবাহী জাহাজ এস. এস. কটোপ্যাকসি—চার্লসটন বন্দর থেকে হাভানা যাবার পথে।

১৯২৬

মালবাহী জাহাজ সুডোফকো—পোর্ট নিউ আর্ক থেকে যাত্রা করে বারমুডা ট্রায়াঙ্গলে ঢোকার পর পরই।

১৯২৬

যাত্রীবাহী জাহাজ পোর্ট নোসা—আইল অফ প্াইনস্ থেকে যাত্রার পর।

১৯৩১

মালবাহী জাহাজ স্ট্যাভাঞ্জার—বাহামা দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত ক্যাট আইল্যান্ডের দক্ষিণে।

১৯৩৮

অ্যাংগলো-অস্ট্রেলিয়ান—অ্যাজোরস দ্বীপের দক্ষিণ পশ্চিমে।

১৯৪১

মালবাহী জাহাজ প্রোটিয়াস এবং নিরিউস—সেন্ট টমাস বন্দর ছেড়ে যাবার পর।

১৯৪১

মালবাহী জাহাজ মাহুকোনা—সম্ভবত ফ্লোরিডার জ্যাকসন ভিলের ছ'শো মাইল পুবে।

১৯৪৫

ভয়েজার-২ এবং ভ্যালমোয় নামের দু'খানা শুনার জাহাজ—বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের ভেতরেই কোথাও থেকে।

১৯৪৯

ফিশিং বোট ড্রিফটউড—ফোর্ট লডারডেল থেকে বিমিনি যাবার পথে।

১৯৫৪

অয়েল ট্যাংকার সাদার্ন ডিস্ট্রিক্ট—টেকসাসের পোর্ট সালফার থেকে মেইন স্টেটের বাকপোর্ট যাবার পথে।

১৯৫৫

পঁয়ষট্টি ফুট দীর্ঘ শুনার হোম, সুইট হোম—বারমুডা থেকে অ্যান্টিগুয়া যাবার পথে।

১৯৫৬

হারভে কনোভারের সৌখিন ইয়ট রেভোনক—মিয়ামি থেকে যাত্র করে কি-ওয়েস্ট পৌছার অল্প আগে।

১৯৫৭

ফ্রেইটার সান্ড্রা—স্যাভান্না ছাড়াবার পর পরই।

১৯৬৩

মেরিন সালফার কুইন—ড্রাই টরটগাস অঞ্চলে।

১৯৬৩

স্লোবয়—কিংস্টন থেকে নর্থ ইস্টকে বন্দরে যাবার পথে।

১৯৬৫

পঁয়তাল্লিশ ফুট দীর্ঘ হাউস বোট এলগাতো—গ্রেট ইনাগুয়া এবং গ্রান্ড টুর্ক দ্বীপের মাঝামাঝি কোথাও থেকে।

১৯৬৫

এনচ্যানট্রেস—চার্লসটনের পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে।

১৯৬৭

কেবিন ক্রুজার 'উইচক্র্যাফট'—মিয়ামি ছাড়িয়ে কয়েক মাইল এগোবার পর পরই।

১৯৬৮

পারমাণবিক সাবমেরিন স্করপিয়ন—অ্যাজোরসের কাছে।

১৯৬৮

মালবাহী জাহাজ ইথাকা আইল্যান্ড—নরফোক থেকে লিভারপুল যাবার পথে।

১৯৭০

মালবাহী জাহাজ মিলটন প্যাট্রাইডিস—নিউ অরলিয়নস থেকে কেপটাউনে যাবার পথে।

১৯৭১

মালবাহী জাহাজ 'এলিজাবেথ'—হেইতি আর কিউবার মাঝে কোথাও, সম্ভবত উইন্ডওয়ার্ড প্যাসেজে।

১৯৭১

তিনশো আটত্রিশ ফুট দীর্ঘ মোটর শিপ ক্যারিব—কলম্বিয়া এবং ডোমিনিকান রিপাবলিকের মাঝামাঝি কোথাও।

১৯৭৩

বিশ হাজার টনের মালবাহী জাহাজ অ্যানিটা—নরফোক বন্দর থেকে যাত্রা করার পর জাহাজটার আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।

১৯৭৪

চুয়ান্ন ফুট দীর্ঘ ইয়ট 'সাবা ব্যাংক'—ন্যাসো থেকে মিয়ামি যাবার পথে।

বিমান

১৯৪৫

ইউ.এস.এয়ার ফোর্সের ফ্লাইট নং নাইনটিন এর পাঁচখানা অ্যাভেঞ্জার বিমান—সম্ভবত ফোর্ট লডারডেল ন্যাভাল এয়ার স্টেশনের দু'শো পঁচিশ মাইল উত্তর-পুবে।

১৯৪৫

মার্টিন মেরিনার—প্যাট্রিক এ. এফ. বি।

১৯৪৭

আমেরিকান আর্মির বিমান সুপার ফর্ট্রেস সি-৫৪—বারমুডা থেকে শ'খানেক মাইল দূরে।

১৯৪৮

ব্রিটিশ সাউথ আমেরিকান এয়ারওয়েজের ফোর ইঞ্জিন ট্যুডর ফোর বিমান স্টার টাইগার—বারমুডার শ'চারেক মাইল উত্তর পুবে।

১৯৪৯

একটি ডি. সি. থ্রি চাটার্ড বিমান—পুয়েরটোরিকো থেকে মিয়ামি যাবার পথে।

১৯৫০

ব্রিটিশ সাউথ আমেরিকান এয়ারওয়েজের বিমান স্টার এরিয়েল—বারমুডা থেকে জ্যামাইকা যাবার পথে।

১৯৫০

একটি আমেরিকান গ্লোব মাস্টার বিমান—বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের

ভেতরেই কোথাও থেকে।

১৯৫০

ক্যালিফোর্নিয়ার নিউ ট্রাইবস মিশনের একটি ডি. সি. থ্রি বিমান—ভেনিজুয়েলা থেকে মিয়ামি যাবার পথে।

১৯৫৩

একটি ব্রিটিশ ইয়র্ক ট্র্যান্সপোর্ট বিমান—জ্যামাইকা যাবার পথে।

১৯৫৪

ইউ. এস. নেভির একটি সুপার কনস্টেলেশন বিমান—বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের উত্তর দিকে কোথাও থেকে।

১৯৫৬

একটি বি-কার্গো বিমান—'টাং অফ দ্য ওশেন' এর কাছাকাছি কোথাও থেকে।

১৯৬২

ইউ. এস. এয়ারফোর্সের বিশাল তেলবাহী KB-50 ল্যাংলি এয়ারফোর্সের ভারজিনিয়া বেস থেকে বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের আকাশে উঠে মহড়া দেবার সময়।

১৯৬৩

ইউ. এস. এয়ারফোর্সের দু'খানা নতুন চার ইঞ্জিন যুক্ত KC-135 জেট স্ট্র্যাটোট্যাংকার—বারমুডার তিনশো মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে কোথাও থেকে।

১৯৬৩

একটি C-132 কার্গো মাস্টার বিমান—অ্যাজোরস যাবার পথে।

১৯৬৫

একটি C-119 এয়ারফোর্স রিজার্ভ কার্গো বিমান—হোমস্টেড এয়ারফোর্স বেস থেকে গ্র্যান্ড টুর্ক আইল্যান্ডে যাবার পথে।

১৯৬৭

একটি চেজ ওয়াই C-112 কার্গো বিমান—পাম বিচ এবং গ্র্যান্ড বাহামার মাঝামাঝি কোথাও থেকে।

১৯৬৭

একটি ডবল ইঞ্জিন অ্যাপাচি বিমান—স্যান জুয়ান এবং সেন্ট টমাসের মাঝে কোথাও থেকে।

১৯৭১

একটি এফ,ফোর ফ্যান্টম টু জেট ফাইটার বিমান—মিয়ামির পঁচাশি মাইল উত্তর পূবে কোথাও থেকে।

১৯৭২

ফ্লেমিঙ্গো এয়ার লাইন্সের একটি বিমান—বিমিনি থেকে যাত্রা করার পর বিমানটার আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।

এগুলো ছাড়াও আরও অসংখ্য জাহাজ, বোট এবং বিমান রহস্যজনকভাবে নিরুদ্দেশ হয়েছে বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের ভেতর থেকে। বহু খোঁজ করেও এদের কোন হদিস বের করা যায়নি। কি এর রহস্য কেউ বলতে পারছে না। তবে বিজ্ঞানীরা বসে নেই, পূর্ণোদ্যমে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা। আমরা আশা করব অদূর ভবিষ্যতে এ রহস্যের সমাধান খুঁজে পাবেন বিজ্ঞানীরা। হয়ত বা এ রহস্য উদঘাটনের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের এক নতুন দিগন্ত খুলে যাবে আমাদের চোখের সামনে।

এগারো

ইন্টারডাইমেনশনাল ডোর?

সদ্য মুক্তি পাওয়া আমেরিকান টিভি সিরিজ 'বিয়ন্ড দ্য বারমুডা ট্রায়াঙ্গল'-এর নায়ক ফ্রেড ম্যাকমুরারি তার প্রিয়া (ছবিতে), নায়িকা হোপ ল্যাঙকে হারিয়ে ফেলে বারমুডা ট্রায়াঙ্গল এলাকায়। পাগলের মত ল্যাঙকে খুঁজে বেড়ায় মুরারি। শেষ পর্যন্ত এক মারাত্মক ঝুঁকি নেয় সে। একটা ইয়ট নিয়ে একাকী বেরিয়ে পড়ে সাগরে, যে করেই হোক প্রিয়াকে খুঁজে বার করবেই সে। বন্ধুরা অবশ্য বাধা দিয়েছিল। বলেছিল, 'ওদিকে যাস নে, ফ্রেড। ওই রাক্ষুসে ত্রিভুজ তোকেও ঠিক গিলে নেবে।'

'না, পারবে না,' জোর গলায় বলেছে মুরারি, 'কারণ আমি আন্দাজ করে ফেলেছি দরজাটা কোথায়। কোন দিক দিয়ে ঢুকে পড়ে মানুষ, জাহাজ, বিমান। সেই দরজাটা খুঁজে বের করে ওপারে যাবই আমি।'

কয়েক দিন পর বারমুডা এলাকার সাগরে মুরারির ইয়টটাকে ভাসতে দেখা যায়, নির্জন, শূন্য। কেউ নেই জাহাজে। শূন্য ইয়টটাকে বন্দরে ফিরিয়ে নিয়ে আসে সার্চ পার্টির লোকেরা।

দর্শকরা কিন্তু এতে খুশি। ওরা বুঝতে পারে 'দরজাটা' খুঁজে পেয়েছে মুরারি। ঢুকে পড়ে চলে গেছে ওপারে। মিলতে পেরেছে তার প্রিয়ার সাথে। এই পৃথিবীতে আর ফিরতে নাই বা পারল সে। তার বাসনা তো পূর্ণ হয়েছে!

ওদেশে অতি জনপ্রিয় এই কাহিনীটা কাহিনীই। এতে সত্যের লেশমাত্র নেই, অবিশ্বাস্য কল্প-কথা। কিন্তু আসলেই কি তাই? ওপারের দরজা কি সত্যিই নেই? নাকি বিজ্ঞানীদের বহুল আলোচিত প্যারালেল ইউনিভার্সের দরজা আছে কোথাও না কোথাও? পৃথিবীর সাথে কোন না কোন পথে যোগাযোগ আছে ওই বিশ্বের? কিন্তু কোথায় সেটা?

রহস্যজনকভাবে বারমুডা ট্রায়াঙ্গল থেকে হারিয়ে যাচ্ছে মানুষ, জাহাজ; বিমান। হন্যে হয়ে এর কারণ খুঁজে ফিরছেন বিজ্ঞানীরা। শেষ পর্যন্ত কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে বেরিয়ে এসেছে সাপ। দেখা গেছে, শুধু বারমুডা এলাকাই নয়, পৃথিবীর আরও অনেক জায়গা থেকে হারাচ্ছে মানুষ। কোন হদিস নেই তাদের, কিছুতেই মীমাংসা করতে পারা যাচ্ছে না এসব রহস্যের। এসব রহস্যের সঙ্গে নাকি যোগাযোগ আছে বারমুডা রহস্যের। যে-কোন একটা রহস্যের সমাধান করতে পারলেই আপনা আপনিই মীমাংসা হয়ে যাবে অন্যগুলোর। এরকম দু'একটা রহস্য সম্পর্কে খানিক আলাপ করে নেয়া যাক। তাহলে আমরা নিজেরাই বুঝতে পারব বারমুডার সঙ্গে এর যোগসূত্র কোথায়।

পথে কোথাও না থেমে বেনিংটন থেকে সোজা সাউথ আলবানস পর্যন্ত চলে যায় ভারমন্ট কোম্পানির বাসগুলো। বেনিংটনে বাস করে জেমস ই. টেটফোর্ড, সাউথ আলবানসে আত্মীয় আছে তার। মাঝে মধ্যেই যায় ওখানে। ঘটনার দিন আত্মীয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ সেরে বেনিংটনে ফিরে আসছিল জেমস, ভারমন্ট কোম্পানির বাসেই। এই কোম্পানির বাস তার খুবই প্রিয়, সব কটা বাসের ড্রাইভার কন্ডাক্টর তার চেনা।

জেমসকে বাসে উঠতে দেখে হেসে সেলাম জানাল কন্ডাক্টর। সীটে গিয়ে বসল জেমস। হাসিমুখে এগিয়ে এসে ভাড়া নিয়ে তাকে টিকিট দিল কন্ডাক্টর। বাসে ভিড় নেই মোটেই। সব কজন যাত্রীর সবাই সবাইকে দেখতে পাচ্ছে।

বেনিংটনে বাস থামলে চেঁচিয়ে গন্তব্যস্থান জানান দিল কন্ডাক্টর।

কিন্তু কেউ নামছে না বেনিংটনে। এখানকার যাত্রী কেউ নেই? কন্ডাক্টরের মনে পড়ল, আছে। জেমস তো নামবে এখানেই। এখানকারই টিকিট কেটেছে। বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে জেমস। তাকে ডাকার জন্যে ফিরে চাইল কন্ডাক্টর। কিন্তু নিজের সীটে নেই জেমস। নেই কোন সীটেই। আসলে বাসেই নেই সে। আশ্চর্য তো! কোথায় গেল জেমস? যাত্রীদেরও কেউ নিজের সীট থেকে উঠতে দেখেনি ওকে। সাউথ আলবানস থেকে ছাড়ার পর পথে খানিকের জন্যেও বাস থামেনি কোথাও। স্বাভাবিক দ্রুতগতিতে ছুটে এসেছে বেনিংটন পর্যন্ত। তাহলে দিনদুপুরে এতগুলো লোকের চোখের সামনে থেকে গেল কোথায় লোকটা? চলন্ত বাস থেকে তো ঝাঁপ দিতে পারে না কিছুতেই। কোন কারণে আত্মহত্যার শখ চেপেছিল জেমসের? কিন্তু তা হলেও তো ঝাঁপ দিতে দেখত অন্তত একডজন লোক?

অনেক চেষ্টা করেও এরপর আর জেমসকে খুঁজে পায়নি কেউ। যেন বাতাসে মিলিয়ে গিয়েছে লোকটা!

এর চেয়েও অবাক ঘটনা ঘটেছিল আঠারোশো আশি সালের তেইশে সেপ্টেম্বর। জেমসের মত, লোকের অগোচরে নয়, একেবারে তিন তিনজন প্রাপ্ত বয়স্ক, সুস্থ মস্তিষ্ক লোকের চোখের সামনে।

নাসভাইলের কাছে টেনেসির গ্যালাটিন শহর। একটা ঘোড়া জন্মানর ফার্ম। ফার্মটার মালিক ডেভিড ল্যাঙ, বউ ছেলে মেয়ে নিয়ে ওখানেই বাস করে। মেয়ের নাম সারাহ, বয়স এগারো। ছেলের বয়স আট, নাম জর্জ। ফার্মের সামনেই একটা সুন্দর জায়গা বেছে নিয়ে সবচেয়ে ভাল ঘোড়াগুলোকে বেঁধে রাখে ডেভিড। খরিদ্দারেরা এখান থেকেই বেছে ঘোড়া পছন্দ করে কিনে নিয়ে যায়।

রোদ ঝলমলে সুন্দর সকাল। বারান্দা থেকে নেমে লম্বা লম্বা পা ফেলে বাগানে কাজ করতে চলল ডেভিড। কয়েক পা গিয়েই ছেলেমেয়ে দুটোর দিকে একবার ফিরে চাইল। কাঠের ঘোড়া আর কাঠের ছোট্ট খেলনা ওয়াগন নিয়ে খেলছে ওরা। বাচ্চা দুটো তার

দিকে চাইতেই হাসল ডেভিড। বাবার কাছে নালিশ করল জর্জ, 'বাবা, এই ঘোড়াটা না একদম পচা। কিছুতেই কথা শুনতে চাইছে না। এত করে বলছি সামনের বড়দিনের সুন্দর মখমলের একটা হাওদা কিনে দেব। তবু কিছুতেই শুনছে না। এবার এয়সা এক থাপ্পড় লাগাব না…'

'না, না, না, বাপ,' তাড়াতাড়ি বলে উঠল ডেভিড, 'ওদের সাথে অমন ব্যবহার করতে নেই। জানো না তো, ওরা কি উপকার করে মানুষের। ঘাড়ে মাথায় হাত বুলিয়ে কাজ আদায় করে নিতে হয় ওদের কাছ থেকে। একটু আদর করেই দেখো না, পা চাটবে তোমার…'

ঘোড়ার প্রতি অপরিসীম মায়া ডেভিডের। ওই জানোয়ারগুলোর প্রতি কেউ সামান্যতম বিরূপ মন্তব্য করলেও যেন একেবারে তার অন্তরে গিয়ে লাগে।

ঘুরে আবার চলতে শুরু করল ডেভিড।

স্বামীর গমন পথের দিকে তাকিয়ে আছে মিসেস ল্যাঙ। লম্বা পা ফেলে এগিয়ে যাওয়া মানুষটাকে সত্যিই ভালবাসে সে। চোখে লাগছে সকালের রোদ। কপালের ওপর হাত তুলে রোদ আড়াল করে ডেভিডকে দেখছে মিসেস ল্যাঙ।

হঠাৎ মেঠোপথ ধরে এগিয়ে আসা ঘোড়ার গাড়িটা দৃষ্টি আকর্ষণ করল মিসেস ল্যাঙ-এর। রাস্তার দুপাশে লাল ধুলোর ঝড় তুলে এগিয়ে আসছে ওটা।

আরও কাছে আসতেই গাড়ির চালককে চিনতে পারল মিসেস ল্যাঙ। তার ভাই। সঙ্গে শহরের সবচেয়ে গণ্যমান্য ব্যক্তি, জজ অগাস্ট পেক।

চেঁচিয়ে স্বামীকে ডাকল মিসেস ল্যাঙ। অতিথি নিশ্চয়ই কথা বলতে চাইবেন তার সাথে।

দেখেছিল ডেভিডও। স্ত্রী না ডাকলেও আসত সে। রওনা দিল ডেভিড।

স্বামীর দিকে তাকিয়ে আছে মিসেস ল্যাঙ। এক পা এগিয়েছে

ডেভিড। আর এক পা বাড়িয়েই স্ত্রীকে বিমূঢ় করে দিয়ে গায়েব হয়ে গেল সে। ঝকঝকে দিনের আলোয় ভোজবাজির মত চোখের পলকে স্বামীকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখে বিস্ময়ে বোবা বনে গেল মিসেস ল্যাঙ।

ডেভিডের শালার সঙ্গে কথা বলতে বলতে আসছিলেন জজ সাহেব। ডেভিডকে বাগানে কাজ করতে দেখা যাচ্ছে এখান থেকেই। ওই ঘোড়ার ব্যবসায়ীকে চেনেন তিনি, বড় ভাল মানুষ। এর আগেও এখান থেকে ঘোড়া কিনেছেন জজ সাহেব। হঠাৎ চলতে শুরু করল ডেভিড। তাকে ডাকবেন, এমন সময় দেখলেন ভোজবাজির মত অদৃশ্য হয়ে গেছে জলজ্যান্ত লোকটা।

'মাই গড!' অবাক বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলেন জজ পেক, 'গেল কোথায় ডেভিড?'

'কি বলছেন?' এবড়োখেবড়ো রাস্তায় ঘোড়া সামলাতেই ব্যস্ত ছিল ডেভিডের শালা। বোনজামাইয়ের দিকে খেয়াল ছিল না।

সীটের ওপর নড়েচড়ে বসলেন জজ পেক। বোকা বনে গেছেন একেবারে।

'বললে বিশ্বাস করবে না, এইমাত্র গায়েব হয়ে গেছেন তোমার ভগ্নীপতি। জলদি চলো, দেখি ব্যাপারটা কি?'

দ্রুত বাগানের দিকে চাইল ডেভিডের শালা। কোথাও নজর পড়ল না তার দুলাভাইকে।

তাড়াতাড়ি বাগানের ওইখানটায় গাড়ি এনে রাখল ডেভিডের শালা। লাফিয়ে নামল গাড়ি থেকে। তার সঙ্গে সঙ্গেই নামলেন জজ পেক। ছুটতে ছুটতে কাছে এসে দাঁড়াল মিসেস ল্যাঙ।

বোবা হয়ে ডেভিডের অদৃশ্য হওয়ার জায়গাটার দিকে তাকিয়ে থাকল তিনজনেই।

'এখানেই কোন গর্তেটর্তে পড়ে যাননি তো?' নীরবতা ভাঙলেন জজ।

'কোন গর্তই নেই ওখানে। তাছাড়া এভাবে গর্তে পড়ে নাকি মানুষ? এ তো ভোজবাজি, এই দেখলাম এই নেই!' কাঁদো কাঁদো গলায় প্রায় চেঁচিয়ে বলল মিসেস ল্যাঙ।

তন্ন তন্ন করে জায়গাটা খুঁজলেন জজ পেক আর ডেভিডের শালা। আশপাশে কোথাও একটা ইঁদুরের গর্তও নেই। ঝোপঝাড় তো নেই-ই। আশপাশে অনেকদূর পর্যন্ত সমান করে ছাঁটা সুন্দর সবুজ ঘাসের আস্তরণ। কোথাও সন্দেহজনক কিছু না দেখে হতাশ মনে ঘরে এসে ঢুকলেন তিনজনেই।

বিশাল একটা ঘণ্টা ঝুলিয়ে রাখা আছে ফার্ম হাউসের বারান্দায়। কোন প্রকার সাহায্য দরকার পড়লেই সাধারণত এটা বাজানো হয়। প্রাণপণে ঘণ্টা বাজাতে শুরু করল ডেভিডের শালা। সকালের সুন্দর নিস্তব্ধতা খান খান করে দিয়ে কর্কশ শব্দে বেজে চলল ঘণ্টা।

দেখতে দেখতে গাঁয়ের সব জায়গা থেকে এসে হাজির হল লোক, পাড়া প্রতিবেশীদের কেউ বাদ থাকল না।

সবারই মুখে প্রশ্ন, 'ব্যাপার কী?'

কাহিনীটা শুনতে বড়জোর মিনিট খানেক লাগল ওদের। দল বেঁধে গিয়ে বাগানে ডেভিডকে খুঁজতে শুরু করল সবাই। তারপর বাগান পেরিয়ে আশেপাশে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল। প্রত্যেকটি গাছপালার আড়াল, খানাখন্দ, ঝোপ এমনকি পাথরের আশপাশ পর্যন্ত খুঁটিয়ে দেখল লোকেরা। কিন্তু কোন চিহ্নই নেই ডেভিডের।

এরপর অন্য ফন্দি করল লোকেরা। যে জায়গা থেকে ডেভিড হারিয়েছে, সে জায়গাসহ আশেপাশের বেশ কয়েক গজ পর্যন্ত গভীরভাবে খুঁড়তে শুরু করল ওরা। কিন্তু বৃথা। পাওয়া গেল না লোকটাকে।

দুই দুইজন লোকের চোখের সামনে থেকে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল ডেভিড।

বাবাকে না দেখে কাঁদতে শুরু করেছে জর্জ। হাত দিয়ে চোখ

ডলতে ডলতে বার বার বলছে, 'বাবা, কোথায় তুমি? এতক্ষণ লুকিয়ে থাকে নাকি কেউ? আমার বুঝি কান্না পায় না? এই কান ধরছি, বাবা, ঘোড়াটাকে আর বকবো না। তুমি দেখে নিও, আর কোনদিন কিচ্ছু বলব না ওকে।'

কিন্তু ছেলের ডাকে সাড়া দিল না ডেভিড। ফিরেও এল না।

এক বছর পর। ডেভিডের হারিয়ে যাওয়ার জায়গাটুকুর আশ্চর্য পরিবর্তন লক্ষ্য করল গাঁয়ের লোকে। আশপাশের জায়গার চাইতে অনেক বড় আর অনেক গাঢ় হয়ে জন্মেছে সেখানকার ঘাস। অথচ ফার্মের ঘোড়া কিংবা অন্য কোন জানোয়ার ঘাস খেতে যায় না ওখানে। এমনকি পোকামাকড় পর্যন্ত থাকে না জায়গাটায়। পাখিগুলো উড়তে উড়তে ওই জায়গাটার কাছাকাছি এসেই মোড় নিয়ে ঘুরে যায়। কোন রহস্যজনক কারণে যেতে চায় না ওখানে। একমাত্র ব্যতিক্রম শুধু ডেভিডের ছেলেমেয়ে দুটো। ওরা ঠিকই গিয়ে ঢোকে নিষিদ্ধ এলাকায়, নির্দ্বিধায় খেলাধুলা করে।

ওখানে গেলেই বাপকে ডাকে ছেলেমেয়ে দুটো। 'বাবা, আশেপাশে কোথাও আছ তুমি?'

হঠাৎ একদিন, অগাস্টের প্রথম দিকে, বাপকে চেঁচিয়ে ডাকল সারাহ্। সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিল কেউ। ভাইবোন দুজনেই শুনল বাপের কণ্ঠস্বর। দূর থেকে আগত সাহায্যের আবেদন।

ছুটে ফার্ম হাউসে গিয়ে ঢুকল ভাইবোন। মাকে জানাল ব্যাপারটা।

মুহূর্ত দেরি না করে ছুটল মিসেস ল্যাঙ। রহস্যঘেরা জায়গাটুকুতে এসে দাঁড়িয়ে জোরে ডাকলেন স্বামীকে উদ্দেশ্য করে। সঙ্গে সঙ্গে সাড়া মিলল।

এরপরের চারদিন ছেলেমেয়েকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে জায়গাটুকুতে দাঁড়ায় মিসেস ল্যাঙ। ডাকে স্বামীকে। সাড়া মেলে রোজই। একটা জিনিস লক্ষ্য করে মিসেস ল্যাঙ। রোজই যেন একটু একটু করে দূরে সরে যাচ্ছে কণ্ঠস্বরের মালিক। ক্রমেই ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছে

সাহায্যের আবেদন। শেষ পর্যন্ত পঞ্চম দিনে ডেকে আর সাড়া পাওয়া গেল না। আর পাওয়া যায়ওনি কোনদিন।

মানুষ অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার এমন আশ্চর্য ঘটনা আরও অনেক ঘটেছে।

এরপর একজন অতি সম্মানিত ব্রিটিশ নাগরিকের অদৃশ্য হওয়ার ঘটনা বলছি।

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কয়েকটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের একটা ম্যাকমিলানস। এর কর্তা ম্যাকমিলান একজন অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয় লোক। আঠারোশো উননব্বই এর তেরোই জুলাই, গ্রীসের মাউন্ট অলিম্পাস দেখতে যান তিনি। সঙ্গে প্রিয় বন্ধু হার্ডিঞ্জ। এছাড়াও একজন লোকাল গাইডকে সাথে নিয়েছেন পথ দেখানর জন্যে।

ঘোড়ার পিঠে চেপে এগিয়ে চলেছেন তিন অভিযাত্রী। খাড়া উঠে যাওয়া দুটো চূড়ার কাছে পৌছে থেমে দাঁড়ালেন তিনজনেই। ঠিক হল সবচেয়ে উঁচু আর খাড়াই চূড়াটায় উঠবেন হার্ডিঞ্জ। অন্যটায় ম্যাকমিলান। নিচে, ঘোড়াগুলোকে পাহারা দেবে গাইড।

দড়িদড়া আর পাহাড়ে চড়ার অন্যান্য সরঞ্জাম নিয়ে উঠতে শুরু করলেন দু'বন্ধু। চূড়ায় পৌছে বন্ধুর দিকে ফিরে চাইলেন হার্ডিঞ্জ। দেখলেন তাঁর আগেই চূড়ায় পৌছে গেছেন ম্যাকমিলান। একে অন্যের উদ্দেশ্যে হাত নাড়লেন দুজনেই।

মিনিট কয়েক চূড়ায় থেকে, বিশ্রাম করে, আবার নামতে শুরু করলেন ম্যাকমিলান। নিজের জায়গায় বসে থাকলেন হার্ডিঞ্জ। চূড়া থেকে আশপাশের অপরূপ সুন্দর প্রকৃতিকে আরও অনেকক্ষণ দেখার ইচ্ছে তাঁর। কয়েক গজ নেমে গেছেন ম্যাকমিলান। বয়স হয়েছে, অথচ পাহাড়ে চড়তে যে দক্ষ তিনি তা দেখেই অনুমান করা যায়। অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন হার্ডিঞ্জ। কিন্তু হঠাৎ এ কি ঘটল? কোথায় গায়েব হয়ে গেলেন ম্যাকমিলান। বোবা হয়ে বিমূঢ়ের মত সেদিকে তাকিয়ে আছেন হার্ডিঞ্জ, মুহূর্ত আগেও তো ওখানে ছিলেন

ভদ্রলোক। গড়িয়ে পড়ে গেলেন? কিন্তু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে উপত্যকা। সেখানে ম্যাকমিলানের ছায়াও নেই। বোকার মত একটু আগে যেখানে ছিলেন ম্যাকমিলান, সেদিকে তাকিয়ে আছে গাইডও।

তড়িঘড়ি নেমে এলেন হার্ডিঞ্জ। গাইডকে নিয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন চূড়াটার আশপাশ। নেই, কোথাও কোন চিহ্ন নেই প্রকাশকের। হল কি তাঁর?

গাইডকে নিয়ে গাঁয়ে ফিরে এলেন হার্ডিঞ্জ। তারপর আরও লোক জোগাড় করে আবার ফিরে চললেন বন্ধুকে খুঁজতে।

ছোট চূড়াটায় উঠে গেল সব কজন লোক। ম্যাকমিলানের উঠে যাবার সমস্ত চিহ্ন দেখল তারা। কয়েক গজ পর্যন্ত নিচে নামার চিহ্নই দেখল। কিন্তু এরপরই আর কিছু নেই। না গড়িয়ে পড়ার চিহ্ন, না ধস্তাধস্তির। যেন ওখান থেকে কেউ তুলে নিয়ে গেছে প্রকাশককে। প্রিয় বন্ধুকে হারিয়ে ভগ্ন হৃদয়ে ফিরে এলেন হার্ডিঞ্জ। ম্যাকমিলানের কি হল জানার অনেক চেষ্টা করেছিলেন তিনি পরে, কিন্তু সব বৃথা। যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছেন প্রকাশক।

বিখ্যাত লেখক চার্লস ফোর্ট, সারাটা জীবন কাটিয়ে গেছেন শুধু অব্যাখ্যান্ত রহস্যের তথ্য সংগ্রহ করে। ডেভিড ল্যাঙ-এর অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার মতই একটা ঘটনা ছিল তাঁর রহস্য ভাণ্ডারে।

আঠারোশো পঁচাশি সাল। তেইশে এপ্রিল। এর পাঁচ বছর আগেই অদৃশ্য হয়ে গেছিল ডেভিড ল্যাঙ। এই দিনে খেতে কাজ করছিল কৃষক আইজ্যাক মার্টিন। খেতের পাশেই ফার্ম হাউসের বারান্দায় বসে ছিল তার পরিবারেরই লোক, পরিবারের সব কজন লোকের চোখের সামনে ডেভিডের মতই হাওয়ায় মিলিয়ে গেল মার্টিন।

ডেভিডের ঘটনাটা জানতেন পোর্ট। আশ্চর্য হয়ে নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করেছিলেন তিনি, 'কেউ কি কৃষক সংগ্রহ করছে নাকি?'

কিন্তু কেউ যদি কৃষক সংগ্রহ করে থাকে তো বাচ্চা ছেলেমেয়ে জোগাড় করারও বাতিক আছে তার।

আঠারোশো উনসত্তরের এক সুন্দর বিকেল। আয়ারল্যান্ডের কাউন্টি কর্কে খেলছিল তেরোজন বালক বালিকা। কোন চিহ্ন না রেখেই বেমালুম গায়েব হয়ে গেল তেরোজনই।

ইন্টার-ডাইমেনশনাল ডোরের পাল্লায় পড়ে কি গায়ের হয়ে যাচ্ছে লোকগুলো? ইন্টার-ডাইমেনশনাল ডোর হল এমন একটা দরজা, যেখান দিয়ে ঢুকে এক আজব পৃথিবীতে চলে যায় মানুষ। সেই আজব পৃথিবীটা আর কিছু না, আমাদের পৃথিবীরই মিরর ইমেজ। প্যারালেল ইউনিভার্স বলেন একে বিজ্ঞানীরা। সারাক্ষণই চলেফিরে বেড়াচ্ছে এই অদৃশ্য দরজাটা। হঠাৎ করে এর সামনে পড়লেই আপনা-আপনি ভেতরে ঢুকে যায় (বিজ্ঞানীদের ধারণা সাংঘাতিক শক্তিশালী চুম্বক ক্ষেত্র কাজ করে এখানে।) মানুষ, জীবজন্তু, জিনিসপত্র সব।

কিন্তু ডেভিড ল্যাঙ-এর ব্যাপারটা কি? এক বছর পরে আবার সাড়া দিতে পারল সে কি করে? ইন্টার-ডাইমেনশনাল ডোরের ভেতর ঢুকে গেলে নিমেষে পার্থিব জগত থেকে অনেক দূরে চলে যাওয়ার কথা না?

আরও কতকগুলো আজব আজব কাণ্ড কারখানা ঘটেছে পৃথিবীতে। যেমন উড়ন্ত পাথর। কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ কোন লোককে লক্ষ্য করে ছুটে আসে একের পর এক পাথর। এ কেমন ঘটনা?

এই পাথরের ব্যাপারটা নিয়ে অনেকদিন গবেষণা করেছিলেন বিখ্যাত ভূবিদ, জীববিদ, বিজ্ঞানী ইভান স্যান্ডারসন। উনিশশো তেষট্টির সেপ্টেম্বরের 'ফেট' ম্যাগাজিনে তাঁর একটা আর্টিকেল বেরিয়েছিল এই উড়ন্ত পাথর সম্পর্কে। তিনি লিখেছিলেন, 'কোন নিয়ম কানুন মানে না এই উড়ন্ত পাথর। ব্যাপারগুলো হল, (১) যখন তখন যে কোন দিক থেকে পাথর এসে হাজির হওয়া, (২) শূন্যে ভেসে থাকা, (৩) ওপর দিকে ছুটে যাওয়া, কিংবা মাটিতে পড়া, (৪) বন্দুকের গুলির মত কারও দিকে ছুটে আসা, ইত্যাদি। মাধ্যাকর্ষণের স্বাভাবিক সূত্র এরা মানে না। নিজের ওজনের তুলনায় যত জোরে পড়া উচিত তার

চেয়ে হয় আস্তে, কিংবা জোরে পড়ে মাটিতে।'

নিউটনের কোন সূত্রই মানে না এই উড়ন্ত পাথর। ইভান স্যান্ডারসন প্রশ্ন করেছেন, 'তাহলে কোন্ সূত্র এরা মানে?' বলাবাহুল্য এর কোন উত্তরই তিনি কারও কাছ থেকে পাননি।

উড়ন্ত পাথরের একটা কাহিনী একবার বলেছিলেন স্যান্ডারসন। তাঁর ভাষায়ই শোনা যাক কাহিনীটাঃ 'উনিশশো আটাশ সাল, সুমাত্রায় এক বন্ধুর বাড়ির দাওয়ায় বসে, বন্ধু আর বন্ধুপত্নীর সঙ্গে আলাপ করছি। সাঁঝ হয়ে এসেছে। হঠাৎ কোত্থেকে ছোট্ট একটা কালো পাথর এসে পড়ল আমার পায়ের কাছে। প্রথমে পাত্তা দিলাম না। কোন দুষ্টু ছেলে হয়ত ছুঁড়ে মেরেছে। কিন্তু তারপরেই একটা একটা করে আরও পাথর এসে পড়তে লাগল পায়ের কাছে। পড়েই গড়িয়ে চলে যাচ্ছে পাথরগুলো দেয়ালের নিচে।

'কে ছুঁড়ছে ওই পাথর?' জিজ্ঞেস করলাম বন্ধুকে। বন্ধু বলল, 'কে যে ছুঁড়ছে জানি না, অনেক খুঁজেও হদিস মেলেনি। তবে এটুকু জানি, ওই পাথর ছোঁড়াছুঁড়ি চলবে সারারাত ধরে। তবে ভয় নেই, কারও গায়ে লাগবে না। আজ পর্যন্ত লাগেনি কখনও।'

একটানা পাথর পড়ার ঠুকঠাক আওয়াজ শুনে ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন আরও আধ ডজন মেহমান। আমার মতই এঁরাও বেড়াতে এসেছেন এখানে। গৃহস্বামীর কাছে জানতে চাইলাম, কে, কেন পাথর ছুঁড়ছে এভাবে? তিনিই বা নীরব দর্শকের মত এসব বরদাস্ত করেন কেন? তাঁর কি লোকজন নেই, বা কোন ক্ষমতা নেই যে ওই দুষ্টু লোকগুলোকে ধরে আচ্ছামত ঠেঙিয়ে ওদের পাথর ছোঁড়া বন্ধ করা যায় না? ইতিমধ্যেই আরও কয়েকটা পাথর এসে পড়ছে আমাদের আশেপাশে।

আমাদের কথার জবাব না দিয়ে একটা অদ্ভুত কাণ্ড করলেন হঠাৎ গৃহস্বামী। কয়েকটা পাথর কুড়িয়ে নিয়ে তাতে সাদা চকের দাগ দিয়ে দিলেন। তারপর একটা করে দাগ দেয়া পাথর আমাদের হাতে দিয়ে,

যেদিক থেকে পাথর আসছে সেদিকে ছুঁড়ে দিতে বললেন। যতদূর সম্ভব জোরে যার যার পাথর ছুঁড়ে ফেললাম আমরা। বাগানটা বিশাল। বহুদূর পর্যন্ত সমান করে ছাঁটা ঘাসে ঢাকা লন, লনের ওপারে ঘন ঝোপঝাড়, তারপরেই গ্রীষ্মণ্ডলীয় গাছপালার ঘন জঙ্গল। গায়ের জোরে ছুঁড়েও একটা পাথরও লন পার করতে পারলাম না আমরা।

বড়জোর একটা মিনিট অপেক্ষা করতে হল আমাদের।

তারপরই আমাদের ছুঁড়ে দেয়া পাথরগুলো ফেরত আসতে থাকল আবার।

অবাক কাণ্ড! ঝোপঝাড়গুলোর এপারে তো কাউকে দেখা যাচ্ছে না। তাহলে পাথরগুলো ফেরত ছুঁড়ল কে? ভূতে নাকি?

কিন্তু ভূতপ্রেতে বিশ্বাস করেন না স্যাণ্ডারসন, করেন না কোন বিজ্ঞানীই। পাথর ছোঁড়ার অন্য একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন তিনি। নিশ্চয়ই তাঁর বন্ধুর বাগানের ওই জায়গায় মাঝে মাঝেই এসে পড়ে ইন্টার-ডাইমেনশনাল ডোর। বোধহয় অত্যন্ত শক্তিশালী কোন ম্যাগনেটিক ফিল্ড কাজ করছে ওখানে। যার আকর্ষণে ঘুরে ফিরেই ওখানে এসে পড়ছে দরজাটা। হয়ত দরজার ওপারেই আছে কেউ। মজা করার জন্যে পাথর ছুঁড়ে মারে পৃথিবীর মানুষের দিকে। কিন্তু আসলেই কি তাই? আসলেই কি আরেকটা অদৃশ্য পৃথিবী আছে আমাদেরই আশেপাশে কোথাও? ওই শক্তিশালী ম্যাগনেটিক ফিল্ড কি আছে বারমুডা এলাকায়ও? এর ফলে মাঝেমাঝেই ঘুরে ফিরে আসছে ওখানে একটা ইন্টার-ডাইমেনশনাল ডোর? যার ভেতর দিয়ে অনায়াসে ঢুকে পড়ছে মানুষ, বিমান, জাহাজ? চলে যাচ্ছে অজানা আরেক পৃথিবীতে?

প্রশ্নগুলো বার বার খুঁচিয়ে চলেছে মানুষের মনকে। কিন্তু উত্তরটা খুজে পাওয়া যাচ্ছে না কিছুতেই।

বারো

আরও অবাক ঘটনা।

বারমুডা ট্রায়াঙ্গল এলাকার ভেতরে ভূতড়ে জাহাজ ভেসে বেড়ানর কাহিনী এর আগেই বলেছি। আরও দু'একটা এমন কাহিনী শুনুন। তারপরই অন্য দিকে মোড় নেবে আমাদের বক্তব্য।

আঠারোশো পঞ্চাশ সাল। আটাশে ফেব্রুয়ারি। মাঝ আটলান্টিকের অগাধ জলরাশি ভেদ করে দ্রুত এগিয়ে চলেছে জাহাজ 'ম্যারাথোন'। হঠাৎ উত্তাল সাগরে আর একটা জাহাজ ভাসতে দেখলেন ম্যারাথোনের ক্যাপ্টেন।

বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জাহাজটার আগাগোড়া পরীক্ষা করে দেখলেন ক্যাপ্টেন। নামটাও পড়লেন, 'জেমস চেস্টার'। পালগুলো ঝুলে পড়েছে জাহাজটার, ডেকটাও কেমন যেন অগোছালো। জেমস চেস্টারের আরও কাছে গিয়ে মুখে লাউড স্পীকার লাগিয়ে চেঁচিয়ে ডাকলেন ক্যাপ্টেন, 'আহোয়, আহোয়, এনিবডি দেয়ার? (কেউ আছে?)'

কিন্তু সাড়া নেই। বার কয়েক ডেকেও সাড়া না পেয়ে নৌকা নামানর আদেশ দিলেন ক্যাপ্টেন। কয়েকজন নাবিক সহ জেমস চেস্টারে গিয়ে উঠলেন তিনি। আগাগোড়া জাহাজটাকে পরীক্ষা করে দেখা হল। কিন্তু কোথাও লোকজনের চিহ্নমাত্র নেই। অগোছালো অবস্থায় পড়ে আছে সমস্ত জিনিসপত্র, কিন্তু মারামারি বা ওই জাতীয় কোন ঘটনার কোন লক্ষণ নেই। এক ফোঁটা রক্ত পড়ে নেই জাহাজের

কোথাও, সন্দেহজনক ভাবে ডেকের কোথাও পড়ে নেই একটা অস্ত্র। অর্থাৎ ডাকাতি হয়নি জাহাজে। প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের খোঁজ করলেন ক্যাপ্টেন। আশ্চর্য! নেই ওগুলো। কম্পাসটাও নেই। তবে যথাস্থানেই আছে সবকটা লাইফবোট।

এবারে অন্য ধরনের সূত্র খুঁজতে শুরু করলেন জাহাজের ক্যাপ্টেন। জাহাজে কোন মারাত্মক রোগ মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ার লক্ষণ খুঁজতে শুরু করলেন। নেই। প্রচুর খাবার আছে জাহাজের ভাঁড়ারে। খাবার পানিও আছে যথেষ্ট। অথচ ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ উত্তাল সাগরের মাঝ থেকে সহসা কোথায় গায়েব হয়ে গেল জেমস চেস্টারের প্রত্যেকটি লোক?

আর একটা ঘটনা বলছি, আঠারোশো পঞ্চাশ সাল। হঠাৎ একদিন রোড আইল্যান্ডের অধিবাসীরা দেখলেন, বন্দরের দিকে আসছে একটা জাহাজ। সুন্দর করে তোলা আছে জাহাজের পাল, ঝির ঝিরে দক্ষিণা হাওয়ায় পত পত করে উড়ছে পতাকা। কয়েক মিনিট পরেই তীরে এসে ভিড়ল জাহাজ। লোকেরা দেখল জাহাজটার নাম 'সী-বার্ড'। জাহাজটাকে চেনে দ্বীপের অধিবাসীরা। এর কমান্ডার অতি দক্ষ একজন ক্যাপ্টেন, জন হুকস্যাম। হনুরাস থেকে আসছে সী-বার্ড, সেই দিনই চলে যাবে নিউপোর্ট। কিন্তু তীরে ভেড়ার পরেও জাহাজের ডেকে লোকজন দেখা গেল না। নোঙর নামানরও কোন লক্ষণ নেই।

দড়ির সাহায্যে জাহাজে উঠে এল কয়েকজন অতি কৌতূহলী লোক। রান্নাঘরে চুলায় গরম কফি ফুটতে দেখল ওরা, ডাইনিং টেবিলে পড়ে আছে সদ্য সরবরাহ করা নাস্তা। প্রত্যেকটা নেভিগেশনাল ইনস্ট্রুমেন্টস, চার্ট পড়ে আছে যথাস্থানে, নেই শুধু মানুষ। একজনও না। জাহাজের ডেকে শুয়ে আছে শুধু একটা কুকুর। গেল কোথায় লোকগুলো? সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হল, জাহাজটাকে দ্বীপ পর্যন্ত চালিয়ে আনল কে? তখনকার দিনে তো অটোম্যাটিক পাইলট ছিল না, যে শুধু কোর্স সেট করে দিয়ে ইঞ্জিন চালিয়ে রাখলেই তীরে ভিড়ে যাবে

জাহাজ?

খবর পেয়ে পড়িমড়ি করে ছুটে এল জাহাজ কোম্পানির লোক। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত করা হল। কিন্তু কোন সূত্র নেই। জাহাজের লোকগুলোর কোন খোঁজই পাওয়া গেল না আর।

যাবে কোথা থেকে? বারমুডা এলাকায় জাহাজ থেকে লোক গায়েব হলে আর তাকে খোঁজ পাওয়া যায় নাকি? বোধহয় আবার হতভাগ্যদের সামনে খুলে গিয়েছিল ইন্টারডাইমেনশনাল ডোর।

বারমুডা এলাকা ছাড়া অন্য জায়গা থেকেও গায়েব হয়েছে মানুষ। মেসোপটেমিয়ার ইরাকী মরুভূমিতে উনিশশো চব্বিশ সালের জুলাই মাসে ঘটেছিল এমন একটা ঘটনা। প্লেনের ইঞ্জিন খারাপ হয়ে যাওয়ায় মরুভূমিতে ক্র্যাশ ল্যান্ড করতে বাধ্য হয়েছিল দুজন ব্রিটিশ এয়ার ফোর্স পাইলট, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট ডব্লিউ. টি. ডে এবং পাইলট অফিসার ডি. আর স্টুয়ার্ট। বহু খোঁজাখুঁজি করে হাল ছেড়ে দেবে ব্রিটিশ এয়ার ফোর্স, এই সময় পরিত্যক্ত বিমানটার খোঁজ পেয়ে গেল একটা সার্চ পার্টি। ধরতে গেলে প্রায় কিছুই ক্ষতি হয়নি বিমানটার বডির। ট্যাংকে তেলও আছে প্রচুর পরিমাণে।

বিমানের পাইলটদের খুঁজতে শুরু করল সার্চ পার্টির লোকেরা। বিমানের কাছ থেকে চলে যাওয়া পায়ের ছাপগুলো পরিষ্কার চোখে পড়ে। নরম বালিতে গভীরভাবে বসে আছে দুজোড়া পায়ের ছাপ। পাশাপাশি প্রায় চল্লিশ গজ পর্যন্ত চলে গিয়ে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেছে ছাপগুলো। আশেপাশে যতদূর চোখ যায় একটা পাথর, ঝোপঝাড়, গাছপালা কিচ্ছু নেই। কোন জন্তু জানোয়ারের পায়ের ছাপও চোখে পড়ল না। পাইলট দুজনকে ধরে নিয়ে যাওয়ার কোন চিহ্নই নেই। মরে গেছে ওরা, তারও কোন প্রকার লক্ষণ দেখা গেল না। মরুভূমির ওই জায়গা থেকে যেন কেউ সরাসরি আকাশে তুলে নিয়ে গেছে দুজন পাইলটকে।

বারমুডার মত মরুভূমিগুলোতেও যেন লুকিয়ে আছে অসংখ্য

রহস্য। কোন রকম জানান না দিয়ে, চিহ্ন না রেখে কত বিমান যে হারিয়েছে আফ্রিকা আর চীনের মরুভূমিতে তার ইয়ত্তা নেই।

উনিশশো পঁয়তাল্লিশের ডিসেম্বরের চার তারিখ। সতেরোজন যাত্রী নিয়ে সাইবেরিয়ার মনরোভিয়া থেকে আকাশে উড়ল ইউ. এস. এয়ারফোর্সের একটা বিমান, গন্তব্য ব্রিটিশ ওয়েস্ট আফ্রিকার আক্রা। রুটিন ফ্লাইট এটা, গোল্ড কোস্টের ওপর দিয়ে উড়ে যেতে হবে সতেরোশো মাইল। বিমানটার কার্গো সেকশনে আছে বেশ কিছু সোনা আর রুপা। উড়বার বারো ঘন্টা পরও বিমানটা গন্তব্যস্থানে না পৌঁছুনয় আশঙ্কিত হয়ে উঠল কর্তৃপক্ষ, সার্চ পার্টি পাঠানো হল। আকাশ, মাটি, সাগর মিলে এক লাখ বারো হাজার পাঁচশো বর্গ মাইলের এক বিরাট এলাকা চষে ফেলা হল বিমানটার খোঁজে, কিন্তু বৃথাই। বিমানের ক্রুদের ইউনিফর্মের একটা বোতামও পাওয়া গেল না কোথাও।

পরবর্তী ছ'টা মাস ধরে বিমানটাকে খুঁজে পাওয়ার সব রকম চেষ্টা করল এয়ারফোর্সের লোকেরা। শেষ পর্যন্ত উনিশশো ছেচল্লিশের জুনে ওই বিমানটার নামে খোলা ফাইলের গায়ে বড় করে লাল কালি দিয়ে লিখে দিলেন কর্তৃপক্ষ 'Unsolved'। বিমান নিখোঁজের ক্ষেত্রে এটা একটা বেশ বড় ধরনের রহস্য।

লেফটেন্যান্ট অলিভার কে. মর্টন, বাড়ি, উইচিটা, কানসাস; কর্পোরাল স্যামুয়েল মেরম্যান, বাড়ি, লিনডেন, নিউজার্সি; কর্পোরাল স্যামুয়েল কে. ক্লিংক, বাড়ি, আরভিংটন, নিউজার্সি, এবং সার্জেন্ট সেইমোর জে. স্ট্যাঞ্জার, বাড়ি, নিউইয়র্ক—এরা কি অন্যান্য যাত্রীদের সহ প্লেন নিয়ে ঢুকে পড়ল রহস্যজনক সেই দরজার মধ্যে দিয়ে?

এবার আরও আশ্চর্যজনক একটা ঘটনার কথা বলছি। আঠারোশো আটান্ন সাল। স্টেশন পরিবর্তন করার জন্যে রওনা দিল ফ্রেঞ্চ কলোনিয়াল ট্রুপসের ছ'শো পঞ্চাশজনের একটা সৈন্যদল, গন্তব্য পনেরো মাইল দূরের সাইগন। কোনদিনই আর পৌঁছায়নি ওরা সেখানে। লোকগুলোর সামান্যতম চিহ্নও এর পরে আর কেউ পায়নি।

এতগুলো লোকের কাছে কম অস্ত্রশস্ত্র ছিল না। কিন্তু একটা ছোট ছুরি কিংবা একটা বুলেটের খোসাও খুঁজে পায়নি কেউ। সঙ্গের যাবতীয় সরঞ্জাম সহ যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে এতগুলো লোক।

অনুরূপ আর একটা ঘটনা ঘটেছিল উনিশশো উনচল্লিশ সালে, চীনের নানকিং-এ। শহরের একেবারে প্রান্তে অ্যামবুশ গেড়েছিল তিন হাজার চীনা সৈন্য। উদ্দেশ্য, শহর আক্রমণকারী জাপানী সৈন্যদের ঠেকিয়ে রাখা। অ্যামবুশ গাড়ার বড়জোর ঘন্টাখানেক পরেই রেডিওতে কল করে সৈন্যদের কাছ থেকে কোন সাড়া পেল না কন্ট্রোলরুম। ব্যাপার কি? তদন্ত করে দেখার জন্যে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লেন একজন চীনা কর্নেল। জায়গায় পৌঁছে একজন সৈন্যও দেখতে পেলেন না তিনি। অবাক কাণ্ড। তিন-তিন হাজার জলজ্যান্ত ট্রেনিং পাওয়া লোক কোথায় গায়েব হয়ে গেল? ট্রাইপডের ওপর খাড়া রয়েছে মেশিনগান, অন্যান্য ভারি অস্ত্রগুলোও পড়ে রয়েছে যথাস্থানে, কিন্তু রাইফেল, বেয়োনেট বা এই জাতীয় হালকা অস্ত্রগুলো গায়েব, ওগুলোর মালিকদেরও কোন চিহ্ন নেই। তিন হাজার সৈন্য আর কোন কিছু সাক্ষী প্রমাণ না রেখে এক সঙ্গে ভেগে যেতে পারে না। তাহলে? আবার সেই ইন্টার ডাইমেনশনাল ডোর?

আরেকটা অবাক ঘটনা ঘটেছে উনিশশো বেয়াল্লিশ সালে, আকাশে। ঘটনার দিন আকাশে উঠেছিল দুজন অতি অভিজ্ঞ ফ্লায়ার, একটা এল-৮ নেভি ব্লিম্পে চড়ে। ট্রেজার আইল্যান্ড থেকে দুজন যাত্রী নিয়ে আকাশে উঠল এল-৮। ওড়ার পর থেকে ওটাকে চোখে চোখে রাখল দুটো পেট্রল বোট। নেমে আসার পর দেখা গেল এল-৮-এর যাত্রী দুজন গায়েব। মাঝ আকাশেই কোথাও অদৃশ্য হয়ে গেছে ওরা। ব্লিম্প থেকে পড়ে যায়নি, এটা ঠিক। তাহলে দুটো পেট্রল বোটের অতগুলো লোকের চোখের সামনে আকাশ থেকে কোথায় হারিয়ে গেল দুই দুইজন দক্ষ মানুষ?

জাহাজের অত্যন্ত উপকারী বন্ধু লাইট হাউস। অনেক অনেক দূর

থেকে পথ দেখিয়ে জাহাজটাকে তীরে আনতে সাহায্য করে এগুলো। অথচ লাইট হাউস নিয়েও রহস্যের অন্ত নেই। এই নামটা শুনলেই কেন যেন খামোকাই সাগরের বিভিন্ন রহস্যের কথা মনে পড়ে যায় মানুষের।

সবচেয়ে বড় লাইট হাউস রহস্য ঘটেছিল বোধহয় উনিশশো সালেই, স্কটল্যান্ডের ওয়েস্ট কোস্টে, আউটার হেব্রিডসের একটা ছোট্ট পাথুরে দ্বীপে।

লুইস-এর পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত সাতটা অতি ক্ষুদ্র দ্বীপের সমষ্টি ফ্ল্যান্যান আইল্যান্ডস। আউটার হেব্রিডসের সবচেয়ে বড় দ্বীপপুঞ্জ কিন্তু এটাই, এবং সবচেয়ে একাকী, নির্জন। সেই প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই ফ্ল্যান্যান আইল্যান্ডস ওখানে আছে বলে ভূবিদদের ধারণা। দ্বীপটা এত পাথুরে, একটা ঘাস পর্যন্ত জন্মায় না এখানে। কয়েকশো বছর আগে গোরস্থান হিসেবে ব্যবহার করা হত দ্বীপগুলোকে। ফ্ল্যানান আইল্যান্ডের সবচেয়ে বড় দ্বীপ আইলীন মোরে এখনও একটা গির্জার ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। দূর থেকে দেখলে দ্বীপপুঞ্জটাকে মনে হয় যেন সাতটা পাহাড়চুড়ো বেরিয়ে আছে সাগরের বুকে। একটা পাখি পর্যন্ত বাসা বাঁধে না এখানকার কোন একটা দ্বীপে।

স্কটিস আর স্ক্যান্ডিনেভিয়ান জাহাজ চলাচল পথের একেবারে পাশেই পড়ে দ্বীপপুঞ্জটা, জাহাজের জন্যে এগুলো ভয়াবহ আতঙ্ক। শত শত বছর ধরে আঁধার রাতে পথ ভুল করে এসে অসংখ্য জাহাজ আছড়ে পড়েছে দ্বীপগুলোর গায়ে, তাদের ধ্বংসাবশেষ আজও দেখতে পাওয়া যায় দ্বীপে। শেষ পর্যন্ত আঠারোশো নিরানব্বই সালে বাধ্য হয়ে আইলীন মোরে একটা লাইট হাউস বসান ইংরেজ সরকার। পঁচাত্তর ফুট উঁচু এই লাইট হাউসটা দাঁড়িয়ে আছে দ্বীপের সব চেয়ে উঁচু জায়গায়। সমুদ্র সমতল থেকে এর মাথার উচ্চতা দু'শো ফুট। লাইট হাউসের মাথায় বসানো এক লাখ চল্লিশ হাজার ক্যান্ডেল পাওয়ার ক্ষমতা সম্পন্ন সার্চ লাইটের আলো আবহাওয়া শুষ্ক থাকলে সাগর বক্ষে

পঁচিশ মাইল দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। দ্বীপের পূর্ব এবং পশ্চিম দুই ধার থেকেই ধাপে ধাপে সিঁড়ি কেটে লাইট হাউসের গোড়া পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ঝড়ের দিনে বাতাস আর উত্তাল ঢেউ দ্বীপের যে কোন একধারে আছড়ে পড়ে, তখন দরকার পড়লে অন্য ধারের সিঁড়ি বেয়ে নিরাপদেই লাইট হাউসে উঠে যাওয়া যায়।

লাইট হাউসটা তৈরি হওয়ার পর চারজন অভিজ্ঞ নাবিক চাকরি নিয়ে এল সেখানে। এই নির্জন বাসে একটানা অনেক দিন থাকা যে-কারও পক্ষেই অসম্ভব। তাই একটা নিয়ম ঠিক করে দেয়া হয়েছে চারজনের জন্যে। প্রতি দুই সপ্তাহ পর পর একটা জাহাজ ভিড়বে দ্বীপে, নাবিকদের প্রয়োজনীয় খাদ্য, পানীয় ও অন্যান্য জিনিস সরবরাহ করবে। আর ছ'সপ্তাহ পর পর দু'সপ্তাহের জন্যে বাড়ি যাবে যে কোন একজন নাবিক।

পুরো এক বছর সব কিছুই ঠিকঠাক মত চলল। শীতকাল। ডিসেম্বরের ছ'তারিখে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে দ্বীপে এসে ভিড়ল একটা জাহাজ, হেসপেরাস। এবারের ছুটিতে যাবে একজন স্কটিশ, জোসেপ মুর। বরফের মত ঠাণ্ডা পাথুরে সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে খুশিতে গান গাইছে সে। আহ, দীর্ঘ দেড়টি মাস নির্জনবাসের পর আবার আত্মীয়জনদের দেখা পাবে সে।

জাহাজে উঠে লাইট হাউসের দিকে ফিরে চাইল জোসেপ। কালো আকাশের পটভূমিকায় ধূসর একটা দৈত্যের মত মনে হচ্ছে লাইট হাউসটাকে। বহু ওপরে, একেবারে হাউসের মাথার কাছে কেবিনের দিকে চাইল জোসেপ। যা ভেবেছিল, কাউকে দেখা যাচ্ছে না। আরও ওপরে দৈত্যের চোখের মতই জ্বলছে সার্চ লাইট, আঁধার ফুঁড়ে আলোক রশ্মি বেরিয়ে গেছে অনেক দূরে। হঠাৎ কোন কারণ ছাড়াই তিন সহকর্মীর জন্যে মন খারাপ হয়ে গেল জোসেপের। টম মার্শাল, ডন ম্যাকআর্থার, আর সবচেয়ে বেশি খারাপ লাগছে সদ্য ছুটি কাটিয়ে আসা জিম ডুক্যাটের জন্যে। নিশ্চয়ই কাটিয়ে আসা ছুটির আনন্দোচ্ছল

সপ্তাহ দুটোর কথা ভাবছে এখন জিম, ভাবছে কি করে কাটবে দীর্ঘ একঘেয়ে, নিরানন্দ ছ'টি সপ্তাহ। তাদের চারজন নাবিকের নিয়তিই এই।

জোর করে মন থেকে বিষণ্ণ ভাবটা তাড়াবার চেষ্টা করল জোসেপ। এই মুহূর্ত থেকেই মুক্তির আনন্দ উপভোগ করতে চাইছে সে।

দেখতে দেখতে কেটে গেল ছুটির দুটো সপ্তাহ। দারুণ কেটেছে জোসেপের ছুটি। সাগর-পারে বাড়ি তার। সাগরের পরিবর্তনে তার মনেরও পরিবর্তন ঘটে। গত কয়েকদিনে একটি বারের জন্যেও ঝড় ওঠেনি সাগরে। ডিসেম্বরের শীতেও যখন খুশি পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে জোসেপ। ঠাণ্ডায় হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে উঠে এসেছে বরফের মত ঠাণ্ডা পানি থেকে। গা মুছে গিয়ে বসেছে ফায়ার প্লেসের সামনে। আস্তে করে চুমুক দিয়েছে মদের গ্লাসে, আড্ডা মেরেছে বন্ধুদের সাথে। রাতের প্রায় সবটুকুই নেচে গেয়ে কাটিয়েছে। খোলা নৌকা নিয়ে অনির্দিষ্টভাবে বেরিয়ে পড়েছে সাগরে, মাছ ধরেছে। দুপুর কাটিয়েছে কোন নির্জন দ্বীপে, কয়লার আগুনে পোড়ানো রঙিন কাঁকড়া খেয়ে।

ছুটি ফুরিয়েছে। এবার ফেরার পালা। কিন্তু যেতে মন চাইছে না জোসেপের। কারওই চায় না, বিশেষ করে যদি তার চাকরিটা এমন বিতিকিচ্ছিরি জায়গায় হয়। কিন্তু একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও, একুশে ডিসেম্বর আবার হেসপেরাসেই উঠে বসল জোসেপ মুর। যাত্রার পর পরই সাংঘাতিক ঝড় উঠল সাগরে। আর সামনে বাড়ার সাহস পেল না হেসপেরাস। তীরে না ভিড়লেও স্কটিশ উপকূলের কাছাকাছিই থাকল।

তিন দিনের দিন একটু কমল ঝড়। কিন্তু সাগরের রাগ পড়ছে না। সামনে ফুঁসে চলেছে উত্তাল তরঙ্গমালা। ধীরে ধীরে চলতে শুরু করল আবার জাহাজ। অতি ধীর গতিতে চলে দুই দিন পর দূর থেকে আইলীন মূরের লাইট হাউস চোখে পড়ল জোসেপের।

সাঁঝ হল। কিন্তু সার্চ লাইট জ্বলল না লাইট হাউসের। সাঁঝ গড়িয়ে রাত নামল। তবু জ্বলল না সার্চ লাইট। অবাক লাগল জাহাজীদের। ব্যাপারটা কি?

'আশ্চর্য তো!' জোসেপকে ডেকে বললেন ক্যাপ্টেন, 'আলো জ্বালছে না কেন ওরা? খারাপ হয়ে গেছে সার্চ লাইট? তুমি কিছু আন্দাজ করতে পারছ, জোসেপ?'

'ন্‌নাহ্‌, ক্যাপ্টেন, অবাক লাগছে আমারও! ডিউটির ব্যাপারে ভয়ানক সচেতন ওরা তিনজনেই। বুঝতে পারছি না। কিছু হল ওদের?'

সেদিন রাতে আর দ্বীপের গায়ে জাহাজ ভিড়াবার সাহস পেলেন না ক্যাপ্টেন। যে হারে ফুঁসছে সাগর, অন্ধকার রাতে হিসেবের একটু এদিকে ওদিক হলেই পাথুরে দ্বীপের গায়ে আছড়ে পড়ে চুরমার হয়ে যাবে জাহাজ।

পরদিন সকালে, অর্থাৎ ছাব্বিশ তারিখে ঘুম থেকে উঠেই অবাক হয়ে গেল জোসেপ। সাগর শান্ত। একেবারে আগের মত। কুয়াশার ভেতর দিয়ে উঁকি ঝুঁকি মারছে সূর্য। পুব দিকের সিঁড়ির দিকে চলেছে জাহাজ। ওদিকেই নোঙর ফেলবে। লাইট হাউসের লোকদের উদ্দেশ্যে সিগন্যাল ফ্ল্যাগ ওড়ানো হল। কয়েক সেকেন্ড পরেই বাতাস কেটে বেরিয়ে গেল জাহাজের হুইসেলের তীক্ষ্ণ, তীব্র আওয়াজ। কিন্তু কোন সাড়া নেই লাইট হাউসের নাবিকদের তরফ থেকে। প্রত্যুত্তরে অন্যান্য বারের মত সিগন্যাল ফ্ল্যাগ দেখাল না ওরা কেউ। দ্বীপের পাথুরে সিঁড়ি বেয়ে হৈ-চৈ করতে করতে নেমে এল না একজনও। যেন ছুটি কাটাতে চায় না ছুটি পাওয়া নাবিক, খাবারের দরকার নেই কারও।

অবাক হয়ে যাওয়া ক্যাপ্টেনের আদেশে একটানা বেজে চলল জাহাজের বাঁশি। কিন্তু বৃথা। কেউ সাড়া দিল না।

অসহিষ্ণুভাবে ভারি ব্যাগটা এক কাঁধ থেকে অন্য কাঁধে চালান করে দিল জোসেপ মূর। নামার জন্যে তৈরি হল।

'দাঁড়াও, জোসেপ,' পেছন থেকে ডাকলেন ক্যাপ্টেন। 'আমিও আসছি তোমার সাথে। নিশ্চই গড়বড় হয়েছে কিছু। নইলে সাড়া দিচ্ছে না কেন কেউ?' আরও আধ ডজন নাবিক সহ জোসেপের পিছু পিছু জাহাজ থেকে নামলেন ক্যাপ্টেন।

টাওয়ারের কাছে পৌঁছে দাঁড়িয়ে পড়ল জোসেপ। চেঁচিয়ে ডাকল বন্ধুদের, 'আহোয়! আহোয়! মার্শাল! ম্যাকআর্থার! ডুক্যাট! কোথায় তোমরা?'

টাওয়ারের গায়ে আছড়ে পড়া বরফ-শীতল দমকা বাতাসের সাঁই সাঁই ছাড়া আর কোন আওয়াজ নেই। কেউ সাড়া দিল না।

'সত্যিই গোলমাল হয়েছে কিছু, ক্যাপ্টেন, জলদি চলুন।' ক্যাপ্টেনকে কথাটা বলেই দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল জোসেপ।

এক এক লাফে তিনটে করে সিঁড়ি ভেঙে লাইট হাউসের লিভিং কোয়ার্টারের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল সবাই। এক ঝটকায় দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ল জোসেপ, তার পিছু পিছু অন্যরা।

প্রথমেই ঘরে অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা আবহাওয়া অবাক করে দিল জোসেপকে, বাইরের সাথে ঘরের তাপমাত্রার কোন ভেদাভেদ নেই। স্বাভাবিকভাবেই তার নজর চলে গেল ফায়ার প্লেসের দিকে। আগুন জ্বলছে না প্লেসে। দেয়াল ঘড়িটা বন্ধ। বোধহয় চাবি শেষ হয়ে গেছে। নিজের অজান্তে শিউরে উঠল জোসেপ। কেন যেন ঘরটাকে মৃত্যুপুরী বলে মনে হল তার।

ছুটে গিয়ে আবার সিঁড়ি ভাঙতে শুরু করল জোসেপ। যত দ্রুত সম্ভব সার্চ লাইটের কাছে উঠে যেতে চায় সে। যতই উঠছে, বাড়ছে হৃৎপিণ্ডের গতি। খারাপ কিছু ঘটেছে তার তিন সহকর্মীর ভাগ্যে কিন্তু কি বুঝতে পারছে না সে।

সার্চ লাইটের বিশাল চোখটার কাছে পৌঁছে থমকে দাঁড়াল সে। এগিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখল। ভালমত পরিষ্কার করা আছে

লাইটের কাঁচ। কিন্তু এ কি, খোলা কেন চোখটা? দিনের বেলা যে কাপড়টা দিয়ে ঢেকে রাখা হয় সেটা নেই কেন?

ঠিক এই সময় লগবুকটার কথা মনে পড়ল জোসেপের। ছুটে অফিসরুমে ঢুকল সে। টেবিলের ওপর যথাস্থানেই পড়ে আছে ওটা। শেষ বাক্য লেখা হয়েছে পনেরোই ডিসেম্বর, মার্শালের হাতের লেখা। বাক্যটাঃ 'গড ইজ অল ওভার' (সবখানেই ঈশ্বর)।

বিস্ময়ে ঘাড় সোজা হয়ে গেল জোসেপের। ওর ঈশ্বরে অবিশ্বাসী তিন সহকর্মী, বিশেষ করে মার্শালের মত লোক ঈশ্বরের কথা বলবে, এটা ভাবতেই পারে না সে।

লগবুকের পেছনের পাতা উল্টে চলল জোসেপ, যেদিন সে ছুটিতে গিয়েছিল, অর্থাৎ ছ'তারিখ লেখা পাতায় এসে থামল। পড়তে শুরু করল এর পরের পৃষ্ঠা থেকে। পরিষ্কার করে সহজ সরল ভাষায় লেখা আছে সময়, আবহাওয়া আর সাগরের বিবরণ। কিন্তু একটা জিনিস খুবই অবাক লাগল জোসেপের। প্রত্যেকটা পাতায় একটা ভয়াল ঝড়ের বিবরণ লেখা আছে। কই, সে হেসপেরাসে ওঠার আগে তো কোন দিন দমকা হাওয়াও ওঠেনি সাগরে, বিশেষ করে বারো আর তেরো তারিখে। রিপোর্টে তো বলে, গত বিশ দিনের মধ্যে এই দুই দিনই আবহাওয়া সবচেয়ে ভাল গিয়েছে। তাহলে? ঝড় দেখল কি করে তার তিন সহকর্মী?

তারপরেই লগবুকের এক জায়গায় একটা শব্দ দেখে বিস্ময়ের মাত্রা আরও বেড়ে গেল জোসেপের। ডুক্যাটের সম্পর্কে উক্তি করেছে মার্শালঃ 'ইরিটেবল'। কিন্তু সদ্য ছুটি কাটিয়ে আসা একজন লোকের মেজাজ এত খারাপ (জোসেপের আন্দাজ) হয়ে গিয়েছিল কেন, যে ধৈর্যশিল মার্শাল পর্যন্ত তাকে সহ্য করতে পারছিল না?

আরও অবাক হবার মত কথা লেখা আছে আরেক পাতায়। মার্শাল লিখেছেঃ 'ডুক্যাট কোয়ায়েট। ম্যাকআর্থার ক্রাইং'। (ডুক্যাট শান্ত। ম্যাকআর্থার কাঁদছে।)

কাঁদছে! ম্যাকআর্থার! অবিশ্বাসী ভঙ্গিতে মাথা নাড়াল জোসেপ। সারাটা জীবনই প্রায় সাগরে কেটেছে যার, দুর্গম সাগরবক্ষে, ভয়ঙ্কর ঝড়ের কবলে পড়েও চোখের একটা পাপড়ি পর্যন্ত কাঁপেনি যে লোকের, সে কেঁদেছে এ কি বিশ্বাস করা যায়!

তেরো তারিখে লিখেছে মার্শালঃ 'ডক্যাট স্টিল কোয়ায়েট। ম্যাকআর্থার প্রেয়িং।' (এখনও শান্ত ডুক্যাট। ম্যাকআর্থার প্রার্থনারত।)

তার পরের পাতায় লেখা আছেঃ 'গ্রে ডেলাইট। মী, ডুক্যাট অ্যান্ড ম্যাকআর্থার প্রেড।' (ধূসর দিনের আলো। আমি, ডুক্যাট আর ম্যাকআর্থার প্রার্থনা করলাম।)

একটা অক্ষরও বিশ্বাস করতে পারছে না জোসেপ। গত একটা বছর তিন সহকর্মীর সাথে কাটিয়েছে সে। কোনদিন, এমন কি অস্বাভাবিক ভয়ঙ্কর ঝড়ের রাতেও, যখন টাওয়ারের একেবারে গলার কাছে এসে উঠেছে সাগরের ঢেউ, একবার ঈশ্বরের নাম পর্যন্ত মুখে আনতে শোনেনি ওদের কাউকে জোসেপ।

বিমূঢ়ের মত ক্যাপ্টেনের দিকে ফিরে চাইল জোসেপ। এতক্ষণ তার ঘাড়ের ওপর দিয়ে পৃষ্ঠাগুলোয় চোখ বুলিয়ে যাচ্ছিলেন ক্যাপ্টেনও।

'আমি নিশ্চিত, স্যার,' বলল জোসেপ, 'ঈশ্বরকে ডেকেছে ওরা তিনজনে, ঝড়ের ভয়ে নয়। সাগরের ঢেউ আর ঝড়কে কেয়ারই করত না ওরা। না, একেবারে না। দ্বীপের আশেপাশে যত ভয়ঙ্কর ঝড়ই উঠুক না কেন, ওদের দেখা ঝড়ের কাছে ওগুলো একেবারেই নগণ্য। ওদের মনে ভয় ধরিয়ে দেবার মত প্রাকৃতিক ঝড় না, স্যার, এ একেবারেই অসম্ভব। গলা কেটে ফেললেও আমি অন্তত বিশ্বাস করব না একথা।'

লাইট হাউসের সব কটা ঘর, সম্ভাব্য সমস্ত জায়গা ইতিমধ্যেই তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছে ছ'জন নাবিক। কিন্তু সন্দেহজনক কিছু পায়নি ওরা।

ভূতুড়ে কাণ্ডকারখানা বলে মনে হল ছ'জন নাবিকের। ভীত হয়ে পড়েছে তারা। ভেবে কূল পাচ্ছেন জোসেপ, কি করে গায়েব হয়ে গেল তিন তিনজন জলজ্যান্ত মানুষ। লগবুকে লেখা ঝড়ের কোন ব্যাখ্যা বের করতে পারছে না সে, বুঝতে পারছে না এই দ্বীপের আশেপাশেই শুধু আবহাওয়ার এত অবনতি ঘটেছিল কি করে। কোন রহস্যজনক কারণে শুধু দ্বীপের আশেপাশেই মারাত্মক রকম ফুঁসে উঠেছিল সাগর? কেন ভয় পেয়েছিল তিনজন অসামান্য দুঃসাহসী লোক? 'ঈশ্বর সবখানে'. এ কথারই বা কি মানে?

ঝড় আর ভয়ঙ্কর টাইডাল বোর দেখেছে তিনজনে, কাজেই এত বোকা নয় ওরা যে ভয়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে সাগরে। না হয় ধরে নেয়া গেল, একেবারে টাওয়ারের মাথার ওপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল ঢেউ, (যদিও তা একেবারেই অসম্ভব) এবং ভাসিয়ে নিয়ে গেছে তিনজনকে, তাহলে তো ঘরের জিনিসপত্রও ভাসিয়ে নিয়ে যেত সঙ্গে সঙ্গে। ঝড়ের মধ্যেই নিশ্চয়ই পিচ্ছিল সিঁড়িতে কোন কারণে নেমে যায়নি এক সঙ্গে তিন তিনজন অভিজ্ঞ লোক, যে পা পিছলে পড়ে গিয়ে একই সঙ্গে সাগরে ভেসে যাবে সবাই এবং ডুবে মরবে। আর যেই করুক, একথা জোসেপ অন্তত বিশ্বাস করবে না। তিন সহকর্মীকে তার চেয়ে ভাল করে আর কেউ চেনে না।

আইলীন মোর আর তার আশপাশের সব কটা দ্বীপ চষে ফেলেও তিনজন লোকের কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। একেবারে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে যেন ওরা।

পনেরো তারিখ রাতে একটা জাহাজ গিয়েছে আইলীন মোরের কাছ দিয়ে। পরে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা যায়, লাইট হাউসের আলো দেখতে পায়নি সেদিন জাহাজের ক্যাপ্টেন বা নাবিকদের কেউ।

বহু তদন্ত হল, এনকোয়েরি বোর্ড বসল, দিনের পর দিন সবরকম সম্ভাবনা বিবেচনা করে দেখল, কিন্তু তিনজন নাবিকের গায়েব হয়ে যাবার কোন কারণই ব্যাখ্যা করতে পারল না তারা।

আইলীন মোরের ওপর দিয়ে গিয়েছিল কোন ইন্টার-ডাইমেনশনাল ডোর? ওই দরজার ভেতরে কি চলছে দেখতে পেয়েছিল মার্শাল বা অন্য দুজনে? ওই রহস্যজনক দরজার ওপারের লোকজনকে কি দেখতে পেয়েছিল মার্শাল, এবং বলেছিল 'ঈশ্বর সবখানে'? আজব দেশের ওই লোকজনকেই ঈশ্বর বলে ভেবেছিল সে। দরজার সঙ্গে সঙ্গে চলা মারাত্মক ম্যাগনেটিক ফিল্ডই কি একটা বিশেষ এলাকায় বিশেষ ঝড়ের সৃষ্টি করেছিল।

আচমকা ভয়ঙ্কর ঝড় উঠতে দেখা যায় বারমুডা ট্রায়াঙ্গল এলাকায়। সেই ঝড় কি তাহলে এই ইন্টার-ডাইমেনশনাল ডোরের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়ানো ম্যাগনেটিক ফিল্ডেরই কীর্তি?

কিংবা মানুষের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটায় সাংঘাতিক ম্যাগনেটিক ফিল্ড, যার ফলে মাথা খারাপ হয়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে মানুষ উত্তাল সাগরে? হারিয়ে যায় চিরদিনের মত? এজন্যেই কি জনশূন্য ভূতুড়ে জাহাজ ভাসতে দেখা যায় বারমুডা এলাকার সাগরে?

যে কারণেই গায়েব হোক, আইলীন মোরের তিনজন নাবিক হারানর ব্যাপারটা কিন্তু আজও এক বিরাট রহস্য হয়ে আছে মানুষের কাছে।

তেরো

চেতনার ঘূর্ণিপাক।

এমন কিছু জায়গা কি আছে আমাদের পৃথিবীতে, যেগুলো কোন কারণে শুধু বর্তমানেই সীমাবদ্ধ নয়, ফলে ভিন্ন মহাবিশ্ব থেকে ভিন্ন পথে এসে

সেখানকার বাস্তবতার মধ্যে প্রবেশ করে মালটি-ডাইমেনশনাল কিছু?

ব্র্যান্ড স্টেইজারের মত বিজ্ঞানীদের মতে আছে এমন জায়গা! এসব জায়গার নাম দিয়েছেন স্টেইজার 'উইনডো এরিয়া'। বিশ্ববিখ্যাত ভূবিদ, জীববিদ, উদ্ভিদবিদ মরহুম ইভান স্যান্ডারসনও এসব অদ্ভুত এলাকার কথা উল্লেখ করেছেন, উনিশশো তেষট্টির 'ফেট' ম্যাগাজিনের সেপ্টেম্বর সংখ্যায়। তিনি লিখেছেনঃ পৃথিবীর কিছু কিছু এলাকায় নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র যেন ঠিক কাজ করে না...এসব জায়গায় মাটিতে পাথর বা অন্য কোন ভারি জিনিস রাখলে কেমন যেন আলগা ভাবে পড়ে থাকে বলে মনে হয়...যেন ওই বস্তু বা বস্তুগুলোকে ঠেলা দিয়ে সরাতে গেলে যতটা জোর লাগা উচিত ততটা লাগে না... নরওয়ের সঞ্জের (Songe) চিরতুষার ঢাকা চূড়ায় এমন একটা জায়গা আছে। আরেকটা আছে ইন্দোনেশিয়ার কিন্তামানির বিশাল আগ্নেয় গুহামুখে...।

এই সকল অসামঞ্জস্যপূর্ণ জায়গাগুলোর নাম দিয়েছেন স্যান্ডারসন 'ভোরটেক্স'। ভোরটেক্সের বাংলা মানে, পানির ঘূর্ণিপাক। কিন্তু বিজ্ঞানীদের ভোরটেক্স মানে চেতনা ঘূর্ণি। কথাটা শুনতে সত্যিই ভারি অদ্ভুত।

উনিশশো তিয়াত্তরের অক্টোবরে 'সাইকোলজি টু-ডে' (Psychology Today) নামক এক প্রবন্ধে বিখ্যাত সাইকোলজিস্ট ড. স্টেনলি ক্লিপার ভোরটেক্স সম্পর্কে বলেছেন, 'এসব এলাকায় ঢুকলেই কেমন যেন অস্বাভাবিক আচরণ করে মানুষ, জীবজন্তু। প্রাকৃতিক ভোরটেক্স, যেমন ক্যালিফোর্নিয়ার মাউন্ট শাস্তার কাছে একটা এলাকার ভেতরে প্রবেশকারীরা বেরিয়ে আসার পর অভিযোগ করে, ওই এলাকায় ঢুকেই নাকি মনে হয়, একটা ভিন্ন চেতনার জগতে এসে হাজির হয়েছে তারা...। বারমুডা এলাকায় চলাচলকারী জাহাজের নাবিকদের মুখেও এমন অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায়।

মাউন্ট শাস্তার ওই এলাকাটাকে দীর্ঘ দিন ধরে মন কেমন করা

এলাকা (mind-boggling zone) বলে চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে। ক্যালিফোর্নিয়ার উত্তরাঞ্চলের ইণ্ডিয়ানরা বহু শতাব্দী আগে থেকেই পুরুষানুক্রমে এলাকাটার অদ্ভুত ক্ষমতার কথা জেনে এসেছে। কি আ মাউন্ট শাস্তায় যা মানুষের মনকে এভাবে প্রভাবিত করে? উত্তরটা জা নেই কারও। কোন্ ধরনের 'ডাইমেনশনাল উইনডো' আছে ওখানে?

উত্তর শাস্তায় অরিজোনে এমনি একটা জায়গা আছে, না 'অরিজোন ভোরটেক্স'। এই জায়গাটাও ইণ্ডিয়ানদের বিশেষ পরিচিত ভোরটেক্সটার নাম দিয়েছে তারা 'দ্য ফরবিডেন গ্রাউন্ড'। জায়গাটা যে একটা অদ্ভুত গুণ আছে এটা ইণ্ডিয়ানদের ঘোড়াগুলো পর্যন্ত টে পায়, জোনের ভেতরে ঢুকতে আপত্তি করে জানোয়ারগুলো।

এসব এলাকার অস্বাভাবিকতা মানুষের কাছে যেন একটা চ্যালে হয়ে আছে। এমন আর একটা জায়গা আছে, মেডফোর্ডের উনিশ মাই দূরে, সার্ডিন ক্রীকের কাছে, গোল্ডহীল এলাকায়। জায়গাটুকুর ব্যা একশো পঁয়ষট্টি ফুটের মত হবে। স্বাভাবিক সূত্র এখানে মানে না মহাকর্ষ। গোল জায়গাটার ঠিক কেন্দ্রে কাঠের ছোট্ট একটা কুঁ বাঁকাচোরা হয়ে পড়ে আছে। এককালে ভোরটেক্স জোনের বাই পাহাড়টার চূড়ায় স্থাপন করা কুঁড়েটা এক মাইনিং কোম্পানির অফি ছিল। বেশ কয়েক বছর আগে কোন প্রাকৃতিক কারণে, বোধহ ঝড়েই, পাহাড় চুড়ো থেকে গড়িয়ে পড়ে এসে থামে ওটা। একেবা ভোরটেক্স জোনের কেন্দ্রে। এখানে, এই কুঁড়ের কাঠামোর ভেতরে জোনের সবচেয়ে অদ্ভুত মহাকর্ষ-সূত্র-অগ্রাহ্য-করা ব্যাপারগুলো ঘটে

এই কুঁড়ের কাঠামোর মধ্যে কোন লোক দাঁড়ালে ঘূর্ণি চক্রে কেন্দ্রের দিকে সে দশ ডিগ্রি হেলে আছে মনে হয়। ওখানটায় কো লাঠি খাড়া করে পুঁতে দিলেও হেলে আছে মনে হয়। আটাশ পাউ ওজনের স্টীলের বল শেকলে বেঁধে কুঁড়ের কড়িকাঠ থেকে ঝুলিয়ে দে গেছে, সামান্য কোণ করে ঝুলছে ওটা। তবে কি মাধ্যাকর্ষণ শক্তি একেবারেই নেই জায়গাটায় অথবা অ্যান্টি-গ্র্যাভিটি জাতীয় কিছু

আছে? ভোরটেক্স জোনের বাইরের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবেই শুধু কোণ করে ঝোলে এখানে ঝুলন্ত জিনিস?

এমনিতেই ঢাল বেয়ে গড়িয়ে পড়লে, বেঁকেচুরে বিচিত্র ভঙ্গিতে পড়ে থাকবে যে কোন কুঁড়েঘর। মেঝে আর ছাদ কোন্‌টা থেকে কোন্‌টা কত ডিগ্রি কোণ করে থাকবে সহজে বোঝা যাবে না। বিচিত্র বেকায়দায় ঝুলে থাকবে ঘরের দরজা জানালার পাল্লা। এসব ব্যাপার দৃষ্টিশক্তির বিভ্রম ঘটাতে বাধ্য। কিন্তু ভাল করে পরীক্ষা করে দেখা গেছে গোল্ডহীল ভোরটেক্সের ভেতরের অস্বাভাবিক ব্যাপারস্যাপার এ ধরনের কোন দৃষ্টি বিভ্রম নয়।

আরও কয়েকটা অকল্পনীয় অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে এখানটায়। যেমন, দুজন সমান উচ্চতার লোক পাশাপাশি দাঁড়ালে, আর খানিক দূরে পুব কিংবা পশ্চিম দিকে দাঁড়িয়ে তৃতীয় কেউ ওদের দিকে তাকালে দুজনের মধ্যে তুলনামূলকভাবে উত্তর ঘেঁষা লোকটাকে একটু বেঁটে মনে হবে তার কাছে, সে ওরা দুজনে তার দিকে মুখ করেই থাকুক কি পেছনে ফিরেই থাকুক। ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য! এটা কেন ঘটে, তার কারণ জিজ্ঞেস করলে বিজ্ঞানীরা বলেন, 'শক্তিশালী ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ঘূর্ণি আছে এখানে, যার জন্যে সোজা দাঁড়ানো মানুষকে সামান্য উত্তরে হেলে আছে মনে হয়, পাশাপাশি দাঁড়ানো দুজন সমান উচ্চতার লোকের মধ্যে উত্তরের লোকটাকে খানিক খাটো মনে হয়, পানি ঢাললে উপরের দিকে গড়াতে থাকে। কেউ কেউ বলেন, ওই বিশেষ এলাকায় ঢুকলেই জড় পদার্থের অণুগুলো আরও বেশি করে গায়ে গায়ে লেগে পদার্থের আকৃতি সংকুচিত করে আনে এবং জোনের ভেতরে স্বাভাবিকের চাইতে ছোট দেখা যায় যে কোন বস্তু।

কয়েক বছর আগে, হার্বার্ট বি নিকোলাস নামে একজন বিজ্ঞানী কার্পেন্টারস লেভেল আর প্লাম্ব বব নিয়ে গিয়ে ঢোকেন কুঁড়েটার ভেতরে। পরীক্ষা নিরীক্ষা করে রায় দিয়েছেন তিনি, আসলে অপ্টিক্যাল গোলমাল ঘটে ভোরটেক্স জোনের ভেতরে।

কিন্তু নিকোলাসের এই মন্তব্যে সব প্রশ্নের উত্তর মেলে না, তাই ঠিক মেনে নেয়া যায় না এটা। এত সহজে এই অদ্ভুত এলাকার রহস্যের সমাধান হয় না আসলে। আপনা আপনিই শঙ্খাকারে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে আকাশে উঠে যায় এখানে সিগারেটের ধোঁয়া। কম্পাস কাজ করে না। যে কোন রকমের মাপক যন্ত্র ওই এলাকার ভেতর এক রকম পাঠ দেয়, বাইরে আর এক রকম। ভুলেও কোন পাখি ওড়ে না এখানকার আকাশে, অথবা উড়তে পারে না। এলাকার ভেতরে জন্মানো প্রত্যেকটা গাছ উত্তর দিকে হেলে দাঁড়িয়ে। শুধু অপ্টিক্যাল গোলমালের জন্যেই কি এতগুলো অস্বাভাবিক কাণ্ড ঘটছে? নিশ্চয়ই না। যতদূর মনে হয় কোন এক ধরনের 'ফোর্স ফিল্ড' কাজ করছে ওখানে।

শুধু যে এসব অদ্ভুত কাণ্ডকারখানাই ঘটে ভোরটেক্স জোনে, তা নয়, মানুষও গায়েব হয়ে যায় এই এলাকাগুলোর ভেতর থেকে। অরিজোনের কাছেরই একটা ঘটনার উল্লেখ করছি।

উনিশশো চুয়াত্তর সালের পাঁচই সেপ্টেম্বর। রগ রিভারের ন্যাশন্যাল ফরেস্ট ক্যাম্পগ্রাউন্ড। কপার থেকে মাইল খানেক দূরে জায়গাটা, ক্যালিফোর্নিয়া বর্ডারের কাছেই। লেবার উইক-এন্ডে এখানে বেড়াতে এসেছে রিচার্ড কাউডেন পরিবার। পরিবার বলতে রিচার্ড, তার বউ, পাঁচ বছরের ছেলে বেলিন্দা এবং শিশুকন্যা মেলিসা। কপারের লোকাল স্টোর থেকে রবিবার সকাল নটায় দুধ কিনতে শেষ দেখা গেছে রিচার্ডকে।

পর পর তিন দিন কেটে যাবার পরও রিচার্ড ফিরছে না দেখে আশঙ্কিত হয়ে উঠলেন তার মা। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের গোচরে আনলেন তিনি ব্যাপারটা। তদন্তের জন্যে লোক পাঠানো হল। ক্যাম্পগ্রাউন্ডে রিচার্ডদের তাঁবুটা আবিষ্কার করল ট্রুপার লী রিকসন। তাঁবুতে ঢুকে কাউকে পেল না সে। তার জবানীতে বলেছে রিকসন, কিছু একটা আছে ক্যাম্পের ভেতরের জায়গাটায়। টেবিলের ওপরে এমন কি সদ্য কেনা দুধের বোতলটা পর্যন্ত পড়ে আছে, অথচ লোকগুলোর কোন

চিহ্নই নেই।'

দেখে শুনে মনে হয়, সব কিছু ছেড়েছুঁড়ে কোথায় চলে গেছে পরিবারটা। অথচ তাঁবু থেকে তাদের চলে যাবার কোন চিহ্ন বা নিদর্শনই নেই। যেন ভোজবাজির মত বাতাসে বিলীন করে দিয়েছে তাদের আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ। তাঁবুর কাছেই একটা গাছের গোড়ায় পড়ে আছে রান্নার হাঁড়ি পাতিল। রিচার্ডের ওয়ালেট আর তার স্ত্রীর পার্সটা পাওয়া গেল ক্যাম্পখাটের বিছানার নিচে, একটা পয়সাও খোয়া গেছে বলে মনে হয় না। আর একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে রাখা আছে রিচার্ডের ছিপটা। ক্যাম্পসাইটে পার্ক করা আছে গাড়ি। ধস্তাধস্তি বা এ ধরনের কোন কিছুর চিহ্ন কোথাও নেই।

কোন কারণে পুরো পরিবারটাকে কিডন্যাপ করে নিয়ে গেছে কেউ, এটা বলা যায় না কিছুতেই। আর তাদের কিডন্যাপ করে নিয়েও কারও কোন লাভ নেই। ধনী নয় রিচার্ড, এমন কোন গণ্যমান্য ব্যক্তিও নয়। একজন শত্রু নেই কোথাও। তবে? কি করে, কোথায় গায়েব হয়ে গেল পুরো পরিবারটা?

এভাবে গায়েব করতে কিন্তু পারে একটা শক্তি, বিশেষ ধরনের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড। মানুষ আর পদার্থ গায়েব করা একটা পরীক্ষার কথা এর আগেও বলা হয়েছে। পরীক্ষাটা 'ফিলাডেলফিয়া এক্সপেরিমেন্ট'। পরীক্ষাটা নিয়ে আর একটু বিশদ আলোচনা করলেই অনেক কিছু অনুমান করে নিতে পারবেন পাঠক।

বছর তিরিশ আগে, ফিলাডেলফিয়া এলাকায় গেলেই একটা অদ্ভুত রহস্যজনক পরীক্ষার কথা শোনা যেত। পরীক্ষাটির নাম 'ফিলাডেলফিয়া এক্সপেরিমেন্ট'।

কিছু দিন আগে মারা গেছেন হাওয়ার্ড হুগস। শোনা যায়, ইউ. এস. সরকারের একটা অতি গোপন মডেলের জাহাজের উন্নতি সাধনের কাছে নিযুক্ত ছিলেন তিনি। এঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই কি কারণে যেন বার

বার ভেসে উঠতে থাকে ফিলাডেলফিয়া এক্সপেরিমেন্টের কথা। উনিশশো তেতাল্লিশ সালে ফিলাডেলফিয়া পরীক্ষায় সেই 'সিক্রেট ওয়ারশিপ' নামে খ্যাত জাহাজটার সঙ্গে কি কিছুদিন আগে হুগসের পরামর্শে বানানো ডীপ-সী মাইনিং শিপ 'গ্লোমার এক্সপ্লোরার'-এর কোন সম্পর্ক আছে? আণবিক শক্তি চালিত 'জায়ান্ট ক্ল' (অনেকটা কাঁকড়ার মত দাঁড়া) বসানো আছে গ্লোমার জাহাজে। ওই দাঁড়ার সাহায্যে নাকি সাগর গর্ভে নিমজ্জিত আণবিক যুদ্ধাস্ত্র সম্বলিত একটা রাশিয়ান সাবমেরিন তোলার চেষ্টা করেছিলেন ইউ. এস. সরকার।

উনিশশো তেতাল্লিশের অক্টোবরে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, একটা ডেস্ট্রয়ারকে নিয়ে ফিলাডেলফিয়া নেভি ইয়ার্ডে এক আশ্চর্য পরীক্ষা চালিয়েছিল ইউ. এস. নেভি। আইনস্টাইনের ইউনিফাইড ফিল্ড থিয়োরির সাহায্যে ফিলাডেলফিয়া নেভি ইয়ার্ড থেকে জন্মস্থান ভারজিনিয়ার নরফোকে জাহাজটাকে টেলিপোর্ট (অনেকটা কল্পিত ম্যাটার ট্রান্সপোর্ট করার মত ব্যাপার) করার বন্দোবস্ত করলেন ইউ. এস. সরকার।

মোটামুটি সাফল্যের সঙ্গেই শেষ হল পরীক্ষা। মুহূর্তে অজড় পদার্থে পরিণত হয়ে ফিলাডেলফিয়া ত্যাগ করল ডেস্ট্রয়ারটা, মিনিট-খানেকের মধ্যেই নরফোক পৌঁছে নিজ রূপে ফিরে এল আবার। কয়েক মিনিট পর আবার ওটাকে ফিরিয়ে আনা হল ফিলাডেলফিয়া ডক ইয়ার্ডে। জড় পদার্থের ক্ষেত্রে আশ্চর্য রকম সাফল্য লাভ করলেও জীবের ব্যাপারে সফল হতে পারেননি পরীক্ষকরা। কেউ কেউ অদৃশ্য হয়ে অদৃশ্যই থেকে গেল, কেউ আবার দেহ ধারণ করল বটে কিন্তু পাগল হয়ে গেল। কেউ দেহও ধারণ করল, পাগলও হল না, কিন্তু মাঝে-মাঝেই হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যেত।

সরকারীভাবে পরীক্ষাটার কথা কোনদিন প্রকাশ করা হয়নি। কিন্তু কি করে যেন একান ওকান হতে হতে জনসাধারণ শুনে ফেলল কথাটা। ব্যাপারটা নিয়ে প্রবন্ধ বেরোতে শুরু করল খবরের কাগজে,

বিভিন্ন ম্যাগাজিনে, বইয়ে। সবাই এর সত্যতা কতটুকু জানতে চায় সরকারের কাছে।

ব্যাপারটার ওপর সবচেয়ে বেশি জোর দিলেন অ্যাসট্রোফিজিসিস্ট, অ্যাস্ট্রোনোমার, ম্যাথামেটিশায়ান, রাইটার এবং এক্সপ্লোরার ড. মরিস কে. জেসাপ। মিশিগান-এর ড্রেক বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনস্ট্রাকটর ছিলেন তিনি কিছুকাল। তারপর, অ্যাসট্রোফিজিকস-এ পি. এইচ. ডি. করে বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে মনোনিবেশ করলেন তিনি। দক্ষিণ আফ্রিকার সাউর্দান হেমিস্ফেয়ারে একটা রিফ্রেকটিং টেলিস্কোপ বসালেন। ইতিমধ্যেই ইউ. এস. ডিপার্টমেন্ট অফ এগ্রিকালচার-এর তরফ থেকে দক্ষিণ আমেরিকার আমাজান নদী উপকূলে বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে এলেন বেশ কয়েক প্রকার দুষ্প্রাপ্য প্রাণী আর উদ্ভিদের সন্ধানে। তারপর ওয়াশিংটনের কার্নেগী ইনস্টিটিউটের তরফ থেকে গেলেন সেন্ট্রাল আমেরিকায় প্রত্নতত্ত্বের কাজে, অনেক অনেকদিন আগে লুপ্ত হয়ে যাওয়া মায়ান সভ্যতা সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান করতে।

অনেক দেশ ঘুরে ঘুরে বিস্তর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে উনিশশো পঁয়ষট্টি সালে থিতু হয়ে বসলেন ড. জেসাপ। নতুন এক নেশায় পেয়ে বসল তাঁকে এবার। ইউ. এফ. ও. রহস্য। অমানুষিক পরিশ্রম করে তথ্য জোগাড় করলেন তিনি, একখানি বই লিখলেন 'দ্য কেস ফর দ্য ইউ. এফ. ও.' নামে। নিউ ইয়র্কের সিটাডেল প্রেস প্রকাশ করেছে বইটা।

এই বইয়ে জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, আবহাওয়াবিদ্যা এবং অন্যান্য অনেক বিজ্ঞান বিষয়ক রহস্যের উল্লেখ করেছেন ড. জেসাপ, যেগুলো সত্যিই বিস্ময়কর। বিভিন্ন যুক্তি দেখিয়ে তিনি বলেন, সীমিত মহাকর্ষ জ্ঞানের জন্যেই মহাকাশবিদ্যায় বেশি দূর এগোতে পারছে না মানুষ। আইনস্টাইনের ইউনিফাইড ফিল্ড থিয়োরি বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা নতুন যুক্তি দেখিয়েছেন, ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম আর সাবঅ্যাটোমিক পার্টিক্‌ল্‌সরা একই সূত্রে গাঁথা—এই যুক্তির আরও বহুল

গবেষণা প্রয়োজন বলে মনে করেন ড. জেসাপ।

উনিশশো ছাপ্পান্ন সালের তেরোই জানুয়ারি, সবে জনমনে তোলপাড় তুলতে শুরু করছে 'দ্য কেস ফর দ্য ইউ. এফ. ও', এই সময় কার্লোস মিগুয়েল (পাগলাটে এক ভদ্রলোক। সংসারে কেউ ছিল না তাঁর। নাবিক হিসেবে সাংঘাতিক নাম করেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। ইউ. এফ. ও. সম্পর্কে দারুণ আগ্রহী।) অ্যালেন্ড-এর কাছ থেকে এক চিঠি পান ড. জেসাপ। ইউনিফাইড ফিল্ড থিয়োরি নিয়ে আর বাড়াবাড়ি না করার জন্যে অনুরোধ জানান অ্যালেন্ড তাঁকে। এই থিয়োরি গবেষণার পরিণাম নাকি ভয়াবহ। এর স্বপক্ষে একটা প্রমাণ দেন অ্যালেন্ড। এই প্রমাণ আর কিছু নয়, বহুল আলোচিত ফিলাডেলফিয়া এক্সপেরিমেন্ট। এই পরীক্ষার প্রত্যক্ষদর্শী অ্যালেন্ড দুঃখ করে চিঠিতে লিখেছেন, 'তেরো বছর আগেই মহাকর্ষ আর ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিজম নিয়ে গবেষণা শুরু করেছিলেন ইউ. এস. সরকার, তার পরিণাম ছিল অত্যন্ত মর্মান্তিক।'

ফিলাডেলফিয়া এক্সপেরিমেন্টের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন অ্যালেন্ড চিঠিতে। তার খানিকটা শুনুনঃ

'উনিশশো তেতাল্লিশ সাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। আমাদের জাহাজ তখন ফিলাডেলফিয়া নেভি ইয়ার্ডে নোঙর ফেলেছে। পরীক্ষাটা প্রত্যক্ষ করেছি আমি। একটা যুদ্ধজাহাজকে টেলিপোর্ট করা যায় কিনা পরীক্ষা করার জন্যে কয়েকজন বিজ্ঞানীকে নিযুক্ত করলেন ইউ. এস. সরকার।

'পরীক্ষার সময় এস. এস. অ্যানড্রুফুরুসেথেই (উচ্চারণের ভুলের জন্যে জাহাজটা ফুরুনসেথ বলেন কেউ কেউ।) পরীক্ষার আগে জাহাজটাকে অনেকদিন মাল বহনের কাজে ব্যবহার করে ম্যারিটাইম ট্রেড ইউনিয়ন। ক্যালিফোর্নিয়ার রিচমণ্ডে এটার জন্ম। বেনামি ডেস্ট্রয়ারটার ওপর পরীক্ষা চালানোর সময় পাশেই ছিল ফুরসেথ।) ছিলাম আমি। ডেস্ট্রয়ারটার পাহারাদার নিযুক্ত করা হয়েছে আসলে

আমাদেরকে। বাইরের কেউ যেন ইয়ার্ডে ঢুকতে না পারে, তা দেখাও আমাদেরই দায়িত্ব।

'শুরু হল পরীক্ষা। আমাদের চোখের সামনে লোকজনসহ নিমেষে নেই হয়ে গেল ডেস্ট্রয়ারটা, যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। এক সেকেন্ড পরই আবার যথাস্থানে দেখা গেল ওটাকে। তখনও টেলিপোর্ট করা হয়নি জাহাজটাকে। বিভিন্ন রকমে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে শুধু। এবার একটা বৃত্তের আকারে চুম্বকক্ষেত্র তৈরি করা হল জাহাজের ওপরে। এর ফলে জাহাজটার অনেকখানিই চুম্বকক্ষেত্রের প্রভাবের বাইরে থেকে গেল। এক অদ্ভুত দৃশ্য ফুটে উঠল আমাদের চোখের সামনে। বৃত্তের আকারে নেই হয়ে গেছে এখন জাহাজের মাঝখানটা। জাহাজের গলুইয়ের কাছ থেকে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে যাচ্ছে কয়েকজন নাবিক, সেই রকমই নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাদের, বৃত্তের মধ্যে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই অদৃশ্য হয়ে গেল তারা। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল, একবারে অদৃশ্য হচ্ছে না সমস্ত দেহটা। প্রথমে বাড়ানো ডান পা, তারপর শরীরের সামনের অর্ধেকটা, সব শেষে পেছনের অংশ। আসলে আস্তে আস্তে ঢোকার সময় শরীরের যে অংশটুকু চুম্বকক্ষেত্রের মধ্যে আগে ঢুকছে, সেটুকুই আগে অদৃশ্য হচ্ছে।'

তারপর কি করে ফিলাডেলফিয়া ইয়ার্ড থেকে অজড় পদার্থে পরিণত হয়ে নরফোক গেল ডেস্ট্রয়ারটা, তারপর ফিরে এল, সে-সব বর্ণনা দেয়া হয়েছে চিঠিতে।

সবশেষে লিখেছেন অ্যালেন্ডঃ

'পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা নাবিকদের অল্পই এখন অবশিষ্ট আছে, স্যার। বেশিরভাগই অদৃশ্য হয়ে আর ফিরে আসেনি। যারা এসেছিল, তাদেরও অধিকাংশই পাগল হয়ে গেছে। আর যারা পাগল হয়নি, অদ্ভুত সব ক্ষমতা অর্জন করেছিল তারা। কিন্তু নিজের অজান্তেই বিপদে পড়ে যেত মাঝে মাঝে, প্রাণহানীও ঘটেছে দু'এক ক্ষেত্রে। আমার কোয়ার্টারের কাছাকাছিই থাকত এমন একজন নাবিক। মজা দেখাবার

জন্যে প্রায়ই লোকজনের সামনে তার বাড়ির দেয়াল স্বচ্ছন্দে ভেদ করে চলে যেত সে, কাঁচের ভেতর দিয়ে আলোকরশ্মি যেভাবে ভেদ করে যায়, ঠিক তেমনিভাবে। আবার মাঝে মাঝে অদৃশ্য হয়ে যেত কোন বেকায়দা জায়গায়, আপনাআপনিই, ইচ্ছে করে নয়। দুজন মারা গিয়েছিল গায়ে আগুন ধরে গিয়ে। না, চুলোর আগুন বা ওই জাতীয় কোন কিছু থেকে আগুন লেগে নয়। একটা ছোট্ট কম্পাস হাতে তুলে নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে আগুন লেগে যায় যে তুলেছিল তার গায়ে, পরক্ষণেই লাফ দিয়ে তার পাশের লোকটার গায়ে গিয়ে লাগল আগুন। দুজনেই অংশ নিয়েছিল পরীক্ষায়। জড় পদার্থের ক্ষেত্রে পুরো সফল হয়েছে ফিলাডেলফিয়া এক্সপেরিমেন্ট, তেমনি বিফল হয়েছে জীবের ওপর পরীক্ষা চালাতে গিয়ে।

'মানুষের ওপর বিক্রিয়া করবে 'হাইপার-ফিল্ড', বুঝতে পারেনি নৌবাহিনীর বিজ্ঞানীরা। পরীক্ষার পর নিজেদের ভুল বুঝল তারা, কিন্তু তখন আর করার কিছু নেই। মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলায় প্রবল প্রতিক্রিয়া শুরু হবে জনমনে, অনুমান করে পরীক্ষার পর পরই ব্যাপারটা ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করেছিল নৌবাহিনীর লোকেরা। কিন্তু পারল কই...'

চিঠিপত্রের মাধ্যমে কোথায় তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারা যাবে জেসাপকে জানিয়েছিলেন অ্যালেন্ড। চিঠির মাধ্যমে আরও অনেক গুপ্ত কথার আদান প্রদান চলছে, এই সময় জেসাপকে তাদের ওয়াশিংটন অফিসে আমন্ত্রণ করল ইউ. এস. নেভাল রিসার্চ সেন্টার। নির্দিষ্ট দিনে গিয়ে অফিসে হাজির হলেন জেসাপ। যথারীতি কুশল বিনিময়ের পর 'দ্য কেস ফর দ্য ইউ এস ও'র একটা কপি লেখকের হাতে তুলে দিল একজন ন্যাভাল অফিসার।

জেসাপ তো অবাক! সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে অফিসারের দিকে চাইলেন তিনি।

মৃদু হাসল অফিসার। চোখের ইঙ্গিতে জেসাপের হাতের বইটা

দেখিয়ে বলল, 'মাত্র আমাদের হাতে এসেছে বইটা। তিনজন লোক পড়ে মন্তব্য লিখেছে বইটার ভেতরে। দেখুন উল্টে পাল্টে।'

দ্রুত পাতা উল্টে চললেন জেসাপ অ্যালেন্ডের চিঠি পাওয়ার আগেই ফিলাডেলফিয়া এক্সপেরিমেন্ট সম্পর্কে শুনেছিলেন তিনি, তবে এত বিশদ নয়। সেই চ্যাপ্টারে এসে পাতা উল্টানো বন্ধ করলেন। চ্যাপ্টারের প্রতিটি পাতার চারপাশের মার্জিনে তিন রঙের কালি দিয়ে অতি চিন্তাভাবনা করে মন্তব্য লেখা হয়েছে। অফিসার বলল তিনজন লিখেছে এই মন্তব্য, কিন্তু জেসাপের মনে হল এটা একজনেরই কাজ। লেখার স্টাইল, ভাষা কেমন যেন চেনা চেনা লাগল তাঁর। একটু ভাবতেই বুঝে ফেললেন তিনি, লেখাটা কার। নিঃসন্দেহে কার্লোস মিগুয়েল অ্যালেন্ডের।

সরল মনে অ্যালেন্ডের চিঠির কথা বললেন জেসাপ অফিসারকে। ব্যাপারটা সম্পর্কে অতি আগ্রহী মনে হল লোকটাকে। চিঠিগুলো জেসাপের কাছে চাইল অফিসার। দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় নিলেন জেসাপ।

ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরছেন জেসাপ। পাগলাটে এক নাবিকের প্রতি এত আগ্রহ কেন নৌবাহিনীর বুঝতে পারছেন না তিনি কিছুতেই। তবে কি অ্যালেন্ড ঠিকই বলেছে? প্রবল জনবিরোধ এড়ানর জন্যেই ফিলাডেলফিয়া এক্সপেরিমেন্টের কথা চাপা দিতে চেয়েছিল নৌবাহিনীর লোকেরা? নিশ্চয়ই জেসাপের বইটা কিনেছিলেন, বইয়ের মার্জিনে নোট করেছিলেন, তারপর জেসাপ বুঝতে পারবেন মনে করে তাঁর কাছে চিঠি লিখেছিলেন অ্যালেন্ড। কিন্তু অ্যালেন্ডের কাছ থেকে বইটা জোগাড় করল কি করে নৌবাহিনীর লোক?

এর কয়েকদিন পরই, উনষাট সালের বিশে এপ্রিল আচমকা মারা গেলেন ড. জেসাপ। ফ্লোরিডার কোরাল গ্যাবল্‌স্‌-এর কাছে, ড্যাড কাউন্টি পার্কে নিজের স্টেশন ওয়াগন গাড়ির ভেতর মরে পড়ে থাকতে দেখা গেল বিজ্ঞানীকে। জানালার সব কটা কাঁচ তুলে দিয়ে, একজস্ট

পাইপের মুখে নল লাগিয়ে, গাড়ির ভেতর টেনে আনা হয়েছে নলের অন্য মাথা। ইঞ্জিন চালু অবস্থাতেই পাওয়া গেছে গাড়িটাকে। বুঝতে অসুবিধে হয় না, দারুণ বিষাক্ত কার্বন মনক্সাইড গ্যাসই ড. জেসাপের মৃত্যুর কারণ। একজস্ট পাইপ থেকে নলের মধ্যে দিয়ে গিয়ে গাড়ির ভেতরে ঢুকেছিল ওই গ্যাস। এসব কথা আগেই বলা হয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে জেসাপের মৃত্যুকে আত্মহত্যা বলেই মনে হয়। কিন্তু লোকে বিশ্বাস করতে চায় না সেকথা। বলে, আসলে কোন কারণে খুন করা হয়েছে লোকটাকে। কিন্তু কে করল খুন? কার এমন পাকা ধানে মই দিয়েছিল নিরীহ একজন বিজ্ঞানী।

ড. জেসাপের মৃত্যুর কয়েকদিন আগেই রহস্যজনকভাবে নিরুদ্দেশ হয়ে যায় অ্যালেণ্ড। এরপর তাকে আর কখনও কেউ দেখেনি।

'ইনভিজিবল হরাইজোন'-এর লেখক ভিনসেণ্ট গ্যাডিস বলেছেন, অ্যালেন্ডকে খুঁজে বের করতে চেয়েছিল নাকি একজন লোক। লোকটা কে জানাননি গ্যাডিস। পেনসিলভ্যানিয়ার নিউ কেনসিংটনে অ্যালেন্ডের বাড়িতে গিয়েছিল লোকটা, কিন্তু অ্যালেন্ডকে পায়নি। পড়শীদের কাছে জিজ্ঞেস করে জানা যায়, আরও দুজন বয়স্ক লোকের সাথে বাস করে অ্যালেন্ড। জেসাপের মৃত্যুর কয়েকদিন আগে, হঠাৎ সমস্ত মালপত্র ট্রাকে বোঝাই করে নিয়ে কোথায় চলে যায় তিনজনেই। এরপর আর কখনও তাদের কাউকে দেখা যায়নি। কারণটা কি?

ড. জেসাপের রহস্যজনক মৃত্যু আর অ্যালেন্ডের উধাও হওয়ার পর 'ফিলাডেলফিয়া এক্সপেরিমেন্ট' স্বাভাবিকভাবেই আরও শেকড় গেড়ে বসে লোকের মনে। এরপর থেকে ঘোর অবিশ্বাসীরাও এমন একটা পরীক্ষা সত্যিই হয়েছিল বলে ভাবতে শুরু করে।

বারমুডা ট্রায়াঙ্গল রহস্য যেন এখন অনেকটা পরিষ্কার হয়ে আসছে। টেলিপোর্টের মাধ্যমেই হয়ত লক্ষ লক্ষ আলোক বছরের ওপার হতে অতি অল্প সময়ে এসে হাজির হয় ভিনগ্রহের বুদ্ধিমান জীবদের আকাশযান। ম্যাগনেটিক ফিল্ড সৃষ্টি করেই হয়ত বারমুডা

এলাকা থেকে জাহাজ, বিমান গায়েব করে দেয় ইউ. এফ. ও-র চালকরা, অবশ্য নিশ্চয়ই কোন গূঢ় উদ্দেশ্য নিয়েই। আবার হয়ত ম্যাগনেটিক ফিল্ডের প্রভাবেই এক ডাইমেনশান থেকে অন্য ডাইমেনশানে চলে যায় মানুষ।

ড. জেসাপ ঠিকই বলেছেন, আইনস্টাইনের ইউনিফাইড ফিল্ড থিয়োরি নিয়ে আরও ভাল করে গবেষণা করতে হবে, গবেষণা করতে হবে মহাকর্ষ নিয়ে। তাহলেই হয়ত এই. এফ. ও. আর বারমুডা রহস্য ভেদ করতে পারবে মানুষ।

ইচ্ছে করলে, বারমুডা রহস্যের একটা সমাধান কল্পনা করে নিতে পারি আমরা এখন।

ধরে নিই, ওই বিশেষ ম্যাগনেটিক ফিল্ডই বারমুডা ট্রায়াঙ্গলে জাহাজ, বিমান, নৌকা, মানুষ হারানর জন্যে দায়ী। এই ম্যাগনেটিক ফিল্ডের প্রভাবের মধ্যে ঢুকলেই বিকল হয়ে যায় কম্পাস, রেডিও এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি, চিন্তাশক্তি হারিয়ে ফেলে মানুষ। ফলে কোন উপায়েই তাদের বিপদের কথা জানতে পারে না বাইরের জগতের মানুষ। তারপর ফিলাডেলফিয়া পরীক্ষার মত কোন কারণে গায়েব হয়ে যায় মানুষসহ যানবাহনগুলো।

কিন্তু কথা হল, বারমুডা এলাকায় যদি ওই ধরনের ম্যাগনেটিক ফিল্ড থেকেই থাকে, তাহলে অরিজোন ভোরটেক্স বা গোল্ডহীলের মত সব সময় চুম্বকের প্রভাব থাকে না কেন এই এলাকায়?

এর উত্তর, ওই ম্যাগনেটিক ফিল্ড কৃত্রিম।

কিন্তু কৃত্রিম হলে তো কাউকে বানাতে হবে ওই ফিল্ড?

হ্যাঁ, বানাতে হবে।

কিন্তু কে? কেন বানায়? যানবাহনসুদ্ধ মানুষ ধরে নিয়ে গিয়ে কার কি লাভ?

এর উত্তর জানার জন্যে আরও অপেক্ষা করতে হবে আমাদের।

— ০ —